ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

যোগ জীবন

শ্রীঈশানীতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

৺মহাষ্টমী ২৯শে আশ্বিন

১৩৪১ সাল

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পোঃ বলাগড়, জেলা হুগলি।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

প্রকাশক
শ্রীঈশানীতোষ চট্টোপাধ্যায়
৩নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীঈশানীতোষ চট্টোপাধ্যায়
৩নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

নিউ যমুনা প্রেস্
১৭৫নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সান্যাল
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ওঁ নমঃ শ্রীশ্রীগুরবে

নিবেদন

বহুদিন হইতে আমার মনে মদীয় পূজ্যপাদ গুরুদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা প্রকাশের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। পূজনীয় গুরুদেবের অসম্মতিতে আমার ও অন্যান্য বহু উদ্যোগী ভ্রাতার এই মহৎ সংকল্প বহুদিন যাবৎ কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

আজ আমার বহুদিনের সঞ্চিত আশা সফলতার পথে চলিয়াছে: অপূর্ব্ব লীলাসম্ভারে সুসজ্জিত করিয়া আমার পরম পূজ্য ইষ্টদেবের জীবনী ও বাণী জনসাধারণের করকমলে উৎসর্গ করিয়া নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিতেছি। আশাকরি, এই পুস্তক সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে; ভগবানের কৃপায় আমার প্রচেষ্টা জয়প্রযুক্ত হইবে।

অনাবশ্যক পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া, গুরুদেবের শ্রীমুখ নিঃসৃত তদীয় জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী যেরূপ কথাচ্ছলে আমার নিকট গল্প করিয়াছিলেন, অবিকল সেইরূপ উদ্ধৃত হইল, আমার নিজের কোনরূপ ভাষা এই পুস্তকের মধ্যে না দিয়া সহজগম্য ও সরল ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমার নিজের কোনরূপ ভাষার ভাব-সঞ্চার করিয়া অনধিকার চর্চ্চার ধৃষ্টতা প্রকাশ করি নাই। ইহার পরিশেষে, আধ্যাত্মিক মহাভারত ও শারীরিক বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাষা ও ভাবের সুষ্ঠু ও মধুর সমাবেশ সকলক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট

আমার বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা যেন ভাষাদৌর্ব্বল্যজনিত যাবতীয় দোষ ও ত্রুটী মার্জ্জনা করেন।

এই পুস্তক মুদ্রণে, ক্রিয়ান্বিত ভ্রাতৃগণের উৎসাহ ও উদ্যম প্রশংসনীয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আর্থিক ও কায়িক সাহায্য করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন ও ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আশাকরি, জনসাধারণের মধ্যে এই অমূল্য চরিত-কথার বহুল প্রচার হইবে। সাধারণে যাহাতে আনন্দ-সুধাপানে বঞ্চিত না হন, তজ্জন্য এই পুস্তকের যথাসম্ভব মূল্য হ্রাস করা হইয়াছে।

সত্যের অবতার-ধর্ম্মের মানসপুত্র-মানবতার প্রতীক-মদীয় পরমপূজ্যপাদ গুরুদেবের অশেষ মহিমা প্রচারে সকলের মিলিত চেষ্টা ও যত্ন প্রার্থনা করি। সকলের শুভাকাঙ্ক্ষা আমার জয়-যাত্রার পাথেয় হউক।

ভ্রমপ্রমাদ মানুষের ধর্ম্ম। বাধাবিঘ্ন ও সময়ের অল্পতা হেতু যাবতীয় দোষ ও ত্রুটীর জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সকলে সাধ্যমত এই পুস্তক ক্রয় করিয়া দেশে আধ্যাত্মিকতার প্রচারে সহায়তা করুন। এই পুস্তকের শেষভাগের আধ্যাত্মিক মহাভারত শারীরিক বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম, ৯ নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়্যাণ্টাল প্রেসে শ্রীযুক্ত রঘুনাথ শীল বি, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে।

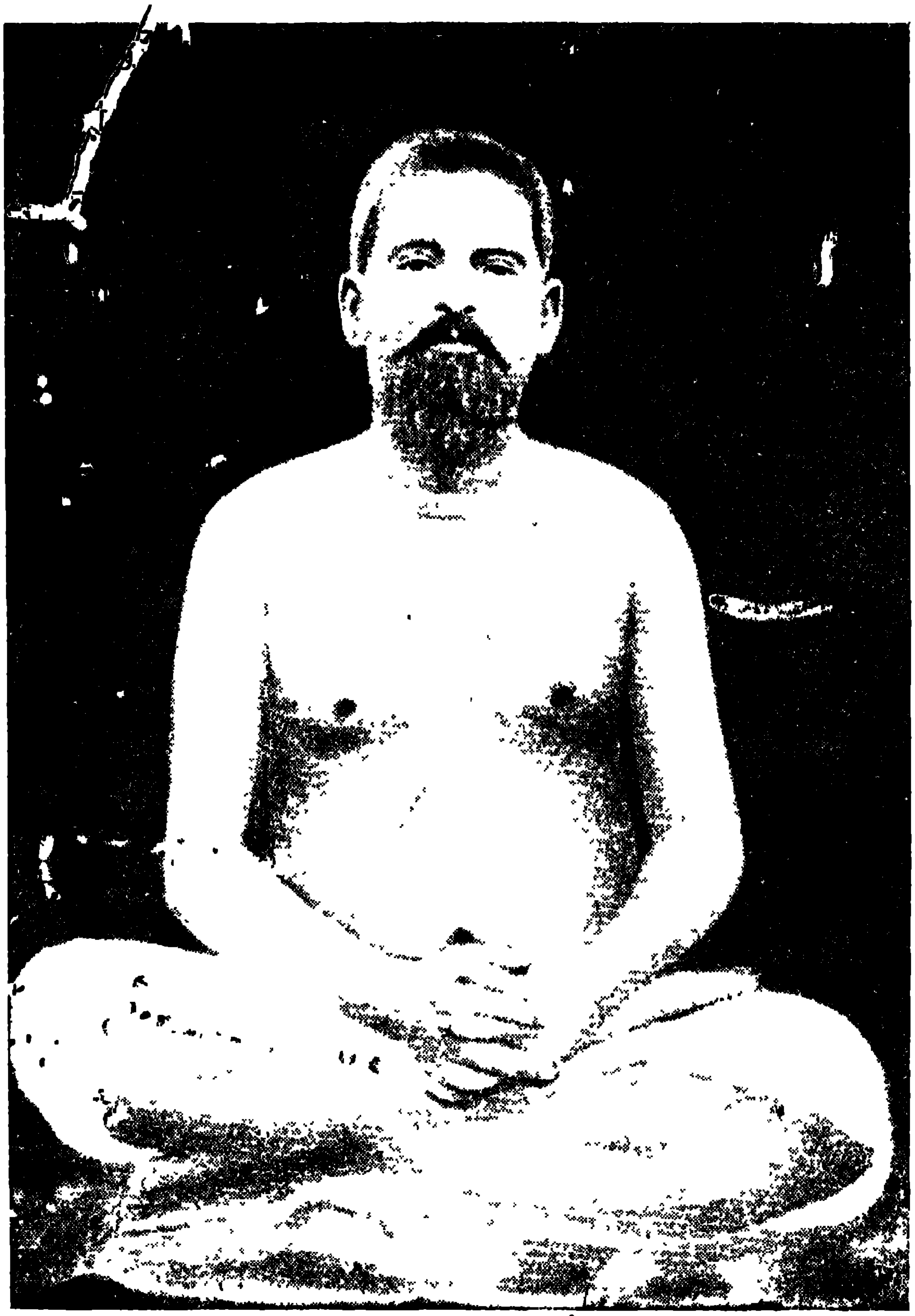

পণ্ডিত ৺পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

ডাঃ শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাল্য জীবন

সন ১২৬৬ সালের আশ্বিন সংক্রান্তি রবিবার দিবসে হুগলি জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রামের মিড্‌ডাঙ্গা পল্লীতে, মাতামহ আশ্রমে আমার জন্ম হয়। বলাগড় নিবাসী শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায় আমার পিতা। আমার জ্ঞান হওয়ার পরে জানিতে পারিলাম আমার নাম শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিন্তু পাড়ার সমবয়স্ক বালকেরা এবং আমার নিকট-আত্মীয়গণ রাগান্বিত হইলে আমাকে শিরুশে বলিয়া ডাকিতেন। আমার জননীর নাম নিস্তারিণী দেবী, ৺কাশীশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। কৌলিন্য প্রথার নিয়মানুসারে আমার মাতাঠাকুরাণী আজীবন পিত্রালয়ে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন আমার পিতার বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম, তখন পরিজ্ঞাত হইলাম, যে কৌলীন্য প্রথার শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়া আমার পিতা দেশত্যাগী হইয়াছেন। যে সময়ে আমার বয়স ১ বৎসর কি, তদূর্দ্ধ ঐ সময়ে খুব সম্ভব পশ্চিম দেশাভিমুখে গমন করিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কেহই তাঁহার অনুসন্ধান পান নাই। মাতামহাশ্রমে মাতাঠাকুরাণীর পিসীমাতা ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। আমার যখন জ্ঞানাঙ্কুর দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল, তখন পর্য্যন্তও পিতার স্নেহ কি প্রকার, তাঁহাকে কি প্রকার ভালবাসিতে হয়, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম। আমি আমার মাতার একমাত্র সন্তান ছিলাম; সুতরাং বলা বাহুল্য আমি আলালের ঘরের দুলাল ছিলাম। আমি আমার দিদিমাতাঠাকুরাণীর প্রাণের গোপাল ছিলাম। প্রকৃত পক্ষে তিনিই আমাকে লালনপালন করিয়াছিলেন। পাড়ার

সমবয়স্কদিগের সহিত কেবল আনন্দে ৬ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত খেলিয়া বেড়াইতাম। আমার মাতামহের দ্বিতল ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকা বাটী, বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপ। আমার স্মরণ হয়, ৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দিদিমাতার নিকট শয়ন করিয়া কত প্রকার উপন্যাস শ্রবণ করিতাম। বাল্যকালে আমি বড় অনুকরণপ্রিয় ছিলাম। যদিচ সকলেই অবগত আছেন, সকল মনুষ্য অনুকরণের আদর্শ তন্মধ্যে আমার একটু বাড়াবাড়ি ছিল। যখন যেটি দেখিতাম, তখন সেটী না করিলে মনেতে যেন শান্তি পাইতাম না। আমার বয়স যখন ৮।৯ বৎসর, গুপ্তিপাড়ার একজন লোক বহুরূপ সাজিয়া প্রতিদিন নানা প্রকার মূর্ত্তি দেখাইয়া বেড়াইত। আমি আমার একজন প্রিয় বয়স্য শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত নানাপ্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ও বাড়ী বাড়ী দেখাইয়া বেড়াইতাম। পাড়ার লোকও সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে উৎসাহ দিতেন। আবার এক সময়ে একজন পুতুলনাচওয়ালা আসিয়া অনেক স্থানে নাচ দেখাইত। আমিও তথায় যাইয়া উপস্থিত। তাহার কৌশল কোন প্রকারে অবগত হইয়া মৃত্তিকার পুত্তলিকা নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া সূতা দ্বারা ঠিক ঐরূপভাবে পাড়ায় পাড়ায় নাচাইতাম। এই সকল উদ্যমে আমার সমবয়স্ক অনেক বালক আসিয়া মিলিত। এই সময়ে আমার সকল আনন্দ যেন অন্ধকারে মিশিয়া গেল; কারণ আমার দিদিমাতাঠাকুরাণী আমাকে স্বগ্রীরূপে ঠাকুরপাড়ায় গোবিন্দ সরকারের পাঠশালায় পাঠাইতেন; ঐ সরকারের বহির্ব্বাটীর সম্মুখে একটি বিল্ববৃক্ষ ছিল। কতক ছাত্র ঐ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে "পাততাড়ি" বিছাইয়া লেখাপড়া করিত। আমিও তাহাদিগের সঙ্গী হইলাম। গুরুমহাশয়ের ভাবগতিক দেখিয়া অন্তর অহরহ কাঁপিত; অতি সামান্য কারণে তাঁহার বেত্রের সহিত ছাত্রদিগের পৃষ্ঠের সহিত সৌহৃদ্য হইত। অনেক সময়ে আমারও ঐরূপ দশা হইত। যদি কোন দিন কোন গতিকে

পাঠশালায় অনুপস্থিত থাকিতাম, অমনি গুরুমহাশয়ের প্রেরিত আদেশ-বহনকারী আমার সমপাঠীগণ আমাকে ধরিতে আসিত; কিন্তু তাহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই দুষ্কর। বলিতে কি,—শমনের দূতের তুল্য তাহারা কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করিত না। আমি তখন দিদিমাতাকে পরমেশ্বরী তুল্য জানিতাম। তাই দৌড়াইয়া তাঁহার পশ্চাতে লুকাইতাম। ছাত্রগণ দিদিমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া শূন্যে শূন্যে তাহাদিগের স্কন্ধে করিয়া "গুরুমহাশয়, গুরুমহাশয়, তোমার পোড়ো হাজির। হাজির না করিতে পারি দশ বেতের বাড়ি।" এই বচন আওড়াইতে আওড়াইতে আমাকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইত। অবশ্য ঐ সময়ে তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ফিকির চালাকি করিলেও বিফল মনোরথ হইয়া আতঙ্কে হৃদয় দুরু দুরু করিতে থাকিত; ভাবিতাম অদ্যই আমার জীবনের শেষ হইবে। দিদিমাতা রক্ষা করিল না; তবে কি গুরুমহাশয় রক্ষা করিবেন? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পাঠশালায় উপস্থিত। অমনি "শির্ শে, আজ তোর রক্ষা নাই" বলিয়া অঙ্গে নির্দ্দয়রূপে বেত্রাঘাত করিতেন। তাহাতেও তাঁহার ব্রাহ্মণ্যদেব শীতল হইত না। আমাকে ইটে খাড়া করিয়া দিতেন; মূল কথা,—"গোপাল" হইতাম। অপর বালককে ধরিয়া আনিতে যাইয়া আমার পূর্ব্ব সাধ মিটাইতাম। ইহা ভিন্ন আরও নানা প্রকার শাস্তি পাইতে হইত। গুরুমহাশয়ের এবং তাঁহার আত্মীয়দের নানাপ্রকার হুকুম পাঠশালার ছাত্রদিগের তামিল করিতে হইত। গুরুমহাশয়ের গৃহকার্য্যের জন্য প্রতি ছাত্রকে বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য করিতে হইত। কেহ কেহ গুরুমহাশয়ের গোয়াল পরিষ্কার, কেহ কেহ বৃক্ষে উঠিয়া কাষ্ঠাহরণ, কেহ কেহ হাটবাজার করন, কেহ কেহ পুষ্প চয়ন, তামাক সাজা, পক্ককেশ উৎপাটন ও ব্যজন করা ইত্যাদি কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইত; অর্থাৎ সকল কার্য্যের ভার ছাত্রদিগের উপর

স্তম্ভ ছিল। আমরা প্রাতে চাউল ভাজা ও গুড় কাপড়ে বাঁধিয়া পাঠশালায় আসিতাম। প্রাতঃকালে বেলতলায় পাটি বিছাইয়া লিখিতে বসিতাম। সন ১২৭৪ সালে আমি কলাপাতায় লিখিতাম। আমাদিগের সহিত বৈদ্য বংশীয়া কয়েকটি বালিকাও পড়িত। সময়ে সময়ে আবার তাহাদিগের কোমল হস্ত আমাদের কর্ণদেবে পতিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা হইত ও কেমন রক্তবর্ণ ধারণ করিত। নন্দোৎসবের সময় গুরুমহাশয়কে পৃথক্ পার্ব্বণী দিতে হইত। ঐ সময়েই দুই দিন মাত্র গুরুমহাশয়ের হাস্য বদন দেখিতাম; আমার মনে হয় না যে তিনি অন্য সময়ে হাসিতেন। গুরুমহাশয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, বলা বাহুল্য—আমি যখন পাঠশালায় যাতায়াত করি, ঐ সময়ে আমার খেলা আরম্ভ হয়। আমি প্রথম হইতেই বড় অনুকরণপ্রিয়; আমি যাহা দেখিতাম তাহা না করিলে মন যেন কিম্ভূতকিমাকারভাবে তোলাপড়া করিতে থাকিত। আমাদিগের গ্রামে ঠাকুরপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র ইত্যাদি দেবালয় ছিল। তাঁহার ~~সময়ে~~ সময়ে যেরূপ লীলা হইত, তাহা দেখিয়া আমি ঠাকুর ও রথ ইত্যাদি লইয়া খেলা করিতাম; যে সময়ে যেরূপ পূজা, ঠিক সেইরূপভাবে পূজা করিতাম। বলা বাহুল্য, এই সময়ে আমার বয়ঃক্রম ৮।৯ বৎসর। আমার উপনয়ন হয় নাই। পূজার সময় আমার সহচরগণ একত্রে বৈকালী সংগ্রহ করিতে প্রতি পাড়ায় পাড়ায় পূজার বাটিতে যাইতাম। গুপ্তিপাড়ার রথ বড় বিখ্যাত; অনেক লোকের সমাগম হইত। আমিও নূতন কাপড় চাঁদর পরিধান করিয়া রথ দেখিতে অতি প্রত্যূষে বহির্গত হইতাম। মনে কত আনন্দ, উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে কোন্ সুযোগে রথে চড়িব, হয়ত এত চেষ্টা করিয়াও রথে চড়া হইল না—কোন কোন বৎসর চড়িতাম; সোজা ও উল্টা রথের মধ্যে যে ছয় দিবস রথ গুণ্ডবাটিতে থাকিত। আমার ১০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রথের মধ্যে "লুকোচুরি" ক্রীড়া করিতে করিতে পদস্খলিত হইয়া চাকার

উপরে পতিত হই এবং একটি লৌহ শলাকা আমার গলদেশে বিঁধিয়া যায় ও ভয়ানক রক্ত পড়ে। আমার এই অবস্থা দেখিয়া আমার সমবয়স্কগণ পলায়ন করে; একজন লোক (কে তাহা স্মরণ নাই) আমাকে লইয়া বৃন্দাবনচন্দ্রের পুষ্করিণীতে যাইয়া রক্ত ধৌত করিয়া দেন; অতি কষ্টে জীবন রক্ষা হয়। এই সময়ে আর একটি বিষয়ে আমার মন দিবানিশি নৃত্য করিত। অবসর সময়ে অন্যান্য বালকগণের সহিত বনে বনে পক্ষী ধরিয়া এবং তাহাদের শাবক আনিয়া খেলা করিতাম; কিন্তু আমার অদৃষ্টবশতঃ যেদিন যে সকল পক্ষী আনিতাম পরদিবস প্রাতে দেখিতাম পিঞ্জরে পক্ষী নাই। কোন কোন পক্ষীর মাথা নাই, কোন পক্ষীর বা পা নাই, এইরূপ করিয়া ইঁদুরে বা অন্য কোন জন্তুতে ঐ পক্ষীদিগকে নষ্ট করিত; তাহা বলিয়া শাবক আনিতে ক্ষান্ত হইতাম না। কোন পক্ষী আর বাদ ছিল না; যতদুর আমার স্মরণ হয়, কেবল কাক ও শকুন পক্ষী আমার পিঞ্জরে আসে নাই। এই সময়ে আমার পিতার কথা স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। তাহাতে জানিতে পারিলাম, আমার পিতার চারি বিবাহ; আমার তিন বিমাতা ঠাকুরাণীর মধ্যে একজনের একটি পুত্র ও একজনের একটি কন্যা সন্তান। কোথায় আছেন এবং আমার আত্মীয় লোক বলিয়া বিশ্বাস না হওয়ায় তাহাদিগের বিষয় আর অনুসন্ধান করিতাম না। কিছুদিবস পরে আমার মাতা-ঠাকুরাণী কোন পার্ব্বন উপলক্ষে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করিতে যান; তথায় আমার একজন বিমাতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় জানিতে পারিলাম, যে, উল্লিখিত আমার ভ্রাতা ও ভগ্নী পরলোকগমন করিয়াছেন। আমাদিগের কিরূপ করিয়া সংসার চলিত এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার এই উত্তর করা যায়, আমার মাতামহের কিছু ভূমি সম্পত্তি গুপ্তিপাড়া ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রজাদিগের মধ্যে বিলি ছিল। তাহার খাজানা এত অল্প যে অতি কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত।

আমার মনে হয় সময়ে সময়ে পদব্রজে গুপ্তিপাড়া ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী স্থানে দিদিমাতা ও মাতাঠাকুরাণীর সহিত গুরুমহাশয়ের নিকট হইতে একবেলা আধবেলা বিদায় লইয়া উক্ত স্থানে খাজানা আদায় করিতে যাইতাম। রাণাঘাটের অন্তর্গত ঘোলা নামক স্থানেও আমার মাতামহের বিষয় ছিল। ঐ স্থানে বাৎসরিক ১৯৲।২০৲ টাকা খাজানা পাওয়া যাইত। তাহা ভিন্ন চাউল, দাইল ইত্যাদি অনেক বিষয়ে আমাদিগের সংসারের সাহায্য হইত। উক্ত ঘোলায় দিদিমাতাঠাকুরাণী বৎসরের মধ্যে দুইবার খাজানা আদায় করিতে যাইতেন। আমার যখন ১০।১১ বৎসর বয়ঃক্রম তাবৎ আমার অদৃষ্টে ভালরূপ কাপড় ইত্যাদি অঙ্গে উঠে নাই। এমন কি জামা পর্য্যন্ত শরীরে ধারণ হইত না, বিনামার কথা স্বতন্ত্র। তবে পক্ষী খরিদ ইত্যাদি ভাল কার্য্যে পয়সা খরচ বন্ধ ছিল না। যখন পয়সা সহজে মাতাঠাকুরাণী ও দিদিমাতার নিকট হইতে আদায় করিতে অপারগ হইতাম, তখন চুরি বিদ্যা দ্বারা আঁকাতে পয়সা বাক্স হইতে বাহির করিতাম। যখন তাহাও সুবিধা না হইত, তখন পুরাকালীন পিতল কাসার জিনিসপত্র যাহা পাইতাম অতি গোপনে গোপুলা ধোবার বাটিতে ঐ জিনিষ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে পক্ষী আনিতাম। সেই বালকটি আমাকে পক্ষী ও শাবক দিত। এই সকল কার্য্যে আমার মাতাঠাকুরাণীর নিকট হইতে উত্তম মধ্যম প্রকারের প্রহার খাইতাম।

এই সময়ে গ্রামের অপর পাড়ার একটি নীচ জাতীয় লোক কৃষ্ণ যাত্রার দল খুলিল। আমি প্রথম হইতে স্বভাবসিদ্ধ গান করিতাম, তাহা আমাদিগের পাড়ার লোক জানিত। উহাদিগের মধ্যে একজন নীচ জাতীয় লোক আমাকে একদিন সন্ধ্যার সময়ে যাত্রার মহলা দিবার স্থানে লইয়া যায়। অনেক লোক এক স্থানে সমবেত হইয়া গান করিতেছে ইহা দেখিয়া আমার ন্যায় বালকের মন দ্রবীভূত হইল। সেই দিন

হইতে বিনা বেতনে ঐ পেষাদার দলে নাম লিখাইলাম। তখন হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে ঐ দলে যাত্রার মহলা দিতে যাইতাম। ইহাতে মাতা ও দিদিমাতাঠাকুরাণী কত রাগ করিতেন কিছুতেই এই গুণধর পুত্রকে সুপথে আনিতে পারেন নাই। আমার রোদনে তাঁহারা বড়ই দুঃখিত হইতেন, আমিও সময় বুঝিয়া কোপ মারিতাম, ক্রন্দন করিয়া জয়ী হইতাম। আমি কংশবধ পালায় কৃষ্ণের বিষয় অভিনয় করিতাম, সে সময় আমাকে ধড়া-চূড়া মোহন বাঁশী সকল ধারণ করিতে হইত এবং কালীও মাখিতে হইত, তখন বর্ত্তমানের মত ভাব ছিল না। ৩০৲ টাকা বায়নায় পূজার সময় হাটকান্দা রুকুশপুরে বাবুদিগের বাটিতে যাত্রা করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। পঞ্চমীর দিন ঐ দলস্থ সকল লোক পদব্রজে উক্ত বাবুদিগের বাটিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আমাকে তথায় যাইতে অনুরোধ করায় অতি গোপনে এক বস্ত্রে তথায় চলিয়া যাই। বলাগড়ের যে বাড়ীতে আমার পরে বিবাহ হয় সেই বাটির নিকট দিয়া রাস্তা; ঐ রাস্তায় আমরা সকলে গমন করি। তখন হয়ত আমার প্রথমা স্ত্রীর জন্ম হয় নাই। দেখিবেন পাঠক কি প্রকারে ভবিষ্যতে আমার ঐ বাটির একটি কন্যার সহিত বিবাহ হইবে। উক্ত দলে সকলেই নীচ জাতীয় লোক ছিল কেবল ২।১টি মাত্র ভদ্র সন্তান ছিলেন। তখন ভদ্রলোকে যাত্রার দলে থাকিতে লজ্জিত হইতেন; এখন যেন উহা সভ্যতা প্রযুক্ত নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য মহাশয় পর্য্যন্ত দল করিতে বা দলে থাকিতে শ্লাঘা মনে করেন না। সময়ে কি না হইতেছে, কালের মহিমা বুঝা ভার। ঐ ২।১টি ভদ্রলোকের কৃপায় সে যাত্রা অনেক কষ্টে রক্ষা পাই। তথায় যাইয়া আমার ক্রন্দনই সার হইয়াছিল। যে বাবুদিগের বাটিতে যাত্রা হইয়াছিল তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বাবু আমাকে ভদ্রসন্তান বিবেচনা করিয়াই হউক অথবা আমার প্রতি কৃপা করিয়াই হউক আমাকে আদর করিতেন। যে স্থানে ভদ্র

সন্তানগণ যাত্রা শুনিতে বসিতেন তথায় আমাকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহাদিগের নিকট রাত্রির কিয়দংশ সময় অতিবাহিত করিতাম, বলিতে কি—আমি ভিন্ন ঐ দলের কোন বালক সুন্দর ছিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নীচ লোকের দল। আবার আমার দুরদৃষ্টের কথা শুনুন, বিনা পয়সায় পেষাদারি যাত্রার দলে যাত্রা করিতে গিয়া নবমী-রাত্রে উক্ত দলের অধিকারী আমার তন্দ্রা আসিবার কারণে—বেহালার ছড় দ্বারা আঘাত করে; সুতরাং ক্রন্দনের উপর ক্রন্দনই আমার সার হইল। বাটি আসিয়া ঐ দলকে নমস্কার করিয়া ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করি। বেহালার ছড়ের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া যাত্রাদলের খেয়াল নষ্ট হইল। গুরুমহাশয়ের নিকট মার খাইয়া ঐ বৎসরই পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া গ্রামস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হই। এই বৎসরে আমার মাতাঠাকুরাণীর আত্মীয়ের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে কোড়লা গ্রামে মাতাঠাকুরাণীর সহিত যাই এবং ঐ বৎসরের মধ্যেই আমার দিদিমাতা পরলোকগমন করেন। সুতরাং দিদিমাতার অভাবে আমি মাতা-ঠাকুরাণীর সহিত ঘোলা গ্রামে খাজানা আদায় করিতে গমন করি। রাণাঘাটে এই সময় আমার প্রথম বাষ্পীয়-শকট দর্শনলাভ ঘটে, ইহার পূর্ব্বে আমি দেখি নাই। ঘোলা একটি কৃষকের গ্রাম; কয়েক দিবস তথায় থাকিয়া গুপ্তিপাড়ায় প্রত্যাগমন করি; সেই বৎসর পরেই আমার উপনয়ন কার্য্য শেষ হয়। ঐ কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ সংস্থান না হওয়ায় গুপ্তিপাড়ার জমিদার বাবু বেণীমাধব মজুমদার মহাশয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি তিনিও কিছু সাহায্য করেন। অতি কষ্টে আমার উপনয়ন কার্য্য শেষ হইল। এই সময় হইতে মাতাঠাকুরাণী অসহণীয় কষ্টে আমাকে লইয়া কালযাপন করিতে থাকেন। এত দিবস পরে আমার ১২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমার অঙ্গে জামা ও জুতা উঠে। দিদিমাতার মৃত্যুর পরে প্রতি বৎসর পূজার সময় মাতাঠাকুরাণী আমাকে

লইয়া উলার বাবুদিগের বাটিতে যাইতেন। উলার ঈশান ও মহেশ বাবু মাতাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। এই সময় ভয়ানক ঝড় হয়, আমি অতি কষ্টে জীবন রক্ষা পাই। আর কিছু দিবস পর্য্যন্ত গুপ্তিপাড়ায় ইংরাজী বিদ্যালয়ে ফাষ্টবুক পড়ি। এই সময়ে আমাদিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইল, কারণ মাতাঠাকুরাণীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মাতাঠাকুরাণীর দখলি সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিলেন, তাহাতে আয় অতি কম হইল। মাতাঠাকুরাণীর এক পিসি-পুত্র ধনি ও জমিদার, নাম শ্রীগঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় যশোহর জেলার অন্তর্গত নলডাঙ্গায় বাস করিতেন। তথায় আমাদিগের অবস্থার বিষয় জানাইয়া পত্র লিখেন, তথা হইতে আমার সম্বন্ধে মাতুলমহাশয় আমাদিগকে নলডাঙ্গায় লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠান। যে সময় লোক আসে তৎকালিন আমার বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর। যে দিবস লোক আইসে তৎপর দিবস বেলা ২টার সময় আমার জন্মভূমি ও সহপাঠীদিগকে ত্যাগ করিয়া মনের আনন্দে গুপ্তিপাড়ার ঘাটে পার হইয়া শান্তিপুর হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে রানাঘাট যাত্রা করি। এই আমার প্রথম ঘোড়গাড়ী আরোহণ, মন কত উৎসাহান্বিত। সন্ধ্যার সময়ে আমরা রানাঘাটের পদ্মলোচন ভট্টাচার্য্যের বাটিতে উপস্থিত হই। ঐ বাড়ীতে মাতাঠাকুরাণীর মাসিমাতা বাস করিতেছিলেন। ঐ বাটী মাতার মাসীর বাড়ী। কত আনন্দ—রেলের গাড়ীতে চড়িয়া নলডাঙ্গায় যাইব। এই জন্য যেন রাত্রি প্রভাত হয় না। প্রভাত হইবামাত্র আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ষ্টেশনাভিমুখে আমরা তিন জনে যাত্রা করিলাম। মনে কত আহ্লাদ—মনে এই হইতেছিল যেন, হয়ত আর কখনও গাড়ী চড়িতে পাইব না। এইরূপ অসীম আনন্দের সহিত ষ্টেশনে পৌঁছিলাম; বেলা ৯ ঘটিকার সময় ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া উপস্থিত, টিকিটপত্র পুর্ব্বেই লওয়া হইয়াছিল। পরম আনন্দের সহিত আমরা

তিন জনে দাঁড়া-শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলাম। কতক্ষণ গাড়ী চলিতে সুরু করিবে, এই বিষয়ে অধীর হইয়া পড়িলাম। ঐ বৎসর বর্ষার সময়ে আমরা যাইতেছিলাম। বগুড়া ও আড়ংঘাটের মধ্যবর্ত্তী রেল রাস্তার উপর পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছিল। গাড়ী যখন জলের উপর দিয়া চলিতে সুরু করিল, তখন আমার কত আনন্দ ভগবানই জানেন। আহ্লাদ আর মুখে ধরে না কারণ মাতুল বাড়ী যাইতেছি, তথায় লেখাপড়া শিখিব। লেখাপড়ার বিষয় কিন্তু মনে অহরহ জাগরুক ছিল। মাতা ভিন্ন ইহ-সংসারে আর একজন যে আত্মীয় আছেন ইহা শ্রুত হওয়া অবধি সেই মাতুলকে দেখিব এই আনন্দে গুপ্তিপাড়ার সকল সহচরকে ভুলিয়া যাইলাম। দুই ষ্টেশন পরেই আমাদিগের নির্দ্ধারিত কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল; এত শীঘ্র যে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হইবে, এই কথা শুনিয়া বড়ই বিরক্ত হইলাম। নলডাঙ্গার লোক আমাদিগকে দোকড়ি বিশ্বাসের দোকানে লইয়া উপস্থিত হইল। তখন আর কোন চিন্তা নাই কেবল নলডাঙ্গা যাইবার জন্য মন উদ্বিগ্ন হইল। আমি কখনও গো-শকটে চড়িয়া কুত্রাপি যাই নাই, শুনিলাম আমাদিগকে ভ্যাগাড়িতেই যাইতে হইবে, শুনিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইল। ঈশ্বরও রাত্রি অল্প সময়ের মধ্যে আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই যেন একখানি গাড়ী ঐ দোকানির দ্বারাই মিলাইয়া দিলেন। আমাদিগকে লইয়া ক্যাঁচ কোঁচ করিতে করিতে কত গ্রামের মধ্য দিয়া গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল এবং সময়ে সময়ে চালক বলদদিগকে কতই মধুর ভাষায় আপ্যায়িত করিতে লাগিল। আমার চক্ষু কিন্তু গাড়ীর ভিতরে নাই, বাহিরের পথ-পার্শ্বস্থ গ্রাম দেখিতে দেখিতে চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা রাত্রিতে ৯ ঘটিকায় সময় মাতুল মহাশয়ের তালুক তালিনা গ্রামে উপস্থিত হইলাম। সেই গ্রামে তৎকালিন মাতুল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। ঐ সময়ে আমার সর্ব্বাঙ্গে ভয়ানক খোস্-পাঁচড়া ছিল, তজ্জন্য আমাকে ব্যঞ্জন বর্ণের “দ”য়ের

গত হইয়া চলিতে হইত। একটী কথা বলিয়া রাখি—মাতাঠাকুরাণীর নিকট জ্ঞাত ছিলাম যে, আমার যখন ১৩ দিবস মাত্র. বয়ঃক্রম' ঐ সময় হইতে ঐ ব্যাধিতে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলাম। মাতুল মহাশয় কি প্রকার, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই যেমন মন অস্থির ছিল, বিধি তাঁহাকে ঐ গ্রামের কর্ম্মকারের বাড়ীতেই দেখাইয়া দিলেন। যতদূর মনে ধারণা ছিল, তত দূর নহেন; তিনি দেবতা নহেন—মানুষ, তবে দেখিতে সুপুরুষ, বয়ঃক্রম আন্দাজ ৩০ বৎসর। আমাদিগকে তিনি কতই যত্ন আদর করিলেন। রাত্রে আমাদিগের আহার তথায় নির্ব্বাহ হইল। আহারান্তে মাতুল মহাশয় আমাকে লইয়া কাছারিতে শয়ন করিতে যাইলেন। মাতাঠাকুরাণী ঐ কর্ম্মকারের বাটীতে শয়ন করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে আমরা নলডাঙ্গায় যাত্রা করিলাম। মাতাঠাকুরাণী ডুলিতে যাইতে লাগিলেন, আমার অদৃষ্টে কিছুই হইল না। যদিচ কাছারিতে একটী পায়রা রংয়ের ঘোড়া ছিল; আমি অতি গরীব, ঘোড়ায় চড়িতে অপারগ এবং তাহা ভিন্ন খোসে সর্ব্ব শরীর জর্জ্জরিত, ঘোড়ায় চড়িবার বা চেষ্টা করিবার সাহস করিলাম না। তবে একবার ডুলি চড়িতে বড়ই ইচ্ছা হইল, এ আবার কেমন চলে সুতরাং মাতাঠাকুরাণী সে সাধ হইতে বঞ্চিত করিলেন না। ডুলি যখন চলিতে আরম্ভ করিল প্রথমে কতই আনন্দের সহিত চড়িলাম। এক রসি পথ যাইতে না যাইতে আমার সর্ব্ব শরীর যেন ভগ্ন হইবার উপক্রম হইল এই জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া উক্ত ডুলি হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইলাম। বেলা ১০টার সময় নলডাঙ্গার মাতুল বাটীতে উপস্থিত দেখি প্রকাণ্ড বাটী, দ্বারে সিংহ বিরাজমান, অন্দর ও বাহিরে পুষ্করিণী লোকজন চাকরবাকরে বাটীটী যেন পরিপূর্ণ, দেখিয়া মনে কত আনন্দ হইল পাঠককে তদ্বিষয়ে কি বলিব। আমার অদৃষ্টে মাতুল ভিন্ন আরও কয়েক জন আত্মীয়ের সহিত ভগবান সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। ইহার

২।৩ দিবস পরেই মাতুল মহাশয়ও নলডাঙ্গায় প্রত্যাগমন করিলেন। মাতুল মহাশয়ের ১ পুত্র ও ১ কন্যা এবং আমার মাতুলানী সকলেই তখন বাটীতে ছিলেন, আমাকে বড়ই আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। আমার মাতুল পুত্রের নাম ভোলা ওরফে কালীপ্রসন্ন ও মাতুল কন্যা গিরিবালা ইহারা অতি শিশু। বাটীতে একজন মুহুরি কার্য্যকারক ছিলেন। ইহা ভিন্ন মাতুলের ২টী নীলের কুঠি ও জমিদারিতে নায়েব গমস্তা অনেক ছিল। ইঁহার জমিদারীর আয় ২,০০০৲ টাকা ছিল। ইহা ভিন্ন নীল-কুঠির আয় পৃথক্ ছিল। এই গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বাস। সকলেই রাজা মহাশয়দিগের কুটুম্ব ও স্ববংশীয়; মুল কথা সকলেই ধনি। প্রধান রাজা মহাশয় নিজ নলডাঙ্গা হইতে অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে গুঞ্জনগরে বাস করিতেছিলেন। তথায় একটী ইংরাজী মধ্যম শ্রেণীর স্কুল, রাজার নিজ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু নলডাঙ্গা গ্রামখানি গুপ্তিপাড়ার মত তত বড় নহে, ভাল রাস্তাঘাটও ছিল না। একটা বাজার গ্রামের প্রান্তে ছিল। এ দেশের লোকের কথা শুনিয়া আমি আর হাসিয়া বাঁচি না। আমাকে দেখিয়া আবার ঐ দেশের লোকেরাও হাসিয়া ব্যাকুল। তাঁহারা বলেন, আমার কথা কেমন ব্যাঁকা ব্যাঁকা। এই কথা শুনিয়া আমি ধারণা করিতে পারিলাম না; কোন্ কথা ভাল ও কোন্ কথা মন্দ। আমার মাতুল মহাশয় বলরাম ঠাকুরের সন্তান অর্থাৎ আমার স্বজাতি অথচ মাতুল। ইঁহার পিতামহ ৺কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাজবাটীতে কুলভঙ্গ করিয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তৎকারণ রাজার এই সকল সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ঐ স্থানে ২।১ দিবস আসিবার পরে একটী অভাব হইয়া পড়িল অর্থাৎ খেলা করিবার সাথি পাই না তাহাতে মনোকষ্ট হইল। এই গ্রামে সপ্তাহে ২ দিন বৈকালে হাট হইয়া থাকে। আমি একদিন হাট দেখিতে যাই, হাটটী ভাল বলিয়া বোধ হইল না কারণ হাটে ইষ্টক নির্ম্মিত একটীও ঘর দেখিলাম না। তৎপর দিবস প্রাতঃকালে আমি একটী থামের

মাথার উপর হইতে পারাবতের শাবক পাড়িতে উদ্যত হইয়াছি, পাড়ার আমার একটী সমবয়স্ক বালক নিম্নে দাঁড়াইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া মন এতাদৃশ আনন্দরসে আপ্লুত হইল যে, পারাবত পাড়িবার কথা বিস্মৃত হইলাম। নিম্নে নামিয়া তাঁহার সহিত বহুক্ষণ আলাপ করিয়া তৃপ্তি হইল না, তিনি আমাকে তাঁহার বাটিতে লইয়া গেলেন। তাঁহার বাটী আমার মাতুল বাটীর অতি সন্নিকট। তিনি আমার নলডাঙ্গার প্রথম ও প্রধান সহচর, তাঁহাকে পাইয়া আমি কতই কৃতার্থ হইলাম। তিনি গ্রাম সম্বন্ধে আমার মাতুল, নাম লালু ওরফে শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন চট্টোপাধ্যায়। নলডাঙ্গা গ্রামে প্রায় অধিকাংশ পুরুষ আমার মাতুল সম্বন্ধীয় ও স্ত্রীলোক মামী ও মাসি সম্বন্ধে ছিলেন। আমরা দুই জনে দিবারাত্রি এক স্থানে থাকিতাম কিন্তু তিনি আমাকে পূর্ব্ব গুরুমহাশয়ের মত সময়ে সময়ে প্রহার করিতে ছাড়িতেন না, আমার অপরাধ এই যে তাঁহার মত বাঙ্গাল সুরে কথা কহিতে পারিতাম না। যাহা হউক এত প্রহার খাইয়াও তাঁহার সহিত পৃথক্ স্থানে থাকিতাম না।

ছাত্র জীবন

কয়েক দিবস এইরূপে গত হইলে পর, মাতুল মহাশয় একদিন আমাকে রাজবাটীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ইংরাজী প্রথম ভাগ পুস্তক গুপ্তিপাড়াতে শেষ করিয়া আসি; এস্থানে সেকেণ্ড বুক পড়িতে আরম্ভ করি। নলডাঙ্গার তিন আনা ষোল কড়ার রাজার দত্তক-পুত্র কুমার সৌরেশচন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের বাড়ীতে রাজবাটীর স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকিতেন; তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ গুপ্ত, তাঁহার

নিকট গ্রামের যত ছাত্র প্রাতঃকালে যাইয়া পাঠাভ্যাস করিত। সুতরাং আমিও তথায় যাইতাম। এই সময়ে আমার প্রথম ও প্রধান বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নলডাঙ্গার নিকট ছাঁছড়া গ্রামের তালুকদার মহাশয়ের বাটীস্থ স্কুলে পড়িতে যান। আমার ৮।৯টী নূতন সহচর জুটিল। সময়ে সময়ে মাষ্টার মহাশয়ের তালপত্র নির্ম্মিত পাখা দ্বারা আমাদিগের পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম হইত। নলডাঙ্গায় সমবয়স্কদিগকে পাইয়া গুপ্তিপাড়ার বাল্যবন্ধুদিগকে ভুলিয়া গেলাম। ইংরাজী সেকেণ্ড বুক পুস্তক শেষ করিয়া ডবল্ প্রমসন পাইয়া সেকেণ্ড ক্লাসে উঠি ও রুডিমেণ্টস্ অব্ নলেজ্ পড়িতে আরম্ভ করি। অতিরিক্ত এক বৎসর ঐ পুস্তক ও অন্যান্য বাঙ্গলা পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ১৮৭৫ সালে মাগুরায় মাইনর পরিক্ষা দিতে ঝিনাইদহ হইতে নৌকা যোগে আঠরখেদা মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ী পৌছাই। তিন আনার রাজামহাশয়ও আমাদিগের সহিত পরিক্ষা দিতে তথায় যান। মাষ্টার মহাশয়ের অসীম যত্নে ও পরিশ্রমে অনেকেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ হই।

এই ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ড রাজেশ্বরীর মহামান্য প্রথম পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্ কলিকাতায় আগমন করেন। আমাদিগের ভাগ্যে কলিকাতায় মাষ্টার মহাশয়ের আতঙ্কে যাওয়া হইল না। আমাকে কলিকাতায় পড়াইতে মাতুল মহাশয়ের অভিপ্রায় হওয়ায় ঐ সনে শীতকালে গোপীনাথপুর হইয়া ডুলিযোগে চুয়াডাঙ্গায় যাই, তথা হইতে কলিকাতায় একাকী একজন বাবুর বাসায় রাত্রি ৮টার সময় পৌছাই। শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিয়া নানাপ্রকার দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হওয়ায় হতভম্ব হইয়া পড়ি। বলা বাহুল্য এইরূপ হইবারই সম্ভব; এমত সহর কখনও দেখি নাই। নলডাঙ্গায় আসিয়া আমার সুখ-সূর্য্যের উদয় হয়; বলা বহুল্য মাতুল মহাশয় মাতাঠাকুরাণীকে ১০০৲ টাকা আয়ের ভূমি-সম্পত্তি প্রদান করেন।

গুপ্তিপাড়ার যে সম্পত্তি ছিল সকলই মাতাঠাকুরাণীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দখল করিয়া বিক্রয় করেন। আমরা নলডাঙ্গায় মাতুল মহাশয়ের এক সংসারে কালযাপন করিতে থাকি। এই সময়ে নীল কুঠির কার্য্যের ক্ষতি হওয়ায় মাতুল মহাশয়ের ঋণ হয়; তজ্জন্য তালিনা গ্রামখানি পত্তনি দিয়া কতক ঋণদায় হইতে মুক্ত হন, কিন্তু একেবারে মুক্ত হইলেন না। এদিকে আমি কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকি। প্রতি মাসে কলিকাতায় ১০।১২৲ টাকা করিয়া খরচ হইত। কলিকাতায় আমার উদরদেবকে অনেক প্রকার মিষ্টান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতাম। পরমেশ্বরের অনুকম্পায় আমার সকল কষ্ট দূর হইল, মাতাঠাকুরাণী সুখী হইলেন। এই সময়ে নলডাঙ্গার রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় মহাশয়ের পিসি-পুত্র বাবু হরভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একটী অবৈতনিক যাত্রার দল গঠন করেন; ঐ দলে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি ছিল না, তরণীসেন-বধ পালা অভিনয় হইত। আমি রামের অংশ অভিনয় করিতাম। ইঁহার দলের ধরণ নূতন প্রকার ছিল অর্থাৎ কন্‌সার্ট বাদ্য ছিল।

ইহার কিছু দিবস পরে নলডাঙ্গা রাজমুন্সির পুত্র সরোজনাথ মুখোপাধ্যায় পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ পালা প্রস্তুত করেন। কলিকাতা হইতে অবকাশ কালীন নলডাঙ্গায় আসিয়া ঐ দলে অর্জ্জুনের অভিনয় করিতাম এবং তালিম হইতে আমাকে কিন্তু কোন স্থানে অভিনয় করিতে হয় নাই। এই দলটীও অবৈতনিক। কলিকাতায় থাকিতেই তামাক সেবন অভ্যাস হয়। কলিকাতার বিখ্যাত মহাত্মা বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের এনট্র্যান্স স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করি। ঐ স্কুলে মহেন্দ্র নামক একজন অধিক বয়স্ক বালক পাঠ করিত। তাহাকে মহেন্দ্র ষণ্ডা বলিয়া সকলেই আহ্বান করিত। ঐ লোকটী পণ্ডিত মহাশয়ের মস্তকে প্রতিদিনই বেঞ্চে বসিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিত কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় অতি শান্ত প্রকৃতির লোক, কিছুই বলিতেন না। অঙ্ক বিদ্যার শিক্ষক যখন

আমাদিগকে অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা দিতে আসিতেন ঐ সময়ে শিক্ষক মহাশয়ের কাষ্ঠাসনে থুঁথু ফেলিয়া রাখিত, তিনি আসিয়া ভয়ানক প্রহার করিতেন। আমরা ৩য় শ্রেণীতে প্রায় ৬০ জন বালক ছিলাম। পড়াশুনা মন্দ হইত না তবে ঐ দুষ্ট বালকটীর জন্য অনেক সময় শিক্ষকের নিকট উপদেশ শুনা কঠিন হইত। এই সময়ে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী টালিগঞ্জে চৈত্রমাসে রাস হইত। আমাদিগের উড়েপাড়া ৮নং বাসার সকল ছাত্র সমবেত হইয়া রাত্রি ৮৷৷০ ঘটিকার সময় আহারান্তে রাস দেখিতে নৌকাযোগে গমন করি। নৌকাতে ডুগি-তবলা ও তাস খেলিবার আয়োজন ছিল, আমরা আমোদ করিতে করিতে অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে গঙ্গায় পড়িলাম। সে সময়ে ভাঁটা পড়ায় নদীস্থ জল কিছুমাত্র না থাকায় জোয়ারের প্রত্যাশায় একস্থানে নৌকা রক্ষা করিয়া তাস খেলা ও গান প্রভৃতি চলিতে লাগিল। আমি নৌকার উপরে বসিয়া শোভা সন্দর্শন করিতেছিলাম। আন্দাজ ১৫ মিনিট পরে দূরে ঝড়ের ন্যায় একটী গোঁ গোঁ শব্দ শ্রুতিগোচর হওয়ায় অনুসন্ধানেচ্ছু হইয়া জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম, বড় গঙ্গায় জোয়ার আসিয়াছে; ক্ষণকাল মধ্যে কাটি গঙ্গায় জোয়ার হইবে। এই কথা বলিয়া নৌকার মাল্লাগণ শিকল হস্তে জলে লাফাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে জোয়ারের জল অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে নদীর দুই কিনারা সমান হইয়া জল আসাতে জ্যোৎস্নালোকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হওয়ায় আমারা নৌকার ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নৌকার ভিতরে ভয়ে সবল-হস্তে কাষ্ঠাসন ধারণ করিয়া রহিলাম; দেখিতে দেখিতে নৌকাকে একবার উর্দ্ধ একবার নিম্নগামী করিয়া—আমাদের মস্তক কথঞ্চিৎ আঘাতীত করিয়া—নক্ষত্র বেগে জল চলিয়া গেল এবং নৌকাখানি যেমন নদীর তলদেশে পূর্ব্বে ছিল এখন উর্দ্ধে উঠিল। এই দৃশ্য এই আমার প্রথম দৃষ্টিগোচর হইল। আমাদিগের নৌকার অতি নিকটে আর একখানি নৌকা জোয়ারের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিল; কিন্তু মাঝি খুব সতর্ক না থাকায় জলের

জোরে তীরবৎ উড়াইয়া লইয়া গেল, কিন্তু আহ্লাদের বিষয় ঐ নৌকা রক্ষা পায়, কারণ আমরা টালিগঞ্জে পৌঁছিয়া সেই নৌকা দেখিতে পাইলাম। টালিগঞ্জের ঘাটে যাইয়া দেখিলাম, শত শত নৌকাতে এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। মণ্ডল মহাশয়দিগের দুইটী বাটীতে রাসের যাত্রা সন্দর্শন করিয়া ঐ রাত্রের মধ্যেই কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম। আমি যে বাসায় ছিলাম তথায় আমাপেক্ষা অধিক বয়স্ক নলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিহারীলাল দত্ত ডাক্তারী স্কুলে পড়িতে ছিলেন। একদিন তাঁহার সহিত রাসায়নিক বিদ্যার বক্তৃতা শুনিতে শিয়ালদহ ক্যাম্বেল স্কুলে যাই; নানাপ্রকার রাসায়নিক বিদ্যার পরীক্ষা ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মন আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইল। তৎপর দিবস মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, ডাক্তারী বিভাগে পড়িতেই হইবে। মাতুল মহাশয়কে কোনরূপ সংবাদ না দিয়াই ১/১৫ সম্বল লইয়া নলডাঙ্গায় রওনা হইলাম। আমার পাঠ্যকালে ই, বি, রেলওয়ে দাঁড়া-শ্রেণীর বা চতুর্থ শ্রেণীর গাড়ী ছিল। কলিকাতা হইতে কৃষ্ণগঞ্জ পর্য্যন্ত ঐ শ্রেণীর ভাড়া ১৫ নির্দ্ধারিত ছিল সুতরাং একখানি টিকিট খরিদ করিয়া প্রাতঃকালের গাড়ীতে রওনা হইলাম। কৃষ্ণগঞ্জে প্রায় ১১টা বেলার সময়ে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম; ঐ সময়ে আমার বয়স আনুমানিক ১৫।১৬ বৎসর।

গ্রীষ্মকাল—ঘটনাক্রমে ছত্র-দণ্ডটী পর্য্যন্ত কলিকাতায় ফেলিয়া আসিয়াছি; এদিকে পথ-সম্বল /১০ পয়সা, কৃষ্ণগঞ্জ হইতে ১৬ ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। ষ্টেশনে নামিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িলাম; এতদূর পথ যাইতে মনে এক প্রকার ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল—কি প্রকারে এত দূর পথ চলিব—উদরকে কি দিয়া শান্ত করিব—এতদ্ভিন্ন দারুণ রৌদ্রে কি উপায়ে পথ চলিয়া যাইব, এইরূপ নানা ভাবনায় মন ম্রিয়মান হইতে লাগিল। আবার মনের স্বধর্ম্ম—প্রবোধ আসিয়া সকল ঝড় উড়াইয়া দিল। তখন কলিকাতার প্রতিজ্ঞা মনে জাগরুক হওয়ায় মনকে দৃঢ় করিয়া

ফেলিলাম। তথায় যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ শেষ করিয়া চলিতে লাগিলাম; রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে কোটচাঁদপুরের অতি নিকট দুধসরে উপস্থিত হইলাম। যে সময়ে তথায় উপস্থিত হই, তাহার প্রায় ১ ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই ভয়ানক ঝড়, বৃষ্টি এবং মেঘ গর্জ্জন করিতেছিল। বলা বাহুল্য, আমার পরিধেয় বস্ত্র জলে সিক্ত ও ভয়ে অতিশয় ভীত হইয়াছিলাম। এই গ্রামের ১ মাইল পশ্চিমে বারমাসের খাল এবং তাহার প্রকাণ্ড সেতু ভূতের আবাসভূমি এইরূপ কিম্বদন্তি ছিল। যে সময়ে আমি ঐ স্থানে উপস্থিত হই, প্রাণে যে কি আতঙ্ক হইয়াছিল তাহা অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন। রাত্রে উল্লিখিত গ্রামের জনৈক কুম্ভকারের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ১০ ক্রোশ পথ চলিয়া আমার পদ স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও শরীর ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়াছিল; মোটকথা, শরীর একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত কুম্ভকারের বাড়ীতে একটী অধিক বয়স্কা বৃদ্ধা আমাকে পুত্রবৎ যত্ন করিতে লাগিলেন; ঐ রাত্রে চিড়া ও গুড় সম্বল করিলাম। আহারান্তে তাহাদের প্রদত্ত শয্যায় শয়ন করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইলাম। বৃদ্ধাটী অনেক রাত্র পর্য্যন্ত আমার বেদনাযুক্ত পদদ্বয়ে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিয়াছিলেন। পর দিবস, প্রাতে প্রায় ১০ ঘটিকার সময়ে নলডাঙ্গায় হঠাৎ আমাকে উপস্থিত দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অসময়ে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় এই উত্তর প্রদান করিলাম—"৺ স্বরস্বতী দেবীর স্বপ্নাদেশ হওয়ায় ইংরাজী পড়া বন্ধ করিয়াছি এবং আগামী জুন মাসে ডাক্তারী স্কুলে ভর্ত্তি হইব।" ইহা শ্রবণ করিয়া আমার মাতাঠাকুরাণী এবং মাতুল মহাশয় অনেক প্রকার সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় ইংরাজী পড়িতে বিশেষরূপে জেদ করিলেন। গ্রামস্থ অপরাপর ভদ্রলোকও আমাকে বারংবার ইংরাজী পড়িতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু কিছুতেই আমার প্রতিজ্ঞাচ্যুত করিতে পারিলেন না।

শীতকাল—মাতুল মহাশয়ের সহিত কলিকাতায় গমন করিয়া ডাক্তারী প্রথম পুস্তক "ভৈষজ্য রত্নাবলী" খরিদ করিয়া নলডাঙ্গায় প্রত্যাগমন করিলাম। জুন মাসে মাইনর পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রশংসা-পত্র যশোহরের ডেপুটী-ইনেস্‌পেক্টর মহাশয়ের নিকট দাখিল করিয়া ডাক্তারী স্কুলে ভর্ত্তি হই। যতদিন বাটীতে ছিলাম ততদিন ডাক্তারী পুস্তকখানি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছিলাম সুতরাং কলিকাতায় স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া আপনার শ্রেণীতে পড়িতে মোটেই বেগ পাইতে হয় নাই। প্রথম বর্ষের ও দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হওয়ায় যথাক্রমে ২৲ ও ৭৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলাম। এই সময়ে আমার মাতুল, মাতুলানি এবং মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি সকলেই কলিকাতায় বায়ু পরিবর্ত্তন মানসে আগমন করেন। ২০ নং রাজার লেনে তাঁহাদের বাসা নির্দ্ধারিত হয়। আমি ইহার পূর্ব্বে ৪ নং রাজার লেনস্থ ছাত্রাবাসে থাকিতাম। মাতুল মহাশয় এখানে আগমন করায় আমি ছাত্রদিগের বাসা পরিত্যাগ করিলাম কিন্তু পড়াশুনা পূর্ব্ববৎ তথায় চলিতে লাগিল। যৌবন কালের প্রারম্ভে নানারূপ বিঘ্ন আসিয়া পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটায় কিন্তু জগদী-শ্বরের কৃপায় ততদুর উৎপাত পরিলক্ষিত হয় নাই। এই সময়ে আমার মাতাঠাকুরাণী এবং মাতুল মহাশয় আমাকে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে চেষ্টিত হন এবং আমাদিগের বাসার অতি নিকটে হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। কিছু দিবস পরে মাতুল মহাশয় কৃষ্ণ বাবুর আন্তরিক মতলব পরম্পর জানিতে পারেন যে,—"বিবাহান্তে তাঁহার কন্যাকে নলডাঙ্গায় না পাঠাইয়া কলিকাতায় বাটী করাইয়া দিবেন এবং কন্যা জামাতা নিকটে রাখিবেন।" ইহা শ্রবণ করিয়া গোপনে অন্যত্র সম্বন্ধ স্থির করিতে লাগিলেন। এদিকে যে কোন ভদ্রলোক কৃষ্ণ বাবুর বৈঠকখানায় আসেন, আমাকে ভবিষ্যৎ-জামাতা ধার্য্য করিয়া সকলকে দেখাইতে লাগিলেন।

মূল কথা—কৃষ্ণ বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী আমাকে জামাতা-জ্ঞানে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন। গোপনে মাতুল মহাশয় কলিকাতার অনেক স্থানে সম্বন্ধ উত্থাপন করিতেছিলেন। এই সময়ে মাতুল মহাশয় এবং মাতাঠাকুরাণী ৺বৈদ্যনাথ-তীর্থ দর্শন অভিপ্রায়ে আমার উপর কলিকাতার সংসারের ভার অর্পণ করিয়া চলিয়া যান।

এমন সময়ে গোস্বামী মালপাড়া হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৩য় শ্রেণীর ছাত্র বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতৃদেব আমার বিষয় অবগত হইয়া সুযোগক্রমে কলিকাতায় ৪নং রাজার নিস্থ ভবনে আসিয়া উপস্থিত হয়েন এবং আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে,—"আমার একটি অনুরোধ তোমায় রাখিতে হইবে।" আমি সরল-ভাবে প্রতিশ্রুতি হইলে তিনি বলিলেন,—"আমার একটী অদত্তা সুন্দরী কন্যা আছে, তাহাকে তোমার বিবাহ করিতে হইবে। কন্যাটী মনোনীত না হইলে তোমার বিবাহ করিবার দরকার নাই সুতরাং অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে মালপাড়া চল। কুলীনের বিবাহের বিশেষ করিয়া দিন দেখিবার দরকার নাই; ২।১ দিনের মধ্যেই যে দিন পাওয়া যাইবে সেই দিনে বিবাহ করিয়া চলিয়া আসিবে। কিছু নগদ টাকা পাইবে তাহা তোমার নিজের থাকিবে, মাতুলকে দিবার দরকার নাই।" আমি শুনিয়া অবাক্! আমি কহিলাম, নিজে স্বাধীন নহি যে স্বেচ্ছায় বিবাহ করিতে পারিব। বিশেষতঃ, এই কলিকাতায় আমার বিবাহের পাকা বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে সুতরাং আপনার অনুরোধ রাখিতে আমি অক্ষম; এ বিষয়ে আমাকে মার্জ্জনা করুন। ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণচিত্তে চলিয়া গেলেন।

মাতাঠাকুরাণী ও মাতুল মহাশয় ২।১ দিনের মধ্যে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন কারণ—পথিমধ্যে ভয়ানক গরম অনুভব হওয়ায় তাঁহাদিগের অদৃষ্টে তীর্থ দর্শন হইল না। আমি পাচক ব্রাহ্মণের দ্বারায়

উল্লিখিত বিবাহ সম্বন্ধীয় কথা অবগত করাই কিন্তু মাতুল মহাশয় তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। ধন্য প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! বলাগড় নিবাসী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বাসার অতি নিকটে বাস করিতেন; তিনি কোন ব্যাঙ্কে কার্য্য করিতেন। তাঁহার সহিত মাতুল মহাশয়ের পরিচয় হওয়ায়, তাঁহার সম্বন্ধে ভ্রাতা বলাগড় নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার সহিত আমার বিবাহের পাকা বন্দোবস্ত হইল। কন্যার পিতা বলাগড় স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক। এই সম্বন্ধের বিষয় আমি কিছুই জানিতাম না। যে দিবস গাত্র-হরিদ্রা ঐ দিবস জ্ঞাত হইলাম আমার বিবাহ। এই সময়ে আমার পিতার কুশপুত্তলি দগ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করা হয় এবং আমার বিবাহের দুই দিবস পূর্ব্বে আমার মাতুল-পুত্র শ্রীমান কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের শুভ উপনয়ণ কার্য্য কালীঘাটে ৺কালীমাতার মন্দির সম্মুখে সম্পন্ন করা হয়। রাজার লেনস্থ ভদ্রমহিলাগণ আমার বিবাহের এবং শ্রীমান ভায়ার উপনয়ণ উপলক্ষে স্ত্রী-আচার ইত্যাদি সম্পন্ন করেন, কিন্তু এই কার্য্য এত গোপনভাবে করা হয় যে, কৃষ্ণ বাবুর আত্মীয়স্বজন কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না। আমার বিবাহ হইবে তাহাতে আমার মনে যে আনন্দ হইয়াছিল তাহা বোধ হয় সুস্বসিদ্ধ। বিবাহের দিবস প্রাতঃকালে নলডাঙ্গাস্থ কয়েকজন ভদ্রলোকসহ আমরা পাল্কী ও অশ্বযানে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিলাম। প্রাতের গাড়ীতে রওনা হইয়া বেলা ৯ ঘটিকার সময় চাকদহ ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া তথায় আহারান্তে বলাগড় অভিমুখে পদব্রজে সকলে যাত্রা করিলাম। আমি যৎকিঞ্চিৎ জলপানান্তে পাল্কীতে চড়িয়া জশড়ীর ঘাটে পৌছিলাম, তথায় আমাদের জন্য বলাগড় হইতে নৌকা আসিয়াছিল; তাহাতে বৈকালে রওনা হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নির্দ্ধারিত ঘাটে পৌছিলাম। ঘাট হইতে ভাবি-শ্বশুরালয় অধিক দূর ছিল না। রাস্তার পার্শ্বে শ্বশুর বাটী দেখিয়া একটা পূর্ব্ব স্মৃতি

মনে উদয় হইল। পাঠক! মনে করিয়া দেখুন, এই রাস্তা দিয়া হাট-কাঁদা কুকুশপুরে একবার পূজার সময়ে যাত্রা করিতে গিয়াছিলাম।

রাত্রে বিবাহ কার্য্য শেষ হইলে পরদিবস বলাগড়ে থাকিয়া তৃতীয় দিবসে কলিকাতায় আমরা সকলে প্রত্যাগমন করিলাম; তথায় আসিয়া মহাগোলযোগ দেখিলাম, কারণ আমার বিবাহ সংবাদ কৃষ্ণ বাবুর কর্ণ-গোচর হওয়ায় উক্ত বাবুর একজন পরিচারিকা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ঐ সময়ে উপস্থিত হইল। এমন সুখের দিনে এরূপ ক্রন্দনের রোল বড়ই অশান্তিজনক। উক্ত দিবসে আমার নব-স্ত্রীসহ মাতাঠাকুরাণী এবং নীলু মামা প্রভৃতি নলডাঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন সকলকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছাইতে যাই, তখন আমার নব-স্ত্রীর প্রতি একটু মায়ার সঞ্চার হৃদয়ে অনুভূতি হইল। কয়েক দিবস পরে নলডাঙ্গার পত্রে জ্ঞাত হইলাম, কৃষ্ণগঞ্জ হইতে যাইবার সময় ঘোড়ার গাড়ী পথিমধ্যে উলটিয়া পড়িয়াছিল; তাহাতে অনেক কষ্টে সকলে রক্ষা পায় তবে সকলেই কিছু না কিছু আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমি এদিকে মলঙ্গা লেনে দুইটী সমপাঠিসহ একটী বাসাতে পরীক্ষার পুস্তকাদি মনো-যোগসহ পাঠ করিতেছিলাম। যথা সময়ে পরীক্ষা দিয়া চিকিৎসা-তত্ত্বে বিফল মনোরথ হইয়া অশান্তি-সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। চিকিৎসা-তত্ত্বের প্রধান অধ্যাপকের অনুরোধে বড় কলেজের প্রধান ডাক্তার সাহেব আমাকে পুনরায় পরীক্ষা করিলেন; এবারে সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম।

সাংসারিক জীবন

কিছুদিন পরে নলডাঙ্গার বাটীতে আসিয়া স্বাধীনভাবে ঔষধালয় খুলি। নলডাঙ্গাস্থ তিন আনার রাজা সৌরেশচন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের নিকট হইতে ১০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়া কলিকাতা হইতে ঔষধ প্রভৃতি আনিয়া ব্যবসা করিতে লাগিলাম। ব্যবসায় দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল কিন্তু বিলাসিতায় উপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করিতে লাগিলাম। যাহা আয় হইতে লাগিল তাহা ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হইল কিন্তু মহাজনের টাকা পরিশোধ করিতে পারিলাম না। ঐ সময়ে মাতুল মহাশয়ের বাটীর অতি নিকটে একটী কাঁচা বাটী প্রস্তুত করিলাম; ইহাতে মাতুল মহাশয় আন্তরিক দুঃখিত এবং রাগান্বিত হন। আমি বাটী প্রস্তুত করিয়া সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমার স্ত্রীর বয়ঃক্রম ১১ বৎসর মাত্র। নলডাঙ্গাস্থ যে সকল ভদ্রলোকের নিকট দর্শনী এবং ঔষধের মূল্য বাকী পড়িল তাহা আর ওয়াশীল হইল না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গ্রামস্থ লোক ও অপরাপর স্থানীয় লোককে দাতব্য ঔষধ দিতে হইত, তজ্জন্য অল্পদিনের মধ্যেই ঔষধগুলি নিঃশেষ হইয়া গেল। ইহার ফলে আমার চিকিৎসা কার্য্য একবারে অচল হইয়া পড়িল; তবে এই সময়ে একখানি কাঁচা বাটী যে করিয়াছিলাম তাহাই যাহা লাভ। একদিন মাতাঠাকুরাণীর সহিত সামান্য বচসা হওয়ায় বাটী হইতে বহির্গত হইবার মনস্থ করিলাম এবং মনে মনে স্থির করিলাম কলিকাতা যাইয়া যে কোন স্থানে চাকরী স্বীকার করিয়া চলিয়া যাইব।

কিছুদিন পরে কলিকাতায় আসিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সেক্রেটারী এবং প্রধান ডাক্তার সাহেবের নিকট চাকরী-প্রার্থীত হইয়া আবেদন করিলাম। চাকরীর বাজার পূর্ব্বাপর প্রায় সমভাবেই ছিল। আবেদনের উত্তর পাইলাম—আপাততঃ খালি নাই। কোন লোকের পরামর্শে ঐ কোম্পানীর প্রধান কেরাণীবাবু রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পূজা দিবার কথা উত্থাপন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইলেন; পরে জ্ঞাত হইলাম, এইটী তাঁহার বাহ্যিক ভাব। পরক্ষণেই আমার প্রতি সদয়ভাব প্রকাশ করিয়া পর দিবস প্রাতে তাঁহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিতে কহিলেন। আমি তদনুসারে পর দিবস প্রাতে তাঁহার প্রকাণ্ড বাটীতে সাক্ষাৎ করিয়া দেখিলাম, গজ-রাজকে দুইজন কিঙ্কর তৈল মর্দ্দন করাইতেছে। আমার প্রতি এই আদেশ হইল যে, আমি যেন ক্ষণকালের জন্য তাঁহার নিম্নতলস্থ বৈঠকখানায় অপেক্ষা করি। আমি তাহাই করিলাম,—কিছুক্ষণ পরে আমাকে আহ্বান করিলেন; তাঁহার নিকটস্থ হইলে, কত টাকা পূজা দিতে সক্ষম হইব জিজ্ঞাসা করিলেন। লজ্জায় আমার বাক্য নিস্বরণ হইল না, শেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া বিনীতভাবে বলিলাম,—১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ধার কর্জ্জ করিয়া দিতে পারি। বাবুর যাহা লাভ এইটী মনে করিয়া কহিলেন,—"ডাক্তারী চাকরী প্রথম খালি হইলেই তুমি পাইবে।" এই কথোপকথনের পরে আমাকে বলিলেন, মাঝে মাঝে তুমি আমার সহিত অফিসে সাক্ষাৎ করিও। আমিও কয়েক দিবস হাটাহাটি করিলাম কিন্তু আমার ও বাবুর অদৃষ্ট মন্দ বশতঃ আর চাকরী খালি হইল না। এদিকে কেবল এই বাবুর উপর নির্ভর না করিয়া অনেক স্থানে চাকরীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। পরম্পর জ্ঞাত হইলাম, বামালরি কোম্পানীর আসামস্থ চাবাগানের জন্য একটী ডাক্তারের পদ শূন্য হইবে;

তাহা শ্রবণ করিয়াই আবেদন করিলাম। ঐ কোম্পানীর এজেণ্ট সাহেব বাহাদুর আমার ডিপ্লোমাখানি দেখিয়া কহিলেন যে,—"তুমি যদি তোমার অধ্যাপকের নিকট হইতে প্রশংসা-পত্র আনিতে পার তাহা হইলে এই চাকরী পাইতে পার।" তদনুসারে আমি ডাক্তার কানাই লাল দে রায় বাহাদুর, ডাক্তার দয়ালচন্দ্র সোম, অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার জহরুদ্দিন সাহেব এবং সুবিখ্যাত ডাক্তার জগবন্ধু বসু মহাশয়দিগের নিকট হইতে পৃথক্ পৃথক্ উত্তম প্রশংসা-পত্র সংগ্রহ করিয়া উল্লিখিত আমার কোম্পানীর অফিসে উপস্থিত হইলাম। সাহেব বলিলেন, "যে ডাক্তার বাবুটী কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন লিখিয়াছিলেন, তিনি এখন ছাড়িবেন না অতএব আপনার চাকরীর আশা এখানে নাই।" আমি নিরাশ হইয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে বাসায় ফিরিলাম। এত কষ্ট ও তোষামোদ করিয়া প্রশংসা-পত্রগুলি সংগ্রহ করিলাম, সকলই ব্যর্থ হইল। যাহা হউক, পরিশেষে উইলিয়ম্‌স্ মেজর কোম্পানীর তেজপুরের অন্তর্গত একটী চা বাগানের ডাক্তার হইয়া এক বৎসরের চুক্তিতে ৫০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলাম। এজেণ্ট সাহেব এক মাসের বেতন অগ্রিম দিয়া আমার জামিন স্বরূপ ডিপ্লোমা ও প্রশংসা-পত্রগুলি হস্তগত করিলেন। এই নিয়োগ-পত্র পাইয়া বাসায় ফিরিলাম।

আমি ২।৪ দিবস মধ্যে সপরিবারে আসামে রওনা হইব এই মানসে নলডাঙ্গায় রওনা হই। আমার অতি শীঘ্রই নলডাঙ্গায় প্রত্যাগমন এবং অনেক দূর দেশে চাকরী হওয়া সংবাদে সকলেই দুঃখিত হইলেন। আমি আমার বালিকা স্ত্রী এবং মাতুল-পুত্র শ্রীমান কালীপ্রসন্ন ভায়াসহ সপ্তমী পূজার দিন গো-যানে চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইয়া অষ্টমী পূজার দিন বৈকালে আমরা চুয়াডাঙ্গা হইতে গোয়ালন্দ অভিমুখে বাষ্পীয়-শকটে রওনা হইলাম। এই সময়ের ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-বঙ্গ রেলপথ সাঁড়া হইতে খোলা হইয়াছে। আমরা

অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় গোয়ালন্দ পৌঁছিলাম। হায় আমার কপাল! ষ্টেশনটি দেখিয়াই আক্কেল গুড়ুম্ কেননা পূর্ব্ব হইতে আমার এইরূপ ধারণা ছিল যে রেলওয়ের প্রথম এবং শেষ এই দুইটী ষ্টেশন খুব বড় এবং সজ্জিত হইয়া থাকে কিন্তু ধারণার বিপরীত দেখিলাম,—খড়ের দুইখানি সামান্য ঘর এই পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলওয়ের শেষ ষ্টেশন। যাহা হউক আমরা ঐ ষ্টেশনে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নৌকাযোগে ষ্টীমার ঘাটের অতি নিকটে একটী বাসা ভাড়া করিলাম। পাঠক! আমাদের অদৃষ্ট উপলব্ধি করুণ, বাঙ্গালী জাতির ধনী, নির্ধনী, সকলেই এই মহামায়ার পূজার সময়ে বিদেশ হইতে নিজ নিজ আবাসে আগমন করিয়া—সকল বন্ধুবান্ধব সমবেত হইয়া—সংসার দুঃখ বিস্মৃত হইয়া—কত আনন্দে এ কয়টী দিন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। আজ আমি একজন বাঙ্গালী হ'য়ে দাসখত লেখাইয়া গোলামী করিতে সুদূর দেশে আসিয়া অষ্টমীর দিবস মহাভয়ঙ্কর পদ্মা নদীর তীরে একখানি পর্ণ কুটিরে নিজের অদৃষ্টের উপর ধিক্কার দিতেছিলাম। আমরা যে দিবস গোয়ালন্দে পৌঁছিলাম ঐ দিবসই বাখরগঞ্জ হইতে উক্ত স্থানে ডিব্রুগড়ের ষ্টীমার আসিবার কথা; ঐ ষ্টীমারে যাইবার আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাশ ছিল; কিন্তু ঘটনাক্রমে উহা আসিতে ৩।৪ দিন বিলম্ব হইয়া পড়িল।

উক্ত বৎসর অর্থাৎ ১৮৮২ অব্দে বিজয়া দশমীর দিবস ভয়ানক ঝড় বা খণ্ড-প্রলয় হইবার কথা পঞ্জিকাতে লিখিত ছিল। পঞ্জিকাতে ইহাও লিখিত ছিল যে, মহাভারতের কুরুগণ যে দুঃসময়ে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধযাত্রা করেন ঠিক ঐ নক্ষত্র দোষ এই বিজয়ার দিবসে পতিত হইয়াছিল; ইহাতে ভয়ানক দুর্ঘটনা হইবার কথা। আমি গোয়ালন্দের কুটিরে বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছি যে, মহামায়ার বিজয়ার সহিত আমাদিগেরও না হয় বিজয়া হউক তাতে ক্ষতি কি? কিন্তু পরক্ষণেই আর এক

চিন্তায় হৃদয় আন্দোলিত করিতে লাগিল যে, যদি মহামায়া তাঁহার সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তো মনের আনন্দে ভবধাম পরিত্যাগ করিতে পারিব না, কারণ ভবিষ্যতে আমা বিহনে দুঃখিনী মাতাঠাকুরাণীর দশা কি হইবে? তিনি যে আমা বিহনে এক দণ্ড জীবনধারণ করিতে পারিবেন না; যদিও এই পৃথিবী পরিত্যাগ না-ই করেন, তবে ভবিষ্যতে তাঁহার দশা কি হইবে? দ্বিতীয় কথা, বালিকা স্ত্রী এত অল্প বয়সে পিতামাতা পরিত্যাগ করিয়া সুদূর আসাম দেশে আমার সহিত যাইতেছে; আমার সহিত ভবধাম পরিত্যাগ করিলে তাহাতে তাহার ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ পুণ্য হইবে কিন্তু এই নিদারুণ সংবাদ যখন তাহার পিতামাতার কর্ণগোচর হইবে তখন তাঁহারা মনে কি দারুণ শোক পাইবেন! বিশেষতঃ তাহার পিতার প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও পুত্রগণ ভাগিরথীতে অকালে নৌকাডুবী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, তাহাতে তিনি জীবনে মৃতবৎ হইয়া রহিয়াছেন। এই সংবাদে পূর্ব্ব শোক স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে হয়ত জীবন ত্যাগও হইতে পারে। তৃতীয় কথা,—শ্রীমান কালীপ্রসন্ন বালক, আমার মাতুল মহাশয়ের একমাত্র পুত্র; তিনিও পুত্র বিচ্ছেদে জীব-লীলা সাঙ্গ করিতে পারেন। আমার মনে ইহাও উদয় হইল যে, এ পর্য্যন্ত দুঃখে কাল কাটাইলাম, এখন পর্য্যন্তও সুখের লেশমাত্র অনুভব করিতে পারি নাই; যদিও অনেক কষ্টে যে টুকু বিদ্যা উপার্জ্জন করিলাম কথঞ্চিৎ ধন উপার্জ্জন করিয়া জীবনের কতক অংশ সুখে কালযাপন করিতে পারিব এবং দুঃখিনী মাতাঠাকুরাণীকে সুখী করিব, সুতরাং মরিব কেন? পরিশেষে মনে মনে এই স্থির করিলাম, জন্ম মৃত্যু আমার করতলগত, মরা হইবে না। যদি খণ্ড-প্রলয়ই উপস্থিত হয় প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিব। আমি রক্ষা পাইলে কি হইবে, যদি আমার সঙ্গীদিগের জীবন রক্ষা করিতে না পারি তবে বাঁচিয়া সুখ

কি ? এইরূপ চিন্তা করিতেছি ক্রমে বেলা অবসান প্রায়, সঙ্গে সঙ্গে মৃদু মৃদু বাতাস বহিতে লাগিল, বিপরীত পাড়ে ২।১ খানি প্রতিমা নদীবক্ষে অস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল, আমরা তাহা অতি কষ্টে অনুমান করিলাম ; বার্ত্তাবহ বায়ু বিপরীত পাড়স্থ বাদ্যধ্বনিও কর্ণকুহরে প্রদান করিতে লাগিল। আমারও হৃদয় একটু উদ্বিগ্ন হইল কারণ তখন পূর্ব্ব ঝড়ের কল্পনা করিতেছিলাম। এই সকল মনের কল্পনা আমার বালিকা স্ত্রী অথবা আমার ভ্রাতা কালিপ্রসন্নকে কিছুই বলি নাই ; কারণ তাহাদিগকে বলিয়াই বা ফল কি বরঞ্চ তাহারা ইহা শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল হইতে পারে। মহামায়া আমার মনের দুঃখে দুঃখিনী হইয়াই যেন ক্রমে ক্রমে শান্ত প্রকৃতিস্থা হইয়া মনের আনন্দে আপন শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন ; ঝড়ও ক্রমে ক্রমে নিস্তব্ধতায় পরিণত হইল এবং তরঙ্গমালা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। সূর্য্যদেবও মহামায়াকে আরতি প্রদান মানসে নদীবক্ষে লীন হইলেন ; আমরাও সুস্থ হইলাম। ঐ দিবসও জাহাজ দর্শন দিলেন না, আমিও মনের দুঃখে অদৃষ্টকে কটু-কাটব্য বলিতে বলিতে ম্রিয়মান হইলাম। তখন মনে ইহাও উদয় হইল যে, পূর্ব্বে যদি জানিতে পারিতাম, জাহাজ গোয়ালন্দ আসিতে এত বিলম্ব হইবে, তবে দেশে পূজা দেখিয়া আসিতে পারিতাম। এরূপ ৩।৪ দিবস অনর্থক জাহাজের প্রত্যাশায় নদীতীরে বাস করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে গোয়ালন্দের চাউলঘাটের নিকট ২৫।৩০ জন কাবুলি একটী গো-হত্যা করে। এই সংবাদ বাজারের মহাজনেরা শ্রবণ করিয়া ১০০ শত জন লাঠিয়াল পাঠাইয়া উক্ত কাবুলিদিগকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করে। ইহাতে কয়েকজন কাবুলি সাংঘাতিকরূপে আঘাতিত হয় যদিও কেহই কার্য্যক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। কিন্তু সাংঘাতিক আঘাত, তাহাতে ২।৩ জন লোকের জীবন-সংশয়

হইয়াছিল। মোকর্দ্দমার সংবাদ বলিতে পারিলাম না, কারণ যে দিবস ঐ ঘটনা হয় তাহার পরদিবস আমাদের নির্দ্দিষ্ট জাহাজখানি সন্ধ্যার সময়ে ঘাটে আসিয়া নোঙ্গর করিল। ষ্টীমার আগমনে অবশ্য কথঞ্চিত আনন্দিত হইলাম; কিন্তু পরমুহূর্ত্তে শুনিলাম একদিন একরাত্র এই ঘাটেই জাহাজখানি অবস্থিতি করিবে কারণ বাখরগঞ্জের নিকট বিজয়া দশমীর দিবস ভয়ানক ঝড়ে জাহাজের কল-কব্জা বিকল হওয়ায় অতি ধীরে ধীরে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এখন ঐ জাহাজের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কোন কলের জন্য অদ্য রাত্রেই কলিকাতায় যাইবেন এবং পরদিবস প্রত্যাগমন করিয়া মেরামতান্তে জাহাজ আসাম অভিমুখে যাত্রা করিবে।

আমি জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্ব দিবস পরিবারকে পাল্কি করিয়া দ্বিতলার ডেকে উপস্থিত হইয়াই একটী কামরা পাইলাম। আমাদিগের সহিত পাক করিবার কোন জিনিস না থাকায় কিছু মিষ্টান্ন বেশী করিয়া ক্রয় করিয়া লইলাম। মেথরের সহিত বন্দোবস্ত করিলাম, তেজপুর পর্য্যন্ত প্রতিদিন দুইবার কামরা পরিষ্কার করিবে এবং বাতিওয়ালার সহিতও ঐরূপ স্থির করিলাম। পায়খানার ব্যবস্থা প্রথমেই করিলাম বটে কিন্তু পায়খানা যাইবার পূর্ব্ব উপকরণের সহিত খোঁজ খবর নাই। পরদিবস ষ্টীমার চলিতে আরম্ভ করিলে আমরাও নানাপ্রকার প্রান্তর ও গ্রাম দেখিতে দেখিতে গভীর জলের উপর দিয়া যাইতে সুরু করিলাম। ঐ দিবস বৈকাল বেলায় একজন ভদ্র আসামি-সাহেবের সহিত আলাপ হয়; আমাদিগের ক্যাবিনের অল্প দূরে অন্য একটী কামরায় তিনি ছিলেন। ঐ সময়ে আমি নদীর তীরাভিমুখে লক্ষ্য করিয়া ধূম্রপান করিতেছিলাম; তিনিও ঐরূপ নদীর শোভা দেখিবার জন্যই হউক বা আমার সহিত ছল করিয়া আলাপ করিবার জন্যই হউক, একখানি

কাষ্ঠাসনে বসিয়াছিলেন। আমার ধূমপানান্তে প্রিয় সঙ্গী হুঁকাটিকে রাখিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় আমার নিকট হইতে কলিকাটি প্রার্থনা করিলেন। আমি মনে মনে ধারণা করিলাম, তবে কি ইনি চুরুটের ধূমে সন্তোষ নহেন? আজকাল অনেক স্থানে সাহেব ও মেমদিগকে ফুরসিতে ধূমপান করিতে দেখিয়াছি ইনিও বোধ করি সেই ভাবাপন্ন হইবেন। বলা বাহুল্য, আমি সেই মুহূর্তেই কলিকাটি তাঁহার হস্তে হাত বাড়াইয়া দিলাম; তিনি কলিকাস্থিত তামাক সেবন করিতে করিতে আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অবগত হইলাম, তিনি সাহেব বা ফিরিঙ্গি এ দুইটার কোনটিই নহেন, নাম জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, তাঁহার নাম জি, সি, বড়ুয়া। এ আবার কোন দেশীয় নাম কিছুই প্রথমে ঠিক হইল না। তিনি আমাকে তাঁহার কামরায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। সন্ধ্যার পূরে তাঁহার ক্যাবিনে যাইয়া দেখিলাম তিনি ভোজনে বসিয়াছেন এবং কাঁটা চামচ দ্বারা আহার করিতেছেন। আহারান্তে তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ে জানিতে পারিলাম—তাহার নাম গোপাল চন্দ্র বড়ুয়া, নিবাস ডিব্রুগড় জেলায়। সিমলায় বড় লাট সাহেবের অফিসে কার্য্য করিতেন, সুপারিশের বলে ডিব্রুগড়ে একষ্ট্রা এসিস্‌টেন্ট কমিশনার হইয়া যাইতেছেন। বাবুটী খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়াই ইংরাজের ন্যায় আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছেন। ষ্টীমারের কোন সাহেবই তাঁহার চাতুরি ধরিতে পারেন নাই; কারণ তিনি এমন পরিষ্কার ইংরাজী টোনে কথা বলেন যে, কাহার সাধ্য তাঁহাকে অন্ততঃ এ দেশ-জাত ইংরাজ না বলিয়া থাকিতে পারে। তিনি হুঁকা কলিকার সাহায্যে তামাক সেবন পূর্ব্ব হইতেই অভ্যস্ত ছিলেন সুতরাং চুরুট পাইপে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইতেন না; তজ্জন্য সময়ে সময়ে আমার নিকট হইতে কলিকা লইয়া

তামাক খাইতেন। দুগ্ধের স্বাদ কি ঘোলে মিটে? বোধ হয়, তিনি আমার সহিত বাঙ্গালা ভাষায় আলাপ করিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইলেন। আমাদের তিন দিবস একরূপ আহার নাই কারণ যে মিষ্টান্ন গোয়ালন্দ হইতে খরিদ করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা দুর্গন্ধ ও অব্যবহার্য্য হওয়ায় ব্রহ্মপুত্রনদের জল-জন্তুগণকে দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় জাহাজখানি কিনারায় নোঙ্গর করিত; জাহাজস্থ সকল যাত্রিগণ দ্রুতপদে সেই সময় কিনারায় অবতরণ করিয়া কাষ্ঠ আহরণ করতঃ পাক করিয়া আহারাদি করিত। আমাদের সহিত পাক করিবার পাত্রাদি থাকিলে বোধ হয় আমরাও সে সুখে বঞ্চিত হইতাম না। আমাদের যৎকিঞ্চিৎ চিপিটক গুড় ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না; জজ কেবল বড়ুয়া মহাশয় আমাদের আহারাদির বিষয় শ্রুত হইয়া, আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইলেন এবং জাহাজের ইংরাজী হোটেলে খাইতে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি ততদূর ইংরাজিতে সুবিজ্ঞ হই নাই, যাহাতে আমার মন ঐরূপ আহারের জন্ত লালায়িত হইবে। সকলের ভাগ্যে ঐরূপ আহারের সুখ ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং আমরা উহাতে বঞ্চিত রহিলাম। কালিপ্রসন্ন ভায়া ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া একদিন বলিল যে "দাদা, অগ্রে জীবন রক্ষা করা কর্ত্তব্য অতএব অনুমতি করিলে আমি যাইয়া তথায় আহার করি"। আমার রাগতভাব দেখিয়া বালক সাহস করিয়া আর কিছুই করিতে পারিল না। আসামের অনেক সংবাদ গোপাল বাবু প্রমুখাত শ্রবণ করিতে করিতে চলিলাম; তথাকার ভাষা, আচরণ, পোষাক-পরিচ্ছদ বিশেষরূপে অবগত হইলাম। আমরা দিন দিন কত প্রান্তর, মাঠ, গ্রাম, পর্ব্বত পশ্চাতে রাখিয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। জাহাজখানি মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ষ্টেশনগুলিতে দাঁড়াইয়া আরোহী উঠায় ও নামায়

কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন ষ্টেশনে ভালরূপ জলখাবার দৃষ্টিগোচর হইল না। কেবল চিড়া ও গুড় আরোহীগণ খরিদ করিতে পারে, আমিও মধ্যে মধ্যে তাহাই লইতে বাধ্য হইলাম। ক্ষুধার কষ্ট বড়ই অসহনীয়, ক্ষুধা সাম্য না হইলে মনকে তৃপ্তি রাখা দুরূহ কিন্তু উপায় নাই,—আমার সঙ্গীদিগের যে কি কষ্ট অনুমান করিয়া লউন। গোয়ালন্দ হইতে যাত্রা করিবার তৃতীয় দিবসে, আমি তৃতীয় শ্রেণীর ডেকের উপর বেড়াইতেছি, এমন সময় মৈমনসিং জেলাস্থ কয়েকজন বঙ্গজ কায়স্থের সহিত পরিচয় হইল; তাহাদিগের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ লোকটী আমাদের আহারাদি কিরূপ হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমরা তিন দিবস অন্নবর্জ্জিত শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। দয়াময় ঈশ্বর যেন তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া আমাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "আমাদের নিকট পাক করিবার পাত্রাদি, চাউল, ডাউল, আলু প্রভৃতি আছে অতএব আপনি অদ্য সন্ধ্যার সময়ে ষ্টীমার কিনারায় লাগিবামাত্র তীরে নামিয়া কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক আমাদের সহিত মিলিবেন; আমরা আপনাদের আহারাদির সকল আয়োজন করিয়া রাখিব।" ইহা শ্রবণ করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম এবং ঈশ্বরকে শত, শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে যথোচিৎ সৎকার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার সময়ে শ্রীমান কালিপ্রসন্ন ভায়াকে কামরায় রাখিয়া আমি জাহাজ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলাম। গত তিন দিবসের মধ্যে পদদ্বয় মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই, তীরে নামিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। কাষ্ঠ আহরণান্তে স্বহস্তে পাক করিয়া সঙ্গীগণকে এবং আমি মা লক্ষ্মীকে সাদরে গ্রহণ করিলাম—আমাদের শরীরে পুনঃ শক্তি সঞ্চারিত হওয়ায় মন ও হৃদয় বলবতী হইল। সপ্তম দিবসে অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময়ে আমরা আসাম প্রদেশের প্রথম জেলা—ধুবড়ি পৌঁছিলাম।

সন্ধ্যার সময়ে ধুবড়িস্থিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের হোটেলে বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য—চাউল, ডাউল, মৎস্য প্রভৃতি উদরকে প্রদান করিয়া গত কষ্ট ভুলিলাম এবং সঙ্গীদিগের জন্য ষ্টীমার ঘাটে অন্নব্যঞ্জন স্বহস্তে আনিয়া দিয়া তাহাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করাইলাম। সকলই দয়াময়ের অনুকম্পায় সংঘটিত হইল। এই জাহাজ অতি মন্থরগতিতে গমন করে বলিয়া গোপালবাবু ধুবড়ি হইতে দ্রুতগামী জাহাজে চলিয়া গেলেন। একজন সঙ্গী ছিলেন; তিনিও পৃথক জাহাজে চলিয়া যাওয়ায় ডিব্রুগড়ের রেলওয়ের এজেন্ট শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পরম-দয়াল পরমেশ্বর আমাদের জাহাজে মিলাইয়া দিলেন। ইহার সহিত ধুবড়ির হোটেলে সাক্ষাৎ হয়, পরিচয়ে জ্ঞাত হইলাম,—ইনি একজন সৎবংশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তান; কলিকাতায় বহুবাজারের দেওয়ান বাবুর বাটীতে বিবাহ করিয়াছেন। নারায়ণবাবু গোপালবাবুর কামরা দখল করিলেন। নদীর উভয় তীরে কত পাহাড় সুন্দররূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা গৌহাটী অভিমুখে চলিলাম। হাতীসুড়ঙ্গী পাহাড়টী দেখিয়া মনে হইল যেন একটী প্রকৃত হস্তী শয়ন করিয়া আছে। সেটী একটী মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। নারায়ণবাবুর সহিত তাঁহার কামরায় বসিয়া নানা প্রকার আলাপ হওয়াতে তাঁহাকে একজন জ্ঞানবান লোক বলিয়া অনুমিত হইল। একদিবস পরে যখন সন্ধ্যার সময়ে জাহাজখানি তীরে লাগিয়াছে, তখন নারায়ণবাবুকে কহিলাম—"আসুন, তীরে নামিয়া আহারাদির আয়োজন করা যাক"! তিনি কহিলেন—"আমি আজ কিছু আহার করিব না; আপনি পাকের উপযুক্ত জিনিষ-পত্র লইয়া যান এবং আহারাদি করুন।" তখনও পর্য্যন্ত আমি তাঁহাকে গোড়া হিন্দু বলিয়া জানিতাম,—যাহা স্বভাবসিদ্ধ। আমি একাকী তাঁহার

জিনিষ-পত্র লইয়া পাক করিতে নামিলাম না। পরদিবস প্রাতে নারায়ণবাবুর কামরায় যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি স্তম্ভিত, লজ্জিত এবং জ্ঞানবুদ্ধিহীন হইয়া জড়বৎ তাঁহার আহারের টেবিলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম ; মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইল না। কিছুক্ষণ পরে, প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম, আমাদের কামরায় যে মেথরের কার্য্য করে, সেই লোকটী চাপকান ও পাগড়ি পরিয়া বাবুর খানা আনিয়া দিয়া এবং কিয়দ্দূরে আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বাবু কাঁটা-চামচ ব্যবহার করিয়া অখাদ্য উদরকে দান করিতেছেন। এই বীভৎস-ব্যাপার দর্শন করিতে অপারগ হওয়ায় আমি স্থান পরিত্যাগ করিলাম। পরে আরও জ্ঞাত হইলাম জাহাজের যাত্রি-সাহেবদিগের ভুক্তাবশিষ্ট জিনিষগুলি হোটেলের খানসামাগণ নদী-গর্ভে নিক্ষেপ না করিয়া এইরূপ গৌরাঙ্গের প্রসাদ-প্রার্থীগণকে যৎ-সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে। নারায়ণবাবু দেশ-মান্য কুলীন সন্তান হইয়া ম্লেচ্ছ-ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্য অম্লানবদনে আহার করেন। ইহা অপেক্ষা দেশের যে আর অধিকতর কি দুর্গতি হইতে পারে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যে হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, সেই ধর্ম্মের কিয়দংশ সারবান বলিয়া পাশ্চাত্যবিৎ পণ্ডিতগণ ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হইয়াও শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকেন। যে ধর্ম্মের কিয়দংশ ম্যাডাম ব্যাভাভাস্কি ও কর্ণেল অল্কট্ পাইয়া আজকাল পৃথিবীর অনেক সভ্যদেশে ওতোপ্রতো-ভাবে পরিচালনা করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়া থাকেন, সেই ধর্ম্ম কিনা আমরা অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকি। আমরা হিন্দুধর্ম্মের সৎপুত্র বলিয়াই এরূপ ধর্ম্মকে হৃদয়ে রাখিতে পারিতেছি না। উক্ত দিবস হইতে নারায়ণবাবুকে অন্য চক্ষে দেখিতে লাগিলাম এবং তাঁহার ক্যাবিনে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। আমি তাঁহাকে ব্রাহ্মণোচিৎ

কার্য্য পরিত্যাগ করায় ২।৪টী কথা প্রয়োগ করাতে তিনি আমার প্রতি ভয়ানক কুপিত হইয়াছিলেন। জাহাজখানি কামরূপের মহকুমা মঙ্গলদহ পরিত্যাগ করিয়া ধুবড়ি হইতে ৩য় দিবসের উষাকালে কামরূপের কালভৈরব মন্দিরকে লক্ষ্য করাইয়া ৮ ঘটিকার সময়ে গৌহাটী বন্দরে নোঙ্গর করিল। গৌহাটীতে জাহাজখানি অবস্থিতি করায় আমি মাতুল মহাশয়ের নামীয় পত্র ডাকঘরে দিতে সহরে চলিলাম। সহরটী ধুবড়ী অপেক্ষা যে ভাল তাহা অনুমিত হইল। অনেকগুলি বাঙ্গালী বাবু তথায় কার্য্যোপলক্ষে ছিলেন। ঐ দিবস গৌহাটীর হাট সুতরাং জাহাজে প্রত্যাগমন কালীন দেখিলাম, হাটে আসাম দেশীয় স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। পোষাক পরিচ্ছদ ও তাহাদের ভাষা গোপালবাবু যদ্রূপ বলিয়াছিলেন, তদ্রূপই পরিলক্ষিত হইল। হাটের মধ্যে অনেক স্ত্রী ও পুরুষের গোদ ও গলগণ্ড দৃষ্টিগোচর হইল। আমি অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে পাক করিয়া সকলকে ভোজন করাইলাম। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম তৎপর দিবস জাহাজখানি তথায় থাকিলে আমরা মহামায়া দর্শন করিয়া আসিব কিন্তু অদৃষ্ট মন্দবশতঃ পরদিবস অতি প্রত্যুষে জাহাজ ছাড়িয়া দিল। ব্রহ্মপুত্র নদীর বেলা ভূমিতে অনেক কুম্ভির শায়িত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হইল। সাহেব আরোহীদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইলেন কিন্তু একটীও মরিতে দেখিলাম না। আমরা যতই উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে চলিলাম, জলের স্রোত ততই বেগবতী সুতরাং জাহাজস্থ দুইখানি ফ্লাট্ লইয়া যাওয়া অসম্ভব দেখিয়া একস্থানে একখানি ফেলিয়া যাইতে ক্যাপটেন সাহেব বাধ্য হইলেন। একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া সংলগ্ন ফ্লাট্খানিকে রাখিয়া পরিত্যক্ত ফ্লাট্খানিকে নিয়া আসিতে আমাদের একদিন বিলম্ব হইল। এইরূপ মন্থর গতিতে জাহাজখানি চলিয়া আমাদিগকে ধুবড়ি হইতে ৭ম দিবসে

তেজপুর বানরাজার রাজধানীতে পৌঁছাইয়া দিল। এইবার আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

এই তেজপুর সহরটী গৌহাটীর ন্যায় নহে; ইহা অতি সংকীর্ণ স্থান। তেজপুরের মধ্যে একটি মাত্র ভাল রাজপথ, তাহার দুই পার্শ্বে ২।৪ খানি দোকান মাত্র। ঘাটে উপস্থিত হইয়া ডেকাজুলিবাগান হইতে কোন গো-শকট আসিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম,—২ খানি গাড়ী ২।৩ দিবস অপেক্ষা করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়াছে। অজানিত স্থানে পৌঁছিয়া গাড়ী ফেরত গিয়াছে শুনিয়া বড়ই বিপদে পড়িলাম। ভগবান সকলের সহায় এবং সম্বল, কাজেই অল্পক্ষণের মধ্যে ২ খানি গো-শকট মিলাইয়া দিলেন। আমরা জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া আহারান্তে বাগানাভিমুখে রওনা হইলাম। লোকমুখে জানিতে পারিলাম উক্ত বাগিচা তেজপুর হইতে ১৯।২০ মাইলের কম হইবে না; শুনিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কলিকাতা হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম, উক্ত বাগান তেজপুরের অতি নিকটে। যা'হৌক, যে কোন উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক গন্তব্য স্থানে যাইতেই হইবে। আমরা আনুমানিক ৩টার সময়ে তেজপুর ত্যাগ করিলাম। পথ এত দুর্গম এবং রাস্তার দুই কিনারায় এত নিবীড় জঙ্গল যে তাহা জীবনে কখনও দেখি নাই। মধ্যে মধ্যে এক একখানি গ্রাম পরিলক্ষিত হইল। কাঁচা রাস্তা তাহাও অসমান স্থানের উপর দিয়া গিয়াছে; সর্ব্ব স্থানেই অসমান জমি তজ্জন্যই বোধ করি এ প্রদেশের নাম আসাম হইয়াছে। যাহা হউক ভাগ্যক্রমে কোন হিংস্র জন্তুর সহিত পথিমধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। আমরা পরদিবস অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময়ে সিরাজুলী বাগানে পৌঁছিলাম। কলিকাতার এজেন্ট সাহেবের একখানি পত্র নিয়া ম্যানেজার সাহেবের কুটিতে চলিলাম। সাহেবকে সম্ভাষণ করিয়া পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিলে তিনি আমাকে অনেকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু

তখন ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকায় সাহেবের সকল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সাহেব আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তন্মুহূর্ত্তে বাগানের বড় মুহরী পোয়ারাম কোঁচকে ডাকাইয়া আদেশ করিলেন যেন আমাদের কোনরূপ কষ্ট না হয়। বাসোপযোগী কোন ঘর তৈয়ারী না থাকায় অতি ক্ষুদ্র একখানি ঘর কিছুদিনের জন্য নির্দ্ধারিত হইল। আমরা ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া রান্নার বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। দোকান অতি নিকটেই ছিল সুতরাং সকল সংগ্রহ করিয়া আহারান্তে নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রজনী যাপন করিলাম। ঐ বাগানের ২ জন আসামী মুহরী আমাকে যথেষ্ট সাহার্য্য করিয়াছিলেন। ২।৪ দিবসের মধ্যে অতি সামান্য ভাবে দো-চালা ঘর এবং তদুপযুক্ত রান্নাঘর প্রস্তুত হইল। আমরা নূতন বাটীতে গমন করিলাম।

প্রতিদিন প্রাতে কুলি লাইনে কুলিদিগকে দেখিতে যাইতে হইত এবং এই বাগানের অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে ডেকাকুলি নামক এই কোম্পানীর আর একটী বাগান ছিল (তথায়ও ২ জন মুহরী প্রভৃতি ছিল) তাহাও একদিন অন্তর দেখিয়া আসিতে হইত। সাহেবটি অতি ভদ্রলোক; আমার প্রতি অকপট দয়া প্রকাশ করিতেন। ইংরাজী বলিতে বা বুঝিতে যে অপারগ ছিলাম তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাকে ইংরাজী ভাষা নানা প্রকারে শিখাইতে লাগিলেন। আমি অতি যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই ইংরাজীতে কথা বলিতে এবং বুঝিতে সক্ষম হইলাম। দুই বাগানে ৩০০ শত কুলি ছিল; তন্মধ্যে প্রায় ২৫০ জন ছোটনাগপুর অঞ্চলের এবং বক্রি আসাম দেশীয় কাছাড়ি কুলি। পাঠক! ইহারা কাছাড় দেশের অধিবাসী নহে; এই আসামেই তাহাদের বাস অথচ তাহাদের ভাষা আসামী নহে অর্থাৎ, অনার্য্য জাতির ভাষা। হিন্দুস্থানের বহুপূর্ব্ব কালের পার্ব্বতীয় জাতির

মধ্যে ইহারাও এক জাতি। চা বাগানের কুলির প্রতি অত্যাচার "সঞ্জিবনীতে" অনেকবার দেখিয়াছি কিন্তু এ বাগানে তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হইল না। এ বাগান খুব পুরাতন, ইহাতে অনেকদিন হইতে কুলিরা কার্য্য করিয়া আসিতেছে; এক একজন কুলি যথেষ্ট টাকা সঞ্চয় করিয়াছে দেখিলাম। বাগানের চতুর্দ্দিকে ভয়ানক নিবীড় জঙ্গল; তাহার যে সীমা কোথায় শেষ হইয়াছে তাহা কেহ ভালরূপে বলিতে পারে না। ঐ জঙ্গলে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর, বন্য-কুক্কুর, বরাহ, বন্য-মহিষ, গণ্ডার ও হরিণ বিচরণ করিত, ইহা অনেকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। শীতকালে ব্যাঘ্রের বড়ই দৌরাত্ম হইত, রাত্রে বাসায় চতুর্দ্দিকে গর্জ্জন শুনা যাইত। দেশ প্রথানুসারে রাত্রে ঘরের মধ্যে অগ্নি রাখা হইত এবং টীন বাজাইয়া ঐ জন্তুকে তাড়াইতে হইত এবং ভল্লুকের রবও প্রায়ই শ্রুতিগোচর হইত। হস্তীগণ দলবদ্ধ হইয়া এক এক দিন রাত্রে চা গাছ ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইত। এইরূপ স্থান হইতে যে প্রাণ লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিব, এরূপ আশা মোটেই করিতাম না। অতি অল্প দিবসের মধ্যে আমি সাহেবের সু-নজরে পড়িলাম কারণ ঐ সাহেব আসাম দেশীয় একটী উপ-পত্নী রাখিয়াছিলেন। ঐ স্ত্রীলোকটী আমার স্ত্রীকে ধর্ম্মকন্যারূপে আহ্বান করিতেন। এই কারণেই হউক বা অদৃষ্ট সু-প্রসন্ন বশতঃই হউক সাহেব আমাকে বিশ্বাস ও ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন। আমার বিশ্বাস, ইহা স্বার্থের সহিত জড়িত কারণ আমি এই বাগানে আগমন করায় সাহেবের যাবতীয় কার্য্য আমাকেই করিতে হইত; তাঁহাকে আর অধিক কিছুই দেখিতে হইত না। ক্রমে ক্রমে আমি সকল কার্য্য শিক্ষা করিয়া ফেলিলাম; মাসিক খরচের টাকা, হিসাব-পত্র প্রভৃতি সকলই আমাকে করিতে হইত। ক্রমে ক্রমে আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য ভিন্ন প্রধান কেরাণীর কার্য্য, চা ঘরের পরিদর্শক এবং বাগানের কার্য্যের তত্ত্বাবধান কার্য্য করিতাম। আসাম দেশীয়

একজন যুবক আমার সহকারীরূপে নিযুক্ত হয়েন; তিনি ইংরাজী ভালরূপ জানিতেন। কোম্পানীর মাসিক খরচের টাকা আমার নিকটেই থাকিত। কুলিদিগের মাসিক বেতন দিবার সময়ে উভয় বাগানে আমাকেই উপস্থিত থাকিতে হইত। ক্রমে ক্রমে আমার বেতন ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ২ বৎসরের মধ্যে হইল। ওদিকে মাতাঠাকুরাণী আমাকে ছাড়িয়া একাকিনী নলডাঙ্গায় থাকিতে অশক্ত হওয়ায় একজন জানিত ভদ্রলোকের সহিত আসামে পৌঁছিলেন। তাঁহাকে পাইয়া আমি যেন হস্তে স্বর্গ পাইলাম। কিছু দিবস পরে শ্রীমান্ কালীপ্রসন্ন ভায়া ঐ লোকের সহিত নলডাঙ্গায় চলিয়া আসিলেন। এদিকে সাহেবের মেম আমার বাসায় আসিয়া আমার পত্নীকে কার্পেটের কার্য্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সাহেব আমাকে বাগানের প্রত্যেক কার্য্যেই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন। তখন মেজাজও ঘোর সাহেবী ধরনের অর্থাৎ কোট প্যাণ্ট তো আছেই, তাহা ভিন্ন থ্যাট লেগিং পর্য্যন্ত পরিধান করিয়া সং সাজিয়া বেড়াইতাম। একটি বড় ঘোড়াও খরিদ করিয়া সাহেবের আস্তাবলে রাখিলাম; যখন দরকার হইত তাহাতে চড়িয়া ডেকাজুলি এবং সমস্ত বাগান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতাম। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর, সিরাজুলি হইতে দক্ষিণে ৮ ক্রোশ দূরস্থ হইবে। শিঙ্গাড়ি গ্রামে এই কোম্পানীর একটী চা বাক্সের গুদাম ছিল; প্রতিদিন যত বাক্স চা প্রস্তুত হইত, উহা ঐ গুদামে যাইয়া মজুত হইত; সপ্তাহে ২ দিন ঐ সকল বাক্স লইয়া মঙ্গলদহিতে ষ্টীমার ঘাটে নৌকা করিয়া লইয়া যাইত, বর্ষায় সময়ে গুদাম পরিদর্শনে তথায় আমাকে গো-শকটে একবার যাইতে হইয়াছিল। ভীষণ অরণ্যের মধ্য দিয়া কাঁচা পথ সিঙ্গাড়ি গিয়াছে; ৩।৪ ক্রোশের মধ্যে লোকজনের বসতি নাই। পথিমধ্যে নানা প্রকার বন্য জন্তুর চিহ্ন পরিদৃশ্যমান হওয়াতে মনে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

অতি কষ্টে আমি ও কয়েকজন লোক সিঙ্গাড়ি পৌঁছাই। এ স্থানে একটী পাহাড় আছে, ঐ পাহাড়ের শিখরদেশে গোপেশ্বর দেবের মন্দির। মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ তথায় বাস করিতেন এইরূপ কিম্বদন্তি ছিল এবং তাঁহারই স্থাপিত ঐ গোপেশ্বর মহাদেব। প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ঋষি বংশীয় ব্রাহ্মণকে বিনা রাজস্বে জমি প্রদান করিয়াছেন। ঐ দেশের যাত্রা বা ভাওনা শুনিতে বাগানের সন্নিকটস্থ সিরাজুলি গ্রামে রাত্র ৯ ঘটিকায় দীননাথ ও সাহেবসহ উপস্থিত হইলাম। এ দেশের এই রীতি যে যদি কেহ নিমন্ত্রিত হইয়া কাহারও বাটী বা সভাতে উপস্থিত হন, তবে গৃহস্বামী বা সভাপতি এক কাঁদি কাঁচা সুপারি এবং একগোছ পান সমাগন্তুক ভদ্রলোককে প্রদান করিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করেন। আমাদের ভাগ্যেও তাহাই হইল। আসামস্থ কোঁচ সম্প্রদায়ের এই নিয়ম যে,—যদি কেহ যাত্রা শুনিতে উপস্থিত হয়েন, তাঁহাকে বসিবার জন্য এক আঁটি বিচালী ভিন্ন আর কিছুই দেওয়া হয় না; তবে যিনি বসিবার আসন সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। আমরা এই রীতি পূর্ব্বে জ্ঞাত থাকায় বসিবার আসন সঙ্গে আনিয়াছিলাম সুতরাং যাত্রা হইবার সম্মুখস্থ স্থানে মণ্ডল মহাশয় আমাদিগকে বসাইয়া দিলেন এবং সাহেব বাহাদুরও আপন কাষ্ঠাসনে আমাদিগের নিকট বসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সাজ-ঘরে অনেক খোলের ও করতালের গর্জ্জনে কর্ণ প্রায় বধির হইল। বাদকগণ ঘাগরা পরিধান করিয়া এবং পায়ে ঘুমুর লাগাইয়া তাহাদের দেশীয় নানা প্রকার ভাব-ভঙ্গিতে নাচিতে ও অন্যূন প্রায় ৩০ খানি খোল ও ১৫ জোড়া করতাল দ্বারা বাজাইতে বাজাইতে আসরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া শুনিয়া অবাক! আসামের অনেকাংশে স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ, যাত্রার আসরে বিচালি আসনে অনেক স্ত্রী-পুরুষ একত্রে বসিয়া যাত্রা শুনিতেছে। মূল কথা,—আসাম অর্দ্ধ-সভ্য দেশ ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এ দেশে যাঁহারা সভ্য হইয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালীর ন্যায় প্রকাশ্য স্থানে পরিবারবর্গকে পাঠান না। ঐ দিবস উষাহরণ পালার অভিনয় হইতেছিল; দেখিয়া শুনিয়া বিরক্ত হওয়ায় ২।১ ঘণ্টা পরেই বাগানে প্রত্যাগমন করিলাম। পৃথিবীর মধ্যে নারীজাতি ধর্ম্ম প্রিয় সুতরাং এখানেও তাহাই পরিলক্ষিত হইল। আমার আসামে অবস্থিতি কালীন হিমালয় পর্ব্বতবাসী আকাদিগের সহিত ইংরাজের সংঘর্ষ হয়; কারণ আকাগণ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া ইংরেজী রাজ্যের প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার করিত। এই ভয়ে অধিকাংশ লোক সন্ধ্যার পূর্ব্বে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া পরিবারবর্গসহ জঙ্গল মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করিত। আমাদিগের সাহেবও রাত্রে লাইনে কুলি পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে আসাম প্রদেশের প্রধান কমিশনার সাহেব যুদ্ধের বন্দোবস্ত জন্য ডেকাজুলি সরকারি বাঙ্গালায় কয়েক ঘণ্টা অবস্থিতি করিয়া তেজপুর গমন করেন। আমাকে বাগানের জন্ম-মৃত্যু তালিকা প্রতি মাসে মাসে প্রধান কমিশনার অফিসে পাঠাইতে হইত; ইহা চা বাগান মাত্রেরই নিয়ম। ইহার কয়েকমাস পরে নিয়মানুযায়ী তেজপুরের ডেপুটী কমিশনারও পুলিস সাহেব বাগান পরিদর্শন করিতে আসিয়া কুলিদিগের হিসাব দেখিতে চাহিলে আমি সকল হিসাব বুঝাইয়া দিলাম।

সন. ১৮৮৩ সালের ভাদ্র মাসে কুলিরা বাগানের কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে একটী মোকর্দ্দমা দায়ের করা হয়। ঐ মোকর্দ্দমায় আমি ফরিয়াদীরূপে তেজপুরে গমন করি; কারণ যে সময়ে কুলীরা কার্য্য করিতে অস্বীকার করে, সেই সময়ে আমি বাগানের ম্যানেজারের অনুপস্থিতিতে তাঁহার কার্য্য করি; তজ্জন্য আমিই ফরিয়াদী হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সেই সময়ে আমার পত্নী সন্তান সম্ভাবিতা ছিলেন। বাসায় লোকজন ঠিক করিয়া আমি ৩।৪ দিবসের জন্য

তেজপুরে গমন করি। তেজপুর হইতে প্রত্যাগমন করিতে আমার আরও ২।৩ দিবস বিলম্ব হয়। এই সময়ে আমার মাতাঠাকুরাণী আসামে ছিলেন না। প্রায় ৫।৬ মাস পূর্ব্বে তাঁহার মারাত্মক ব্যাধি হওয়ায় তাঁহাকে দেশে পাঠান হয়; সুতরাং তেজপুর যাইবার কালীন বাসার পরিচারিকা ও ২।১ জন ভৃত্য ব্যতীত নিজের লোক কেহই ছিল না। আমার তেজপুর হইতে প্রত্যাগমন করিতে বিলম্ব হওয়ায় আমার পরিবার দিন রাত্রি রোদন করিতেন। বালিকা স্ত্রী আমাকে আশ্রয় করিয়া পিতা মাতাকে ভুলিয়া এত সুদূর দেশে ছিল। আমি হঠাৎ স্থানান্তরে যাওয়ায় একাকিনী হইয়া মনঃকষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। আমি বাসায় না থাকায় নিজের জন্য আহারাদিরও অত্যাচার হইয়াছিল। আমি বাগানে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি,—তিনি রক্ত আমাশা ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া তাহার যেন সকল ব্যাধি দূরীভূত হইল। আনন্দে হস্তে যেন স্বর্গ পাইলেন। তাহার ব্যাধি আরোগ্যের জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু হায় সকলই বিফল হইল। দিন দিন শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হইতে লাগিল। এমত স্থানে ছিলাম যে তাহার ১০।১২ ক্রোশের মধ্যে অন্য কোনরূপ চিকিৎসক পাইবার উপায় নাই যে তাহার চিকিৎসা ভালরূপ করাইতে পারি। একদিন রাত্রে আমাশয়ের বেগে একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। যদিও ঐ সময়ে হিন্দুস্থানী ধাত্রী পাইয়াছিলাম কিন্তু প্রসবের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অকালে আমাকে দুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার পিতা মাতাকে অসহনীয় শোক প্রদান করতঃ স্বামী পুত্রকে রাখিয়া জঙ্গলময় স্থানে জীবলীলা শেষ করিলেন। তৎপর দিবস প্রাতে শ্রীহট্ট দেশীয় কয়েকজন ব্রাহ্মণ দ্বারায় ডেকাজুলি নদীতে দাহকার্য্য শেষ করা হয়। তখনও পর্য্যন্ত নব প্রসূত কুমার জীবিত ছিল এবং লছমণিয়া পরিচারিকা তাহার শুশ্রূষা করিতেছিল। সকলের বিশেষ

অনুরোধে আমি পুত্র মুখ দর্শন করিলাম। পুত্রটী অতি সুন্দর হইয়াছিল কিন্তু দেখিয়াই অনুমিত হইল তাহার জীবনী শক্তি বড়ই কম ; অল্প সময় মধ্যেই তাহারও জীবন মাতৃসন্নিধানে গমন করিবে, ঠিক তাহাই হইল ; ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই তাহারও জীবলীলা শেষ হইল। আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল তাহা আর লিখিয়া ব্যক্ত করিবার নহে। কয়েক দিবস পর্য্যন্ত অস্থায়ী মস্তিষ্ক বিকৃত ভাব হইল। যে স্থানে প্রণয়িনীকে দাহ করা হয়, আমি সেই স্থানে যাইয়া সুযোগ পাইলেই পাগলের ন্যায় বসিয়া থাকিতাম। চক্ষু হইতে জলবিন্দু বহির্গত হইত না সত্য—সে ভাব যাঁহার হইয়াছে তিনি ভিন্ন আর কাহারও উপলব্ধি করিবার সাধ্য নাই। এই ঘটনায় দীননাথ ভট্ট এবং সাহেব বাহাদুর আমার বন্ধুচিত কার্য্য করিয়া আমাকে প্রকৃতিস্থ করেন। প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। আমার জীবন-বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া একটী কণ্টক-হীন লতা পরমানন্দে বেষ্টন করিয়া উঠিতেছিল ; কিন্তু আদিত্য দেবের খরতর কিরণে অকালে শুষ্ক হইয়া বৃক্ষের শোভা হীন করিল। ইহার পূর্ব্বে শোক যে কি পদার্থ জ্ঞাত ছিলাম না কিন্তু এই ঘটনায় শোকে দেহস্থিত মনকে জর্জ্জরিত করিল। হায়! আমি স্ত্রী-হত্যা পাপে জড়িত হইলাম। সুদূর জঙ্গলাকীর্ণ দেশে অল্প বয়স্কা স্ত্রী লইয়া কি আসিতে হয়? আর যখন সন্তান সম্ভাবিতা হন তখন কেন না আমি তাহাকে দেশে পাঠাইলাম। এখন এইরূপ কত নিজের ত্রুটী মনেতে তোলা-পাড়া করিতে লাগিল। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, আমারও তাহাই হইল। মৃত্যুর ২।৩ দিবস পরে আমার শ্বশুর মহাশয়কে মলাগড়ে এই সংবাদ প্রেরণ করিলাম।

আমার মাতাঠাকুরাণী পুত্র-বধূর প্রসবকাল অতি নিকট বিবেচনা করিয়া মৃত্যুর ১০ম দিবস অপরাহ্নে আসাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে এই সর্ব্বনাশের সংবাদ শ্রবণ করিয়া

ভয়ানক-শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সিরাজুলি পৌছিলেন। যদিও যৎকিঞ্চিৎ শোক বেগ প্রসমিত হইয়া আসিতে ছিল কিন্তু মাতার করুণ রোদনে উহা পুনরোদ্দীপ্ত হইল, তিনি তাঁহার নব পৌত্রের জন্য খেলনা, কাজল-লতা প্রভৃতি আনিয়াছিলেন, সকলই বিফল হইল। তৎপর দিবস কোন প্রকারে শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। বলাগড় হইতে শ্বশুর মহাশয়ের আক্ষেপযুক্ত পত্রের উত্তর পাইলাম, পত্রের ভাব এই—

"তুমি যুবা পুরুষ শীঘ্রই বিবাহ করিতে হইবে এবং তাহা আমারও মত কিন্তু তোমার প্রতি আমাদের অতিশয় স্নেহ থাকায় আমার এই শেষ অনুরোধ যে, আমার বিনা অনুমতিতে যেন বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করা না হয়।"

আমি তাহার পত্রের নিম্নরূপ উত্তর প্রদান করি,—"বিবাহ করিব না এইটী স্থির জানিবেন ; যদি ভবিষ্যতে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় আপনার বিনা অনুমতিতে সে কার্য্য করিব না।"

শ্রাদ্ধের পর পুনরায় বাগানের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি আর বিবাহ করিব না এই কথা মাতাঠাকুরাণী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও কাতর হইলেন। মাতুল মহাশয় আমার পত্নী বিয়োগ সংবাদ পাইয়া নলডাঙ্গা হইতে একখানি পত্র লেখেন যে, "কুড়ালগাছি গ্রামে একটী পাত্রী দেখিয়া পছন্দ হইয়াছে ; অতএব এই বিবাহই শ্রেয়। এদিকে বলাগড় নিবাসী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাকে একখানি পত্র দ্বারা জানাইলেন, তাঁহার এক আত্মীয়া পাত্রী আছে তাঁহাকে বিবাহ করিলে তিনি বিশেষ বাধিত হন। বলাগড় নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি আসামের চিফ্ কমিশনার সাহেবের একজন প্রধান কেরাণী তিনি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ভগ্নিকে বিবাহ করিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন

ও বলাগড় নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (পূর্ব্ব সম্বন্ধে আমার শ্যালক ছিলেন, তিনি জামালপুরে রেলওয়ে অফিসে কার্য্য করেন) আমাকে অনুনয় করিয়া পত্র লিখেন যে, তাঁহার একটী অদত্তা সুন্দরী কন্যা আছে; বাঙ্গালা লেখাপড়া ভালরূপ শিখিয়াছে, সম্ভবতঃ গহনা এবং পণ দেওয়া যাইবে। আমি যেন উহাতে অমত প্রকাশ না করি। এই সকল পত্রের উত্তর এইরূপ প্রদান করি যে, বলাগড় নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার শ্বশুর তাঁহাকে এ সম্বন্ধে লিখিয়া ফলাফল জানিতে পারেন, তবে এ পর্য্যন্ত জানিয়া রাখুন যে, আমি বিবাহ করিব না; তবে ভবিষ্যতে একান্তই যদি বিবাহ করিতে হয়, তাঁহার বিনা অনুমতিতে আমি এ কার্য্য করিব না।

কিছু দিবস পরে সাহেব আমাকে বিনা বেতনে ৪ মাসের বিদায় মঞ্জুর করিলেন। আমি ও মাতাঠাকুরাণী ১৮৮৪ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে বেলা ১ ঘটিকার সময়ে তেজপুর অভিমুখে গো-শকটে রওনা হইলাম। বাগান পরিত্যাগের সময়ে মনে যে কি শোক উদয় হইয়াছিল তাহা লেখা বাহুল্য। সমস্ত রাত্র চলিয়া পরদিবস আনুমানিক ১০ ঘটিকার সময় তেজপুরে পৌছিলাম। মাতাঠাকুরাণী ষ্টীমার ঘাটে গো-শকটে গমন করিলেন; আমি তেজপুরের ব্রাদার্ কোম্পানীর বাবুদিগের বাসায় আহার করিয়া মাতাঠাকুরাণীর সহিত ষ্টীমার ঘাটে একত্রিত হইলাম। ঘাটে যাইয়া দেখি, জাহাজ অপেক্ষা করিতেছে; অতি সত্বর টিকিট খরিদ করিয়া ম্যাকলিন কোম্পানীর দ্রুতগামী ডাকের জাহাজে উঠিলাম। দেখিতে দেখিতে পোঁ পোঁ করিয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিল। ঐ দিবস সন্ধ্যার সময়ে গৌহাটী পৌছিয়া রহিলাম। জাহাজের ডাক্তার বাবুটি অতি ভদ্রলোক, তিনি একজন নেটিভ ডাক্তার; কলিকাতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১০০ শত টাকা বেতনে এই জাহাজে কার্য্য করিতেন উপরন্তু জাহাজের সাহেব যাত্রীদিগের

ভোজনাদির খরচ পত্রের হিসাবও তাঁহাকে রাখিতে হইত। তৎপর দিবস সন্ধ্যার সময়ে জাহাজখানি ধুবড়ি পৌছিল। শ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণী গত ২ দিবসের মধ্যে উদরে জলবিন্দু পর্য্যন্ত দেন নাই কারণ জাহাজে তিনি কিছু খান না। গত দিবস সন্ধ্যার সময়েও কিছুই আহার সংগ্রহ হয় নাই। ধুবড়ীতে জাহাজ পৌছিলে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া নদীর তীরে জল পান করিলেন। আমি ধুবড়িতে কোন ভদ্রলোকের বাটীতে আহার করিয়া আসিয়া ঐ রাত্রে ডাক্তার বাবুর কামরায় মাতাঠাকুরাণীর সহিত শয়ন করিয়া রহিলাম। তৎপর দিবস আর একখানি জাহাজ ধুবড়ি হইতে যাত্রাপুর পর্য্যন্ত যাইবার জন্য ৮ টার সময়ে ছাড়িল; ঐ জাহাজে আমরা যাত্রা করিলাম। ঠিক বেলা ১২॥০ ঘটিকার সময়ে গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম; তথায় দক্ষিণ (Northern) বেঙ্গল রেলওয়ের গাড়ী জাহাজের ডাক ও যাত্রি লইবার জন্য একটি নদীর অপর পারে অবস্থিতি করিতেছিল। আমরা সেই গাড়ীতে উঠিলাম এবং ঠিক সন্ধ্যার সময়ে কাউনিয়া ষ্টেশনে পৌছিলাম। কাউনিয়া স্থানটী মন্দ নহে, তথায় অনেকগুলি দোকান সংযুক্ত একটী বাজার এবং ভদ্রলোকদিগের বসতবাটীও দৃষ্টিগোচর হইল। সন্ধ্যার পরে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া ই, বি, রেলওয়ের গাড়িতে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলাম। কোন্ সময়ে আমরা পার্ব্বতিপুর জংসন ষ্টেশনে পৌছাইলাম এবং কাউনিয়ার গাড়ীগুলি কর্ত্তন করিয়া দার্জ্জিলিং ডাক-গাড়িতে জুড়িয়া লইয়া কলিকাতাভিমুখে রওনা হইল, নিদ্রায় অচেতন থাকায় তাহা কিছুই জানিতে পারি নাই। প্রাতে দেখিলাম নাটোর ষ্টেশনে গাড়ি লাগিয়াছে। তথায় উদরকে শীতল করিবার জন্য উত্তম সুবিখ্যাত নাটোরের মণ্ডা খরিদ করিয়া ক্ষুৎপিপাসাকে শান্ত করিলাম। বেলা ৮ ঘটিকার সময়ে সাঁড়া ষ্টেশনে অবতরণ পূর্ব্বক জাহাজে পার হইয়া পরপারে দামুকদিয়া ষ্টেশনে পুনরায় গাড়িতে উঠিলাম। আনুমানিক

বেলা ১০ ঘটিকার সময়ে আমাদের নির্দ্ধারিত ষ্টেশন চুয়াডাঙ্গায় অবতরণ করিয়া আহারাদি করিলাম। তথা হইতে গো-শকটে রওনা হইয়া পরদিবস প্রাতঃকালে নলডাঙ্গায় পৌঁছিলাম। আমার পত্নী-বিয়োগ সংবাদ পূর্ব্বেই সকলে শুনিয়াছিলেন; তাঁহারা তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে নলডাঙ্গার রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় মহাশয় অনেক অর্থব্যয় করিয়া ৩টী বিধবার বিবাহ দেওয়াইয়া ছিলেন এবং সেই সময়ে ২।৩টী বিধবা পাত্রীও নলডাঙ্গায় উপস্থিত ছিল। আমার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা বাহাদুরের এরূপ মনে ধারণা হইল যে আমি উহাদিগের মধ্যে একটিকে বিবাহ করি। তজ্জন্য আমাকে তিনি অনুরোধ করিলেন কিন্তু সন্তোষজনক উত্তরে বঞ্চিত হইলেন।

আমি আসাম হইতে আমার শ্বশুর মহাশয়কে এইরূপ পত্র লিখিয়া রওনা হই যে,—২৫শে নভেম্বর তারিখে বলাগড়ে আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। কারণ গত দুর্ঘটনায় তাঁহার মনের শান্তি নষ্ট হইয়াছে আমাকে দেখিলে তাঁহাদের শোক অনেক প্রশমিত হইবে। নলডাঙ্গাস্থ সকলে বলাগড় যাওয়ার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া আমাকে তথায় যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন কিন্তু সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া কয়েক দিবস পরে আমি বলাগড় রওনা হইলাম। চাকদহ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে জশড়ার ঘাটে যাইতে যাইতে মন যে কিরূপ শোক-সাগরে নিমগ্ন হইল তাহা ব্যক্ত করা দুরূহ। জশড়ার ঘাটে উপস্থিত হইয়া একখানি নৌকা ঠিক করতঃ বলাগড়াভিমুখে রওনা হইলাম। নৌকা চলিতে আরম্ভ করিলে মনও নৈরাশ্যে ভাসিতে লাগিল। এই জশড়ার ঘাট হইতে কত আনন্দের সহিত ২ বৎসর পূর্ব্বে নৌকাযোগে বিবাহ করিতে আগমন করি, সে আনন্দের সীমা কোথায় আর যাহার সহিত উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে যাওয়ায় মন কিরূপ সুখের সাগরে ভাসিয়াছিল আজ কি না সেই হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আমাদের

নিবিড় জঙ্গলে রাখিয়া একাকী তাহার পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। ঈশ্বরের লীলা-খেলা বুঝা ভার যে-স্থানে অপরিসীম আনন্দে এক সময়ে গিয়াছি, আবার ঠিক সেই স্থানে অপরিসীম শোক লইয়া যাইতেছি। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নৌকাখানি বলাগড়ের ঘাটে পৌছিল। আমি একজন মাঝিকে সঙ্গে লইয়া রাত্র ৮৷৷০ ঘটিকার সময়ে শ্বশুরালয়ে পৌছিলাম। সদর দরজা বন্ধ ছিল বারংবার আঘাত করিয়া কাহারও কোন উত্তর পাইলাম না; পরিশেষে আমার শ্যালক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দরজা খুলিলেন। আমি আসিয়াছি এই সংবাদ অন্দর মহলে পৌছিলে আমার শ্বশ্রু মাতাঠাকুরাণী রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া আমার পূর্ব্ব শোক উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আমি অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বৈঠকখানায় যাইয়া বসিলাম। পূর্ণ ভায়া তাঁহার ভগ্নির মৃত্যু বিবরণ শ্রুত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহার মাতাঠাকুরাণী অন্তরালে মৃত্যু বিবরণ সকল আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুল লোচনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে আমার শ্বশুর মহাশয় পাড়া বেড়াইয়া বাটী আসিলেন; আমাকে দেখিয়া তিনি তত দূর হা-হুতাশ করিলেন না, বোধ করি এই শোক তাহার মনকে ততদূর দ্রবীভূত করিতে পারে নাই কারণ প্রথম পক্ষীয় পরিবারের সন্তানগণের গঙ্গায় নৌকাডুবি হইয়া যে সর্ব্বনাশ সাধন হইয়াছিল তাহার নিকট এটি কিছুই নহে। আমি মনদুঃখে ও পথকষ্টে বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিছুই আহার করিলাম না, পূর্ণ ভায়ার শয্যায় শয়ন করিলাম সত্য কিন্তু রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত নিদ্রাদেবীর কোনরূপ অনুসন্ধান পাইলাম না। রাত্র আন্দাজ ১২ টার সময়ে আমার শ্বশুর মহাশয় তাঁহার শয়ন কক্ষ হইতে আমাকে আহ্বান করিলেন, আমি তাঁহার ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শ্বশুর মহাশয় ও শাশুড়ি মাতাঠাকুরাণী ঘরে দাঁড়াইয়া

আছেন। শ্বাশুড়ি মাতাঠাকুরাণী আমার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন—"তোমাকে অপরের জামাতা হইতে দিব না"। অনেকেই আমাদের কন্যার সহিত তোমার বিবাহ দিতে উৎসুক হইয়াছেন। অতএব আমার কনিষ্ঠা কন্যা সুকুমারীকে বিবাহ কর। (পাঠক! তখন সুকুমারীর বয়ঃক্রম ২॥০ বৎসর মাত্র) আমি শুনিয়া অবাক্। কারণ এই বালিকার পিতামাতা হইয়া কেমন করিয়া তাহার অকল্যাণ-শুচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আমার বয়ঃক্রম তখন ২৫ বৎসর—এই সম্মিলন কি সঙ্গত হইতে পারে। আমি তাহা শুনিয়া কহিলাম, আমি যে আর বিবাহ করিব না তাহা আমার পত্রে আপনারা জ্ঞাত হইয়াছেন তবে কেন আমাকে অসম্ভব অনুরোধ করিতেছেন; বিশেষতঃ বালিকা বিবাহ ১৯০০ শতাব্দীর মতে গর্হিত। আপনি একজন বিজ্ঞ হইয়া কেমন করিয়া এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন? আমাকে ক্ষমা করুণ. আমি এইরূপ বিবাহে রাজি হইতে পারি না। বিশেষতঃ আমার তত্ত্বাবধায়ক আমার মাতুল মহাশয় ও মাতাঠাকুরাণী বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে বিবাহ করা উচিত কি? তাহা শুনিয়া আমার শ্বশুর ও শ্বাশুড়ি মাতাঠাকুরাণী কহিলেন,—আমাদিগের কন্যার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক না কেন, তোমার তাহাতে আপত্তি কি? তোমার গত পরিবারের ভগ্নীকে স্ত্রীরূপে পাইলে পূর্ব্ব পরিবারের অনেক অঙ্গসৌষ্ঠব ইহাতে থাকায় তোমার ভগ্ন মনকে অনেক পরিমাণে শান্ত করিতে পারিবে। তোমাকে পুত্রবৎ ভালবাসি ও স্নেহ করি বলিয়াই আমাদিগের এইরূপ ইচ্ছার কারণ। এই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিলে তুমি আমাদিগের পর হইবে না। আমি কহিলাম,—সে কিরূপ স্নেহ ও ভালবাসা? যদিও আপনাদের কন্যা পরলোক গমন করিয়াছে, কিন্তু আমি যাবজ্জীবন আপনাদিগের স্নেহ ও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইব না। স্বার্থ ভালবাসা পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ ভালবাসাকেই হৃদয়ে ধারণ

করুন। তাঁহারা আমার সকল কথা উড়াইয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগের শিশু কন্যাকে বিবাহ করিতে জেদ করিতে লাগিলেন এবং আমাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করাইবেন তাহা স্পষ্টই প্রকাশ করিলেন। আমার মাতা ও মাতুল মহাশয়কে পত্র না লিখিয়া ২।৩ দিবসের মধ্যে কার্য্য সমাধা করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহাদিগের ভাবগতিক দেখিয়া আমার মন দ্রবীভূত হইল, আমি ইহার প্রকৃত উত্তর ঐ রাত্রে দিতে পারিলাম না; কহিলাম পর দিবস প্রাতে ইহার যথার্থ উত্তর পাইবেন। সমস্ত রাত্রের মধ্যে নিদ্রার লেশ মাত্র হইল না। প্রাতে উঠিয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এখন কি প্রশ্নের উত্তব দিবে? আমি জড়িত স্বরে কহিলাম, এই বিবাহ করাই স্থির কবিয়াছি। ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। আমার শ্বশুর মহাশয় কহিলেন,—অদ্য এখনই কলিকাতায় চল, তথায় আমার ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, তাঁহার একবার মত লওয়া দরকার। যদি ইহাতে সকলের মত হয় তবে আর আপত্তি কি? এই সঙ্কল্প করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা স্নান আহার সমাপনান্তে বেলা ৮ ঘটিকার সময়ে কলিকাতায় ষ্টীমারে রওনা হইলাম। ঐ দিবস শান্তিদেবী এক মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে উদিত হইলেন না। আমি লজ্জিত এবং ম্রিয়মান হইলাম আমার মাতা থাকিতে কিনা আমি তাঁহার বিনা অনুমতিতে ২॥০ বৎসরের শিশু-কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছি? ধিক্, আমার জীবনে! বৃদ্ধ বয়সে আমার মাতার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য কোথায় আমি বয়স্ক কন্যাকে বিবাহ করিব তাহা না করিয়া বিপরীত ভাবাপন্ন হইলাম। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার দুঃখিনী মাতাঠাকুরাণী ও মাতুল, মহাশয় কি বলিবেন? কি মন্দ অদৃষ্ট লইয়াই এই ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি? বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করিতে পারিলাম না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে

জাহাজখানি ভাগীরথির উপর দিয়া শব্দ করিতে করিতে ত্রিবেণী বাঁশবেড়ে, হুগলী অতিক্রম করিয়া ফরাশডাঙ্গায় পৌছিল। গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বস্থ গ্রামে অট্টালিকা শ্রেণীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে আমার ম্রিয়মান মন অন্য ভাব ধারণ করিল। গ্রামস্থ অবলাগণ গঙ্গাজলে গাত্র মার্জ্জন করিতেছে, কত যাত্রি লইয়া নৌকাসকল গমনাগমন করিতেছে। এই সকল শোভা দর্শন করিতে করিতে ঠিক সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলিকাতায় আহিরীটোলার ঘাটে জাহাজখানি নোঙ্গর করিল। আমরা টিকিট দিয়া তীরে উঠিলাম। পদব্রজে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময়ে রাজার লেনস্থ শ্রীকৃষ্ণ বাবুর বাটীতে পৌছিলাম। আমাকে দেখিয়া সকলেই অবাক্! সংক্ষেপে শ্বশুর মহাশয় সর্ব্ব বিবরণ কহিলেন; তাহাতে সকলেই আনন্দিত হইলেন। আমার সম্বন্ধে একজন শ্যালী আমাকে নজরবন্দীভাবে রাখিলেন,—যেন পাখী উড়িয়া না পালায়। পরদিবস প্রাতে বড় বড় বাবু মহাশয়েরা আসিয়া এই বিবাহ উপযুক্ত এবং সঙ্গত কিনা কথোপকথন করিতে লাগিলেন। একজন পুরোহিত আসিয়া গাত্র হরিদ্রা ও বিবাহের দিবস নির্দ্ধারিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে শ্বশুর মহাশয় আমাকে কহিলেন,—"আমার এক মাতুল কন্যা জুনাহদাহে আছে, সে সুকুমারীকে সম্প্রদান করিতে পূর্ব্ব হইতেই ইচ্ছুক, অতএব তাহাকে বনাগড়ের বাটীতে আসিতে পত্র লিখিতে পারি কি?" আমি মত প্রকাশ করিলে সেই দিনই পত্র লেখা হইল। এই দিবস হইতেই শ্বশুর মহাশয় বিবাহের জিনিষ পত্র খরিদ করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে কহিলাম, নলডাঙ্গার তিন আনার রাজা সৌরেন্দ্রচন্দ্র দেবরায় আমার বাল্য সুহৃচর বর্ত্তমানে ৩০নং হরিতকী বাগানে সপরিবারে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য বাস করিতেছেন; অনুমতি হইলে আবার যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি এবং বনাগড়ে

যাইবার পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত তথায় থাকিতে ইচ্ছা করি। শ্বশুর মহাশয় কহিলেন,—"যখন এই বিবাহে তোমার কোন আপত্তি নাই তখন সেখানে তুমি অনায়াসে থাকিতে পার তবে তোমার গাত্র হরিদ্রার এক দিবস পূর্ব্বে তোমাকে হরিতকী বাগান হইতে আমার একজন ভাগ্নে বলাগড়ে লইয়া যাইবে। আমি তাহাতে রাজি হইলে অপরাহ্নে ৪ ঘটিকার সময়ে তিন আনার রাজার বাসাবাটীতে উপস্থিত হইলাম। সৌরেন্দ্রচন্দ্র অনেক দিবস পরে আমাকে সন্দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। আমার পত্নীর মৃত্যু সংবাদ আমার আসামের পত্রে জ্ঞাত ছিলেন। আমি তাহার দ্বিতল বৈঠকখানায় উপবেশন করিয়া এই বালিকা বিবাহের বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম। তিনি ইহার পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার আপন ভগ্নির সহিত আমার বিবাহ দিবেন। ইহার জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার অধীন যশাগ্রাম নামক গ্রামে। নলডাঙ্গায় পোষ্যপুত্ররূপে রাজবাটীতে গৃহিত হয়েন। আমি তাঁহার ভগ্নির বিবাহের সম্বন্ধের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলাম এবং কহিলাম,—আমি যে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি, ইহা শ্রবণ করিয়া আমাকে এই বিবাহ করিতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার বাসায় কাল কাটাইতে লাগিলাম ও নির্দ্ধারিত দিন উপস্থিত হইলে বলাগড়ে যাইব এইটী মনে মনে স্থির করিয়া রহিলাম। আমার শ্বশুর মহাশয়ের আত্মীয় যে দিবসে আমাকে বলাগড়ে লইয়া যাইবার জন্য এই বাটীতে আসিবার কথা ছিল, সে দিবসে কেহই আসিলেন না। পরে পরস্পর জানিতে পারিলাম বলাগড় নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকিশোর বাবু আমাকে লইতে আসিয়াছিলেন কিন্তু রাজা সৌরেন্দ্রের পরামর্শে তাহার দারোয়ান বলিয়াছিল যে,—"আমি এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছি"। তিনি ভগ্নমনোরথ হইয়া চলিয়া যান। এদিকে রাজা সৌরেন্দ্র আমার অজ্ঞাতে নলডাঙ্গার আমার মাতুল

মহাশয়কে সর্ব্ব বিষয় খুলিয়া পত্র লিখেন। বলাগড়ে যাইবার দিন অতিবাহিত দেখিয়া আমি শ্বশুর মহাশয়কে একখানি পত্র লিখি এবং ডাকঘরে ফেলিয়া দিতে উহাদিগকে বারম্বার বলিয়াছি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ পত্রের শিরনামা ছিন্ন ভিন্নরূপে পাইখানায় পতিত দেখিয়া রাজার চাতুরী হৃদয়াঙ্গম করিতে পারিলাম। পাইখানায় ঐ ছিন্ন ভিন্ন শিরনামা পত্রখানি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজার চাতুর্য্যের বিষয় মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম, সেই দিন অতি প্রত্যুষে পূজার দালানে মাতুল মহাশয়ের কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হওয়ায় ভাবিলাম এই মাত্র তিনি প্রাতে যশোহরের গাড়ীতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। আমি হাত ছাড়া হইয়াছি কিনা, রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি অন্তরাল হইতে এই সকল কথা শ্রবণ করিতে লাগিলাম। লজ্জায় ও ঘৃণায় মন কিম্ভূৎ-কিমাকার হইতে লাগিল এবং অদৃষ্টকে শত শত ধিক্কার দিতে দিতে মাতুল মহাশয়ের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া বরং বিপরিত কটু-কাটব্য ভাষায় আমাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। আমি নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম নলডাঙ্গার রাজা কমলেসচন্দ্র দেবরায়, বাবু কালীদাস দেবরায় এবং আমার বন্ধু বাবু কেশবচন্দ্র দেবরায় মহাশয়দিগের হস্ত লিখিত আমার নামীয় কয়েকখানি পত্র মাতুল মহাশয় আমাকে প্রদান করিয়া আমার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। ভাবুক মহোদয়গণ এই সময়ে আমার মনের ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলেই হৃদয়াঙ্গম করিতে পারিবেন যে, তাহা কত দূর অশান্তি পূর্ণ মনে হইতে লাগিল মৃত্যুই যেন শ্রেয় কারণ এক দিকে সত্য কড়ারে আবদ্ধ, অপরদিকে পরম পূজ্যদিগের সম্পূর্ণ অসম্মতি, আমি কি করি কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে অস্ফুট স্বরে কহিলাম—"যখন সত্য কড়ারে আবদ্ধ হইয়াছি তখন এই বিবাহ করা কি শ্রেয় নহে?" মাতুল মহাশয় ইহা শ্রবণ করিয়া

রাগান্বিত হইয়া সকল কথা উড়াইয়া দিলেন। স্নান আহার সমাপনান্তে মাতুল মহাশয় রাজার অন্নাধীনে রাখিয়া জামালপুরের শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার সহিত আমার বিবাহ নির্দ্ধারন মানসে ২॥০ ঘটিকার লুপ মেলে জামালপুর রওনা হইলেন। আমি কারাগার স্বরূপ রাজার বাসায় অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইলাম। মনে মনে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। মাতুল মহাশয় জামালপুর হইতে উল্লিখিত বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করিয়া রাজার বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা সৌরেন্দ্রচন্দ্রের ভগ্নির সহিত বিবাহে বিঘ্ন পড়িল। এই সময়ে এই মহানগরীতে দেবেন্দ্র বাবু অর্থাৎ আমার ভাবী শ্বশুর মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া অর্শ ভগন্দর পীড়ার চিকিৎসার জন্য মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের একটী কামরা লইয়া বাস করিতেছিলেন। মাতুল মহাশয় আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার সহিত যাইতে বাধ্য হইলাম। কারণ তিনি আমার সহিত কর্ত্তৃপক্ষ, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা আমার সাহসে কুলাইল না। আমি এই ঘটনায় সম্পুর্ণ দোষী, কেননা আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে এবং বিবেচনা শক্তি যে ছিলা না তাহাই বা কি করিয়া বলি; যদি ধর্ম্মের দিকে এবং একজন ব্রাহ্মণের মনকষ্ট নিবারণ করিতে চেষ্টিত হইতাম, তাহা হইলে কি আমাকে আমার মাতুল মহাশয় অবশ করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেন? তবেই দেখুন, আমিই প্রকৃত পক্ষে দোষী এবং একজন ব্রাহ্মণের মনকষ্টের প্রধান কারণ কি না?

এই সময়ে মনের অশান্তি ভাব ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রবাবু আমাদিগকে সন্দর্শন করিয়া এবং মাতুল মহাশয়ের নিকট সকল সমাচার জ্ঞাত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। আনন্দের প্রধান কারণ—যে বিবাহের জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা অতি সহজে বিনা বিঘ্নে নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা হইতেছে। তিনি

দ্বিরুক্তি না করিয়া কহিলেন—"শুভ কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন করুণ আমার ইহাতে কোনরূপ আপত্তি নাই।" এই মাঘ মাসের মধ্যেই উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হউক।" তিনি পূর্ব্বেই অস্ত্র প্রয়োগ সংবাদ পাইয়া ভয়ানক ভীত হইয়াছিলেন এবং সুযোগ মত চিকিৎসালয় হইতে বহির্গত হইবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। এখন এই ঘটনায় আর কাল বিলম্ব না করিয়া ২।১ দিবসের মধ্যেই প্রধান অস্ত্র চিকিৎসকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া কলেজের রাস্তায় একটী বাটীতে গমন করিয়া জলপানের আয়োজন করিলেন। আমরা অল্প সময় তথায় অতিবাহিত করিয়া হরিতকী বাগানে রাজার বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। ২।১ দিবসের মধ্যে তিনি রাজার বাসায় আসিয়া আমাকে মোহর দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গমন করিলেন। মাতুল মহাশয় এই পল্লীর একজন পুরোহিতের দ্বারা বিবাহ ও গাত্র হরিদ্রার দিবস নির্ণয় করিয়া লইলেন। বিবাহের তিন দিবস পূর্ব্বে আমাকে লইয়া জামালপুরে রওনা হইবার দিন স্থিরীকৃত হইল। নির্দ্ধারিত দিবসে বেলা ১টার সময়ে একখানি ভাড়াটিয়া অশ্ব শকট রাজার বাসায় আসিল ; মাতুল মহাশয় আমাকে এবং রাজার একজন সহোদর ভ্রাতা সমভিব্যাহারে হাওড়া ষ্টেশনে রওনা হইলেন। হাওড়ার বিখ্যাত গঙ্গার পুল পার হইয়া ষ্টেশনে গাড়ীখানি দাঁড়াইলে আমরা সকলে অবতরণ করিয়া টিকিটাদি লইয়া বেলা ২॥০ ঘটিকার লুপ ডাক গাড়ীতে জামালপুর রওনা হইলাম। যথা সময়ে গাড়ী হাওডা ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল ; ঐ সময়ে আমার মন সুখ এবং দুঃখের মধ্যস্থল দিয়া যাইতে লাগিল। মনুষ্যের স্বভাব বিবাহ করিতে যাইবার সময়ে এক প্রকার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, আমার কিন্তু সে ভাব নহে। পূর্ব্ব পত্নীর চিন্তায় মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ; তাহার পরিবর্ত্তে আর একজন ঐ স্থান অধিকার করিলে হয় তো পূর্ব্ব আনন্দ কিয়ৎ পরিমাণে

উপলব্ধি করিতে পারিব মনে এইরূপ তোলা পাড়া করিতে লাগিলাম। ক্রমে সে ভাব একেবারে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া প্রকৃতির শোভার দিকে ধাবিত হইল। ইতি পূর্ব্বে আমি মাহেষের রথের সময়ে শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত এই লাইনের গাড়ীতে আসিয়াছিলাম তাহার পশ্চিমে আর কখন গমন করি নাই, সুতরাং শ্রীরামপুর ত্যাগ করিয়া যখন গাড়ীখানি পশ্চিম দিকে যাইতে আরম্ভ করিল তখন মনের আনন্দে নূতন নূতন প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বিহ্বল হইলাম। ক্রমে হুগলী চন্দননগর ইত্যাদি সুসজ্জিত ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। বর্দ্ধমান ষ্টেশনটি অতি সুন্দর সজ্জিত, বৃহৎ ষ্টেশন ও যাত্রিতে পরিপূর্ণ। বর্দ্ধমানের রাজবাটী দেখিবার জন্য বহুকাল হইতে মনের আবেগ ছিল কিন্তু দেখা আর হইল না। সীতাভোগ, মিহিদানা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন এখানে সকল সময়েই পাওয়া যায়। আমরা উক্ত মিষ্টান্ন খরিদ করিতে ষ্টেশনের এক ধারে একটী কামরায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম; আরোহীগণ ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া দোকান ঘরের বহির্ভাগে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিতেছে। একটী দরজায় শত শত লোকে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে; এখানে অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত গাড়ী অবস্থিতি করিবে ইহা সকলেই জানে তত্রাচ সকলেই ব্যস্ত। জনতার হ্রাস হইলে আমিও খাই খাই করিয়া দোকানে পড়িব এইরূপ কল্পনা করিতেছিলাম কিন্তু দেখিলাম জনতা হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন কল্পনা ত্যাগ করিয়া রাত্রের আহারের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইলাম। অতি কষ্টে দোকানদার মহাশয়কে শতবার অনুরোধান্তে মিষ্টান্ন দ্বারা আমার হস্ত শোভিত হইল। তথা হইতে গাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হওয়ামাত্র গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধমান ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া কানু জংশন ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। এস্থান হইতে রেলওয়ে লাইনটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, আমাদের

গাড়ী পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে সুরু করিল। লুপ লাইনের প্রথম ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে দেখিলাম এই দিকের ষ্টেশনগুলি তত ভাল নহে। ক্রমে ক্রমে সকল ষ্টেশনগুলি পরিত্যাগ করিয়া রাত্র ৩ ঘটিকার সময়ে বরিয়ারপুর ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিল। গাড়ীখানি উক্ত ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, কিছুক্ষণ পরে জামালপুরের নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলাম আমাদিগকে লইয়া পর্ব্বত মধ্যে গাড়ীখানি প্রবেশ করিল। গাড়ীতে যে আলো ছিল তাহা মিট্ মিট্ জ্বলিতেছিল, পাহাড়ের গহ্বরে প্রবেশ করিবামাত্র গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হইল। আর যে লোক দর্শন ঘটিবে এরূপ মনে হইল না, কিন্তু আরোহীদিগের উদ্বিগ্নচিত্তকে প্রসমিত করিবার জন্যই যেন অতি সত্বরেই দয়াময় হরি আমাদিগকে জ্যোৎস্নার আলোক প্রদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে জামালপুর ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী হইল এবং জামালপুর, জামালপুর শব্দ কর্ণ-গোচর হইতে লাগিল। আমরা সকলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। জামালপুর ষ্টেশনে আমাদিগকে লইতে একজন ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। আমি পাল্কীতে, মাতুল মহাশয় এবং রাজার ভ্রাতা পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। রাত্রে জামালপুরের দৃশ্য ততদূর পরিদর্শন করিতে পারিলাম না। আমার ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের বন্ধু শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগের বাসা ঠিক করা ছিল সুতরাং আমরা তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। অন্নদাবাবু একজন বিজ্ঞ বিদ্বান ভদ্রলোক, এই নিশিত রাত্রে আমাদিগের জন্য বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা উপস্থিত হইলে আমাদিগের সহিত অতি ভদ্রচিতভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন এবং ঐ সময়ে আমার ভাবী শ্বশুর মহাশয়ও তথায় উপস্থিত হইলেন। আমরা ২।১ ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম লাভ করিলাম।

অন্নদাবাবু ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের একজন বন্ধু ছিলেন। পূর্ব্বে তিনি ইণ্ডিয়ান মিরার কাগজে অনেক বিষয় লিখিতেন। সেই সময়ে তিনি ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন ছিলেন। নদী যেরূপ পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া পরিশেষে স্থির মহান সমুদ্রে নিপতিত হয়, তেমনি ইনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্যান্য ধর্ম্ম যাজকের সহিত মিলিত হইয়া সেই ধর্ম্মের আস্বাদে পরিতৃপ্ত না হইয়া পুনর্ব্বার সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের বশতাপন্ন হইয়া এখন ইনি হিন্দু ধর্ম্মের নেতারূপে পরিচিত। ইনি আমার শ্বশুর মহাশয়ের অফিসের বড় বাবু তজ্জন্য সৌহৃদ্দতা পূর্ব্ব হইতেই সমভাবে আছে। আমাকেও তাঁহার জামাতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। এক্ষণে নিম্নে আমার শ্বশুর মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু বলিব।

প্রথমে ইহার অবস্থা তত ভাল ছিল না। ইংরাজী প্রবেশিকা পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রংপুরে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে কার্য্য করিতেন পরে কাঁচড়া পাড়ার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করেন, পরিশেষে শরীর অসুস্থ হওয়ায় জামালপুরে জলবায়ু পরিবর্ত্তন মানষে আগমন করিয়া তথায় সকলের যত্নে জামালপুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক রূপে কয়েক বৎসর কার্য্য করেন। এডুকেশন লাইনে উন্নতির আশা কম দেখিয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লোকোমটিভ্ অফিসে কার্য্য করিতে সুরু করেন, সাহেব তাঁহার কার্য্য তৎপরতার জন্য সুনজরে দেখিতেন ক্রমে ক্রমে তাঁহার ৬৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়। এক্ষণে তিনি ৭৫৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন।

পাঠক মহাশয়, একবার কষ্ট স্বীকার করিয়া অন্নদাবাবুর বৈঠকখানায় চলুন, ঐ যে দেখিতেছেন কয়েকটি বালিকা পরস্পরে কি কহিতেছে,—উহারা কে জানেন? উহারা আমার ভাবি শ্যালী। তাহাদিগের বড় আনন্দ কারণ তাহাদিগের দিদির বর দেখিতে আসিয়াছে এবং মিটি মিটি হাসিতেছে; উহাদিগের বয়ঃক্রম ৭।৮ বৎসরের উর্দ্ধ হইবে না।

আমাকে নাম জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলে আমি প্রথমে বিরক্ত হইলাম এবং ভাবিলাম এই সকল বালিকাকে আমার কি নাম বলিব? তাহারাও ছাড়িবার পাত্রি নহে, সময় গতিকে বয়স্ক হইয়াও বিবাহের পাত্র চোরের তুল্য হইয়া থাকে। আমি এখন সেই ভাবাপন্ন হইয়াছি। নাম কহিতে বাধ্য হইলাম। সমস্ত রাত্র নিদ্রা হয় নাই অথচ ইহারা অনর্থক বিরক্ত করিতেছে, আমার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। অন্নদা বাবু তাহাদিগকে কৌশলে বিদায় করিয়া দিলেন। আমরাও হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া উত্তম প্রকারের মিষ্টান্ন দ্বারা উদরকে শীতল করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলাম। তৎপর দিবস আমরা অপরাহ্নে জামালপুরের দৃশ্য সন্দর্শন করিতে বাসা হইতে বহির্গত হইলাম। জামালপুর একটী সহর বিশেষ; ২।৩টী বাজার ৪টা পুলিশের ফাঁড়ি, পোষ্টাফিস, মিউনিসিপ্যালিটির বন্দোবস্ত মন্দ নহে, রাস্তাগুলি প্রশস্ত, একটী ভাল ইংরাজী বিদ্যালয়, ইহা হইতে প্রতি বৎসর অনেক ছাত্র পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত হইয়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ইংরাজ টোলাটী অতি পরিষ্কার, জাঁক-জমক বিশিষ্ট; অনেক স্থান ইহার পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছি কিন্তু জামালপুরের ইংরাজ পল্লীটী সকলকে পরাস্থ করিয়াছে। ন্যুনাধিক ৬।৭ শত ইংরেজ রেলওয়ের কার্য্য উপলক্ষে বাস করিয়া থাকে। জামালপুরের ইংরেজ টোলার পূর্ব্বদিকে পাহাড়ের অতি নিকটে খোলা ময়দান, তথায় ইংরাজ সখের সৈনিকগণ প্রতি শীতকালে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন। ঐ স্থানটী আরও মনোরম। প্রত্যহ অপরাহ্নে কত শত বাঙ্গালী বাবু ও ইংরেজ স্ত্রী পুরুষ তথায় বায়ু সেবনার্থ বিচরণ করিয়া থাকেন। ঐ পাহাড়ের শিখর দেশে একটি ৺কালীর মন্দির বিরাজিত কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা আমার ভাগ্যে দর্শন লাভ হয় নাই। পর দিবস প্রাতে আমার গাত্র হরিদ্রা সুতরাং আমাকে ভাবি শ্বশুর বাটী লইয়া গেল; তথাকার স্ত্রীলোকগণ

হরিদ্রা মার্জ্জন করিতে লাগিলেন,। কোথায় নিজ বাটিতে গাত্র হরিদ্রা হইবে তাহা না হইয়া শ্বশুর বাটিতে হইতেছে, ইহার মূলীভূত কারণ আমি নিজেই।

বিবাহ রাত্রে স্থানীয় বহু ভদ্রলোকের সমাগম হয়, সন্ধ্যার সময়েই যে লগ্ন ছিল সেই লগ্নে ৪।৫ বৎসর বয়সের একটী পাত্রীর সহিত আমার বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম ইহার বয়ঃক্রম ১০ বৎসর, কিন্তু অনৈক্যতা দেখিয়া অবাক হইলাম। মনে মনে এই স্থির করিলাম, প্রবঞ্চনা এ স্থানে আসিতে পারে না তবে বোধ করি পাত্রীটী খর্ব্ব হইবে। তাহার পর মনে হইল, যখন মাতুল মহাশয় পাত্রী দেখিয়া বিবাহ স্থির করিয়াছেন তখন খর্ব্ব বা বামন কি করিয়া হইতে পারে? যাহা হউক বাসর ঘরের নানারূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া শেষ রাত্রে ২।১ ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম লাভ করিতে পারিয়াছিলাম। পর দিবস প্রাতে পুনর্বিবাহ কার্য্য সম্পন্নাতে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যে পুরোহিত বিবাহের এবং পুনর্বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিয়াই ছিলেন, তিনি জ্ঞানী, আমাকে মন্ত্রগুলির বাঙ্গলা ব্যাখ্যা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ দিবস বর-ভোজন মহা সমারোহে সম্পন্ন হইল। অপরাহ্নে রেলগাড়ী যোগে অল্প সময়ের মধ্যেই মুঙ্গের পৌছিলাম। ইহা অতি পুরাতন সহর, প্রায় ৬০।৬৫ হাজার লোকের বসতি। ইহা এক কালে জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। মুঙ্গেরে একটি দুর্গ আছে তাহার ৩টি ফটক কতকাংশ ভগ্ন অবস্থায় পরিণত হওয়ায় ইংরেজ রাজ ভগ্ন সংস্কার করাইতেছেন। মুঙ্গেরের পূর্ব্বতম ধনি ইংরাজ সদাগর ডিয়ার সাহেব একটী প্রকাণ্ড টাওয়ার যুক্ত ঘড়ি একটী ফটকে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন উহা একটী দেখিবার জিনিষ। এতদ্ব্যতীত হাসপাতাল অতি মনোরম তৈয়ারী করাইয়া দিয়া সুকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছেন। দুর্গের এক কিনারায় প্রসিদ্ধ কষ্ট হারিনার ঘাট; এই স্থানে গঙ্গামাতা উত্তর-

বাহিনী হইয়াছেন; এখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয় এবং প্রতিদিন প্রাতে জামালপুর ও মুঙ্গেরের নর-নারীগণ স্নানান্তে সকল কষ্ট মাতাকে দিয়া নিজ নিজ আবাসে গমন করিয়া থাকেন। এই সমস্ত দৃশ্য দেখিয়া মনে আমরা কথঞ্চিৎ শান্তি পাইলাম। আমার শ্বশুর মহাশয়ের একজন বন্ধুর ভাগ্নেয় আমাদিগকে সহরের অনেক স্থান দেখাইলেন। মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যস্থিত একটী সুসজ্জিত দ্বিতল অট্টালিকা অতি উচ্চতম প্রদেশে অবস্থিত দেখিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম এই বাটীটিতে কে বাস করেন? তিনি বলিলেন এই স্থানটীর নাম চুপড়া; পূর্ব্ব কালে দাতাকর্ণ এই স্থানে তপস্যা করিতেন; ঐ বাটীটি মুরশিদাবাদের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায় ইংরাজ রাজের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। মুঙ্গেরের ১ ক্রোশ ব্যবধানে পীর পাহাড়; ঐ পাহাড়ের শিখর দেশে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা দৃষ্টি গোচর হইল। শুনিলাম, ইহা কলিকাতার ঠাকুর বাবুদিগের বাটী; ইহাও একটি মনমুগ্ধ কর স্থান। আমরা দূর হইতে তাহার শোভা দেখিয়া মোহিত হইলাম। মুঙ্গেরের ২ ক্রোশ ব্যবধানে সীতাকুণ্ড তীর্থ; শুনিলাম, তথায় একটী গরম জলের নির্ঝর আছে; অথচ চাউল নিক্ষেপ করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। উহা এতাদৃশ উষ্ণ যে কাহারও হস্তে জল সংলগ্ন হইলেই দগ্ধ হয়। দিবা রাত্র জল স্ফুটিত হইতেছে এই দৃশ্যটী আমাদের দর্শন লাভ হয় নাই। মুঙ্গেরে ২।৩ ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া জামালপুরে প্রত্যাগমন করিলাম। তৎপর দিবস কেশবপুর পল্লীস্থিত একজন সমবয়স্কের সহিত জামালপুরের টানেল দেখিতে গমন করি। আমরা অতি প্রত্যুষে পাহাড়ের নিম্নদেশে পৌঁছিয়া দেখিলাম রেল কোম্পানী অতি পরিষ্কার রূপে পাহাড়টী কাটিয়াছে। রেলওয়ে রাস্তার দুই পার্শ্বে লোকজন গমানাগমন করিবার জন্য পরিশর স্থান রাখা হইয়াছে। তবে আমার বিশ্বাস গাড়ী উহার

মধ্যে প্রবেশ কালীন ভিতরে লোক থাকিলে ইঞ্জিনের আবদ্ধিভূত ধূম দ্বারা লোকের শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা এবং ঐ খিন্‌খিনের ছাদ হইতে দিবা রাত্র টুপ-টাপ করিয়া জল পতিত হইতেছে। তৎপরে আমরা টানেলের উপরিভাগে অতি কষ্টে উঠিলাম। তাহার-উপরি ভাগে টেলিগ্রাফের তারের থাম রহিয়াছে। টানেলের নিকটবর্ত্তী স্থান বক্র বলিয়া ঐ স্থানে একজন পরিদর্শক রহিয়াছে, ঐ লোক উভয় দিকের গাড়ি, ট্রলি'বিনা বিঘ্নে সঙ্কেৎ দ্বারা চালিত করাইয়া থাকে। পাহাড়ের উপরিভাগে ছোট ছোট বৃক্ষ ভিন্ন বড় বৃক্ষের লেশ মাত্র নাই। এই পাহাড় হইতে জামালপুর সহরটি অতি সুন্দর ভাবে দৃষ্টি গোচর হয় এবং ষ্টেশনে, রেলওয়ের বৃহৎ কারখানা এবং ইংরেজ পল্লীস্থিত অট্টালিকা শ্রেণীর সুন্দর সৌন্দর্য্যতায় আমরা মোহিত হইলাম। সূর্য্যের খরতর কিরণে ক্লান্ত হইয়া আমরা পাহাড় হইতে অবতরণ করতঃ দ্রুতপদে জামালপুরাভিমুখে রওনা হইলাম। বেলা আনুমানিক ১০॥০ ঘটিকার সময়ে আমরা পৌছিলাম। ঐ রাত্রে ফুলশয্যা সমপনান্তে পর দিবস রাত্রি ৯॥০ টার ডাক গাড়ীতে কলিকাতায় রওনা হইয়া তৎপর দিবস প্রাতে ১০॥০ ঘটিকার সময়ে কলিকাতায় পৌছিয়া আমরা হরিতকী বাগানস্থিত "তিন" আনা রাজা মহাশয়ের বাসায় যথা সময়ে উপস্থিত হইলাম। রাজার বাসার মহিলাগণ নববধুকে বরণ করিয়া লইলেন।

এক দিবস পরে ই, বি, রেলওয়ের প্রাতঃকালের গাড়ীতে রওনা হইয়া ১০॥০ ঘটিকার সময়ে কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেশনে পৌছিলাম। কৃষ্ণগঞ্জ হইতে একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে রওনা হইয়া রাত্রি আনুমানিক ৯ টার সময়ে নলডাঙ্গায় উপস্থিত হইলাম। কোন তারিখে আমরা নলডাঙ্গায় পৌছিব সে সংবাদ পূর্ব্বে না দেওয়াতে অন্দরের ঘাটে নৌকা ছিল না। যাহা হউক অতি অল্প সময়ের মধ্যে একখানি নৌকা ঠিক করিয়া আমরা বাটী পৌছিলাম। বাটীতে পৌছিবামাত্র মাতাঠাকুরাণী আনন্দে

উন্মত্তা প্রায় হইয়া তাঁহার সাধের সামগ্রী নববধুকে ক্রোড়ে করিলেন; তাঁহার যে কত আনন্দ তাহা আর কি বলিব—তাঁহার হারানিধি যেন পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন। সেই মুহূর্ত্তে পাড়া প্রতিবাসিনীগণ আগমন করিয়া বরনাদি কার্য্য সম্পন্নান্তে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার মহা আনন্দে সম্পন্ন করাইলেন। নব বধুর সহিত একজন পরিচারিকা জামালপুর হইতে আসিয়াছিল, তাহার আধা-বাঙ্গলা আধা-হিন্দী ভাষায় কথা শুনিয়া প্রতিবাসিনীগণ হাসিয়া ব্যাকুল হইলেন। পাড়া প্রতিব্যাসিগণ পর দিবস নববধু দেখিয়া যাহার যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গমন করিলেন।

এক মাস পরে শ্বশুর মহাশয়ের যৎপরোনাস্তি অনুরোধে আমি নববধু ও পরিচারিকা সমভিব্যাহারে অশ্ব শকটে যশোহর যাত্রা করিলাম। এই সময়ে যশোহরে গাড়ী খুলিয়াছে। নুতন লাইন নুতন বন্দোবস্ত সুতরাং গাড়িখানি বড়ই ঢিমা গতিতে যাইতে লাগিল। যাহা হউক অতি কষ্টে, কায়ক্লেশে আমাদিগকে টানিয়া লইয়া ঠিক উষা কালে কলিকাতায় উপস্থিত হইল। আমরা শিয়ালদহ হইতে সরাসরি অশ্বশকটে ৬৷৷৹ ঘটিকায় হাওড়ায় পৌছিলাম। তথায় যাইয়া দেখি ইংরেজ সৈনিকে ষ্টেশন-প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ। যাহা হউক অতি কষ্টে জামালপুরে তারে সংবাদ প্রেরণ করিয়া প্রাতে লুপ্‌রাত্রি গাড়ীতে রওনা হইলাম। এই গাড়ীতে দুর দেশে যাইতে হইলে বড়ই কষ্ট অনুভব হয়। কলিকাতায় থাকা অসুবিধা হওয়ায় আমরা বাধ্য হইয়া এই গাড়ীতেই রওনা হইলাম। ইহাতে আমাদের যথেষ্ট কষ্ট হইয়াছিল সত্য, কিন্তু আমার একটী মনোভিলাষ পূর্ণ হইল, কারণ যখন বিবাহ করিতে জামালপুর যাই তখন রাত্র থাকায় পথিমধ্যস্থিত স্থানগুলি দেখা ঘটে নাই। এখন দিবালোকে সকল স্থানগুলি দেখিয়া যাইতে পারিব। এই গাড়ীখানিও মন্থর গতিতে চলিল কিন্তু যশোহর লাইনের গাড়ীর

গতি অপেক্ষা দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে পেট পূজা দিয়া নবশক্তি সঞ্চয় করিয়া লইলাম। বেলা ২।৩ টার সময়ে প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের বিশেষতঃ বালিকা বধূর বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। তিন পাহাড় ষ্টেশনটী পাহাড়ের গাত্র-সংলগ্ন-দৃশ্য অতি চমৎকার দেখিলাম। অনেক কষ্টভোগ করিয়া রাত্রি ১১ ঘটিকার সময়ে জামালপুরে পৌছিলাম। ষ্টেশনে পালকী উপস্থিত ছিল তাহাতে নববধূ এবং খুল্লতাত শ্বশুর মহাশয়দিগের সহিত আমি যথা সময়ে শ্বশুর বাটী পৌছিলাম। তথায় ৩।৪ দিবস অতিবাহিত করিয়া কর্ড লাইন দিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। গাড়ীখানি পথিমধ্যে বিলম্ব হওয়ায় লক্ষ্মীসরাই ষ্টেশনে পৌঁছিবার পুর্ব্বেই পশ্চিমের যাত্রী-গাড়ী উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, অজানিত ষ্টেশনে পৌঁছিয়া এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া আকুল হইলাম। ষ্টেশনের একটী বাবুর নিকট অবগত হইলাম—গভীর রাত্রে আর একখানি গাড়ী আসিবে। কি ভাবে অপরিচিত স্থানে এত দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিব এইরূপ চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে একখানি গাড়ীর—ঘণ্টা হইল। জানিতে পারিলাম পশ্চিম হইতে ডাকগাড়ী আসিতেছে। কিছুই স্থির করিতে না করিতে গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল; আমিও হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক এই গাড়ীতেই যাওয়া স্থির করিয়া মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলাম; এই গাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী থাকে না কিন্তু আমার নিকট তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট আছে। আমি এই ভরসায় উঠিলাম যে কলিকাতায় পৌছিয়া অতিরিক্ত ভাড়া দিলেই নিষ্কৃতি পাইব। কিন্তু তাহা হইলেও গার্ড সাহেবকে জানাইয়া উঠা আমার উচিত ছিল। যাহা হউক মধ্যম শ্রেণীর ২টী বাঙ্গালী ভদ্রলোক কলিকাতা যাইতেছিলেন আমি সকল বিষয় বিবৃত করিলে তাঁহারা আমাকে ভরসা দিয়া কহিলেন, কলিকাতায় যাইয়া আমরা সাক্ষ্য দিব 'যে আপনি লক্ষ্মীসরাই হইতে মধ্যম

শ্রেণীতে উঠিয়াছেন। ইহাতে খুব সম্ভব অতিরিক্ত ভাড়াটি দিলেই চলিবে।

অতি প্রত্যুষে আমরা হাওড়ায় পৌছিলাম এবং বক্রি ভাড়ার টাকা দিয়াই নিষ্কৃতি পাইলাম। আমি শিয়ালদহের হিন্দু-আশ্রমে দুই দিন অবস্থিতি করিয়া নলডাঙ্গায় গমন করিলাম। কিছু দিবস নলডাঙ্গায় থাকিয়া চাকুরীর চেষ্টায় পুনরায় কলিকাতায় আসিলাম। এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের চাকুরী প্রার্থনা করি, কিন্তু ২৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়ঃক্রম হওয়ায় তাহা হইল না। ক্যাম্বেল স্কুলের অধ্যক্ষ ডাক্তার সাহেব মহাশয়ের নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হওয়ায় তিনি দয়া করিয়া কলিকাতার কিং হ্যামিংটন্ কোম্পানীর প্রধান সাহেবের নামে আমার নিকট একখানি পত্র দিলেন। আমি উক্ত সাহেবকে পত্র প্রদান করিলে, তাহাদের জলপাইগুড়ি জেলার অধীনে হিমালয় পর্ব্বতের তলদেশে কালাগতি নামক একটি চা বাগানে ৪০৲ বেতনে আমাকে নিযুক্ত করিলেন। আমি তথায় যাইবার জন্য ২।৩ দিবসের মধ্যেই প্রস্তুত হইলাম। যাইবার নির্দ্ধারিত দিবসে দার্জ্জিলিং ডাক গাড়ীতে ২-২৫ মিনিটের সময় শিয়ালদহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে দামুকদিয়া ষ্টেশনে উপনীত হইয়া, তথা হইতে ষ্টীমারে পার হইয়া রাত্র ৮ ঘটিকার সময়ে সাঁতা পৌছিলাম। ষ্টেশনে যাইয়া দেখি, ভয়ানক গোলযোগ, ভারতবর্ষে এইরূপ কিম্ভূতকিমাকার বন্দোবস্তের ষ্টেশন দেখিতে পাওয়া যায় না; কারণ প্রতি গাড়ীর শীর্ষদেশে বিভিন্ন বিভিন্ন লাইনে যাইবার সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে; অর্থাৎ এই স্থান হইতে "আসাম" "দিনাজপুর-পূর্ণিয়া" ও "দার্জ্জিলিং-শিলিগুড়ি" এই তিনখানি ট্রেণকে এক ইঞ্জিনে লইয়া রওনা হয়। গভীর রাত্রে যখন সকল যাত্রীগণ নিদ্রায় অভিভূত থাকে, তখন প্রথমোক্ত দুইখানি ট্রেণকে তাদের বদলী যায়গায় যথাক্রমে কাটিয়া রাখিয়া

শেষোক্ত "দার্জ্জিলিং-শিলিগুড়ি'র ট্রেণখানিকে লইয়া সরাসরি উত্তরাভিমুখে চলিয়া যায়। যদি কেহ ভুলবশতঃ দিনাজপুরের গাড়ীতে না উঠিয়া অন্য কোন গাড়ীতে উঠেন, তবেই তাহাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। এইরূপ কত লোকের কত কষ্ট হইয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহা হউক, আমি যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী জানি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ট্রেণের মধ্যম শ্রেণী দেখিয়া লইলাম। গাড়ীগুলির গঠন মধ্যম প্রকারের, গাড়ীর মধ্যে পাইখানার বন্দোবস্ত আছে। পার্ব্বতীপুরে রাত্রি ১টার সময়ে পৌছিলে, অন্যান্য লাইনের যাত্রীতে আমাদের গাড়ীখানি বোঝাই হইয়া গেল। মধ্যম শ্রেণীর ১ খানা গাড়ী, তাহাতে এত লোক হইল যে, তজ্জন্য আমাদের কষ্টভোগ করিতে হইল। সমস্ত রাত্রি চলিয়া অতি প্রত্যূষে হলদিবাড়ী ষ্টেশনে গাড়ী লাগিলে তথায় হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া লইলাম। তথা হইতে হিমালয় পর্ব্বতের ধবলগিরি শৃঙ্গ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এই দৃশ্যে বড়ই আনন্দিত হইলাম। বেলা ৯৷৷০ ঘটিকার সময়ে আমরা নির্দ্ধারিত শিলিগুড়ি ষ্টেশনে পৌছিলাম। এই ষ্টেশনটী সজ্জিত এবং প্রথম শ্রেণীর ষ্টেশন। প্লাটফরমের উপরিভাগে লোহার ছাদ; এই ষ্টেশনের একপার্শ্বে দার্জ্জিলিং-হিমালিয় রেলওয়ের অতি ক্ষুদ্র আকারের গাড়ীগুলি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এত ছোট রকমের গাড়ী পূর্ব্বে কখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এখান হইতে উত্তরাভিমুখে প্রথম ষ্টেশন সুকনা পর্য্যন্ত সমতল ভুমি থাকায় দ্রুতগামী চলে, কিন্তু তাহার পরেই সম্মুখ ও পশ্চাতে ইঞ্জিন লাগাইয়া মন্থরগতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া পর্ব্বতের উপরিভাগে উঠিতে থাকে; সে এক চমৎকার দৃশ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং ৪৮ মাইল কিন্তু ট্রেণখানি ৬ ঘণ্টার কমে পৌছিতে পারে না। স্থানে স্থানে এত মন্থরগতিতে চলে যে যাত্রীগণ অনায়াসে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে এবং উঠিতে সক্ষম হয়।

শিলিগুড়িতে অবতরণ করিয়া বাজারের দিকে যাইতে দেখি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ীগুলিকে লইয়া ক্ষুদ্র ইঞ্জিন দার্জ্জিলিং অভিমুখে ছুটিয়াছে। শিলিগুড়ি বাজারে ঢাকা জেলার জনৈক ভদ্রলোকের বাসায় উপস্থিত হইলাম। আমি অপরিচিত হইলেও তিনি বিশেষভাবে আমাকে যত্ন করিলেন। আমি তাঁহার বাসাতে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আহারান্তে একখানি গো-শকটে বাগান অভিমুখে অর্থাৎ আমার গন্তব্য স্থানে রওনা হইলাম। তথা হইতে ৯ ক্রোশ উত্তরে যাইতে হইবে শুনিয়া অবাক্ হইলাম। কারণ কলিকাতার আফিসের সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন; শিলিগুড়ি হইতে ২।৩ ক্রোশের মধ্যেই বাগান। এখন বুঝিতেছি, সাহেব মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। শিলিগুড়ি হইতে ৪ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া অতি কষ্টে রাত্রি ৭॥০ ঘটিকার সময়ে তিস্তা নদীর কুলে উপস্থিত হইলাম। নদীর খরতর স্রোত দেখিয়া মনে বড়ই ভয়ের সঞ্চার হইল—কি উপায়ে ভয়ানক দুস্তর নদী পার হইব। যাহা হউক, গাড়ীসহ জোড়া নৌকায় বিনা ক্লেশে নদী পার হইলাম। নদীর কুল হইতে গাড়ীখানি অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আমার গন্তব্য স্থান কালাগতি বাগানে সাহেবের বাঙ্গালায় উপস্থিত হইল। ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এজেণ্ট সাহেব-প্রদত্ত পত্রখানি প্রদান করিলে তিনি আমাকে পূর্ব্বের ডাক্তার-বাবুর বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। ম্যানেজার সাহেবের নাম ফ্লেমিং,—তিনি সপরিবারে তথায় ছিলেন। ইনি আমার সহিত প্রথমে ভালরূপ ব্যবহার করিলেন, কিন্তু ১ মাস পরে বিষবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং আমিও তাঁহার সহিত ব্যবহারোপযোগী ব্যবহার করিতে লাগিলাম। বাগানের বড় বাবু শ্রীযুক্ত জহরলাল সিংহের সহিত প্রথম হইতেই মাখামাখি আলাপ হইল। তিনি প্রথমে ১০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতিকরতঃ এখন বেতন ৪০৲ টাকা পাইতেছিলেন।

তাঁহার জনৈক আত্মীয় তাঁহার অধীনে মুন্সী ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা করিয়া ইংরেজের অধীনে কার্য্য করিয়াও নিজের দেশীয় রীতি-নীতি পূর্ব্ববৎই বজায় রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বের ডাক্তার বাবু যে বাসায় থাকিতেন তাহা একটী টিলার উপরে অবস্থিত—নিম্নে বাগানের দৃশ্য অতি সুন্দর। একখানি দোচালা ঘর, তাহাতে পাক হয় আর চারিদিকে বেড়া দিয়া ঘেরা একটী ক্ষুদ্র বাঙ্গালা তাহাতে ২টী কামরা আছে। এই বাসার অতি নিকটে জহর বাবুর বাসা, তিনি খুব ভদ্রলোক; কোম্পানীর দৈনিক কার্য্যান্তে আমরা উভয়ে একত্রে থাকিতাম। সাহেবের পাকা বাঙ্গালা এবং চা ঘর আমাদের বাসার বেশী দূর নহে। প্রতি বৎসর ২ হাজার মণ চা এই বাগান হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দত্ত নামক একজন ঠিকাদার এই বাগানে বাস করিতেন। বাগানের চতুঃপার্শ্বে কোম্পানীর অনেক চা বাগান—প্রতি বাগানেই নেপালি কুলির সংখ্যা অধিক এতদ্ভিন্ন ছোট নাগপুরের কুলিও যথেষ্ট ছিল। নেপালি পুরুষেরা আঁটা পায়জামা ও মেরজাই ব্যবহার করে এবং স্ত্রীলোকেরা ঘাগ্‌ড়ার ন্যায় কাপড় পরিধান করে—গায়ে জামা, কটীদেশে লাল বর্ণের রুমাল, বেণীতে কৃত্রিম ফুল ব্যবহার করিয়া থাকে। অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ গৌর বর্ণ কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের নাক থাঁদা। ইহাদিগের সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা বিদ্যমান। স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে বিবাহিত স্বামী পরিত্যাগ করিতে পারে, তবে বিবাহের খরচ যৎ-সামান্য দিলেই সকল গোল মিটিয়া যায়, কিন্তু যদি পুত্র সন্তান থাকে, তবে তাহা পূর্ব্ব স্বামীর প্রাপ্য মাত্র। এই আইনের আদেশ ইংরেজ রাজ্যে প্রতিপালিত হয় না।

এই বাগানের উত্তরে ওয়াসাবাড়ী, পূর্ব্বে ফুলবাড়ী, পশ্চিমে এলেনবাড়ী। এই সকল বাগানে আমাদিগের দেশীয় অনেক লোক কাজ করিতেন। প্রতি রবিবারে ফুলবাড়ীর হাটে বাগানের বাবুগণ সমবেত হইতেন। ফুলবাড়ীর পোষ্ট মাষ্টার বাবু হরিদাস মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের সহিত অতি অল্প দিনের মধ্যেই সৌহৃদ্যতা হইয়াছিল। ফুলবাড়ী বাগানের মতিলাল রায় এবং নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় বহুদিন পর্য্যন্ত তথায় কার্য্য করিতেছিলেন; তাঁহাদিগের সহিতও বিশেষরূপ আলাপ পরিচয় হইল। প্রথম হাট দেখিতে যাইবার দিন যশোহর জেলা নিবাসী বাবু শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাগ্রাকোর্ট বাগানের প্রধান কেরাণী এবং পূর্ণচন্দ্র মল্লিক সহকারী কেরাণীর সহিত ভালরূপ আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা আমার মাতুল মহাশয়ের দেশীয় লোক; মধ্যে মধ্যে আমাদের পরস্পরের বাসায় নিমন্ত্রণ হইত। কয়েক মাস পরেই জামালপুর হইতে পরিবার লইয়া যাই। আমার স্ত্রীকে যিনি বাল্যকালে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তিনিও সঙ্গে গিয়াছিলেন। ঐ সময়ে আমার পত্নীর বয়ঃক্রম ১১ বৎসর মাত্র। এদিকে আমার মাতাঠাকুরাণী মাতুল মহাশয়সহ কালাগতি আসেন। মাতুল মহাশয় কয়েক দিন পরেই মাতাঠাকুরাণীকে রাখিয়া নলডাঙ্গায় প্রত্যাগমন করিলেন। কয়েক মাস মাতাঠাকুরাণী তথায় অবস্থিতি করিয়া নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করতঃ নলডাঙ্গায় প্রত্যাগমন করিলেন। জহর বাবুর স্ত্রী অনেক সময়েই আমার স্ত্রীর সহিত একত্রে থাকিতেন। এদিকে সাহেবের সহিত আমার গোলযোগ হইতে লাগিল। কলিকাতার সাহেব আমাকে এই ভাবে নিয়োগ-পত্র দিয়াছিলেন এবং মৌখিক বলিয়াছিলেন যে,—"এক মাসের মধ্যে তোমার কার্য্যের উন্নতি দেখাইতে পারিলে ৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে।" এক মাসান্তে ম্যানেজার সাহেবকে বলায় এবং আবেদন করায় পাগল সাহেব তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে কার্য্য ত্যাগ করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে নিরস্ত হইলাম।

আমি প্রতিদিনই জুতা পায়ে দিয়া ম্যানেজার সাহেবের বাঙ্গালায় যাইতাম; তাহাতে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। সাহেব

আমাকে জুতা খুলিয়া তাঁহার বাঙ্গালায় যাইতে বহুবার তাঁহার লোক দ্বারা জানাইয়াছিলেন কিন্তু তাহা আমি গ্রাহ্য করি নাই; এই কারণে এজেণ্ট সাহেব এখানে আসিলে আমার বিরুদ্ধে উক্ত সাহেব নানারূপ দোষারোপ করায় আমার চাকুরী যায়। সাহেবের সহিত প্রথম হইতেই নানারূপ মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, এমন কি ঐ চাকুরী পরিত্যাগ করিতে আমিও বারম্বার চেষ্টিত হইয়াছিলাম কিন্তু জহর বাবুর অনুরোধে এতদিন ছাড়িতে পারি নাই। যাহা হউক, জহর বাবুকে কাঁদাইয়া আমরা যথা সময়ে নলডাঙ্গায় পৌঁছিলাম।

আমরা বাটী আসিয়া জানিতে পারিলাম, মাতুল মহাশয়ের অধিকাংশ বিষয়-সম্পত্তি দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; এমন কি ভদ্রাসন পর্য্যন্তও নিলাম হইয়া যায়-যায়। ডিগ্রীদার অতি অল্প মূল্যে খরিদ করিয়াছিলেন। আমি নলডাঙ্গায় যাইয়া মাতুল মহাশয়ের বহির্ব্বাটীর কিয়দংশ ডিগ্রীদারের নিকট হইতে ৩৬০৲ টাকা মূল্যে খরিদ করি এবং তাহার ভগ্ন-সংস্কার করতঃ বাসোপযোগী করিয়া সপরিবারে কিছু দিবস তথায় বাস করি। এই বাটী বাসোপযোগী হওয়ায় মাতুল মহাশয়, মামিমাতা, মাতুল-পুত্র ও কন্যা সকলেই উহাতে বাস করিতে লাগিলেন।

এক বৎসরান্তে আমার খুল্লতাত শ্বশুর মহাশয় নলডাঙ্গায় আসিয়া আমার স্ত্রীকে জামালপুরে লইয়া যান। ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে পরিচারিকাকে জামালপুরে পাঠান হইয়াছিল। আমার স্ত্রী জামালপুর যাইবার দুই মাস পরে কলিকাতায় পুনরায় চাকুরীর চেষ্টায় গমন করিলাম। এই সময়ে নলডাঙ্গার তিন আনার রাজা সৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব রায় মহাশয় সপরিবারে ঝামাপুকুরে বাস করিতেছিলেন; তাঁহার বিশেষ অনুরোধে তাঁহার বাসায় থাকিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কলিকাতার প্রধান পাখোয়াজ বাদ্যকর পেন্‌সন্ প্রাপ্ত বাবু মুরারীধর

সেন মহাশয়ের নিকট তিনি বাদ্য শিক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে ক্যাম্বেল স্কুলের অধ্যক্ষ ডাক্তার সাহেবের নিকট চাকুরীর আবেদন করায় আমাকে ৪ মাসের জন্য কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে একটী চাকুরী দিতে রাজী হইলেন, কিন্তু অস্থায়ী কার্য্য বলিয়া তাহা গ্রহণ করিলাম না। পুনরায় উক্ত ডাক্তার সাহেব বর্ম্মাতে ৮০৲ টাকা বেতনে একটি কার্য্য করিয়া দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু এত দূরদেশে যাইতে স্বীকৃত হইলাম না। এই ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে একখানি সুপারিশ-পত্র ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সেক্রেটারী সাহেবের নিকট লইয়া যাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় চাকুরী খালি না থাকায় কার্য্য হইল না। একদিন হেয়ার ষ্ট্রীটে বেড়াইতেছি, পথিমধ্যে হঠাৎ একটি অপরিচিত ডাক্তার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল; পরিচয়ে জ্ঞাত হইলাম, ইনি এলাহাবাদে ই, আই, রেলওয়েতে ডাক্তার গ্রিফিথ্ সাহেবের অধীনে কার্য্য করিতেন, সম্প্রতি কার্য্য ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন এবং এ পর্য্যন্ত ঐ পদ শূন্য আছে। তিনি আমাকে কহিলেন—"যদি তথায় কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয়েন, অবিলম্বে উক্ত ডাক্তার সাহেবকে আবেদন করুন"। আমার প্রশংসা-পত্রের অনুলিপিসহ তথায় কর্ম্ম প্রার্থীত হইয়া দরখাস্ত করিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার এই উত্তর পাই যে—"একজন ডাক্তার আসিবার সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, উপস্থিত কার্য্য খালি নাই; তোমার প্রশংসা-পত্রগুলি ভাল, আমি তাহা ফেরত পাঠাইলাম।"

শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন মাহেশ্বর ডিস্‌পেন্সারীর জন্য একটী পদ শূন্য আছে সংবাদ পাইয়াই তথায় আবেদন করিলাম এবং শ্রীরামপুরের সুবিখ্যাত এসিষ্ট্যাণ্ট সারজন ও চেয়ারম্যান কেদার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রশংসা পত্রগুলি দেখাইলাম পরিশেষে আমাকে মনোনিত করিয়া নিয়োগ পত্র দিয়াছিলেন

কিন্তু ঐ কার্য্যের বেতন অতি সামান্য মাত্র ২৫৲ বলিয়া গ্রহণ করিলাম না।

কিছুদিন পরে হেয়ার ষ্ট্রীটের একটী চা-করের এজেন্ট অফিসে ৬০৲ টাকা বেতনে ১ বৎসরের এগ্রিমেণ্টে একটি চাকুরী ঠিক হইয়াছিল; এমন কি ২।৪ দিবসের মধ্যে সেখানে যাইবার জন্য বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখি, একখানি পত্র আসিয়াছে। পত্রখানি খুলিয়া দেখিলাম, বাগ্রাকোর্ট চা কোম্পানীর বড় বাবু শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের বাগানে আমার জন্য একটী ডাক্তারি চাকুরী ঠিক করিয়া পত্র লিখিয়াছেন—"পত্র-পাঠ চলিয়া আসিবে, তোমার এই বাগানে কার্য্য হইবার অধিক সম্ভাবনা।" পত্র পাঠ করিয়া আমি ঐ দিবসের অপরাহ্নে দার্জ্জিলিং ডাক গাড়ীতে বাগ্রাকোর্টাভিমুখে যাত্রা করিলাম। পরদিন অপরাহ্নে পদব্রজে শিলিগুড়ি হইতে বাগ্রাকোর্টে পৌঁছিলাম। তৃতীয় দিবস প্রাতে বাগানের বড় সাহেব ডবলিউ এম্ নর্থ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার সমস্ত প্রশংসা-পত্রাদি দেখিয়া ৪৫৲ টাকা বেতনে ১৮৮৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত-পত্র প্রদান করিলেন। নভেম্বর মাসে নিয়োগ-পত্র প্রদান করেন সুতরাং কার্য্যে বসিবার অনেক বিলম্ব দেখিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করি এবং তথা হইতে আবশ্যকীয় জিনিষপত্র খরিদ করিয়া ২৬শে ডিসেম্বর বাগ্রাকোর্টে পুনঃ উপস্থিত হই। বাগ্রাকোর্টের প্রধান কেরাণীবাবু শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং ঝিনাইদহের অন্তঃর্গত রামনগর নিবাসী বাবু চন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় সহকারী-রূপে কার্য্য করিতেছিলেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া ১লা জানুয়ারী হইতে কোম্পানীর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। ম্যানেজার বা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবটি বড়ই নম্র প্রকৃতির। কুলির প্রতি এ বাগানে কোনরূপ অত্যাচার ছিল না।

ডবলিউ এম্ নর্থ সাহেবের পিতা বহু পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং সহরে কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া তথায় একটী ভুটানীর সহিত তাঁহার প্রণয় হয়। উক্ত ভুটানীর গর্ভে এই সাহেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা সময়ে ইঁহার পিতা ইঁহাকে তথাকার ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। তাহার কিছু দিবস পরে এই সাহেবের পিতা স্বদেশে গমন করেন। শুনিতে পাই, ইঁহার পিতা অদ্যাপি বিলাতে জীবিত আছেন। বিলাত যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে দার্জ্জিলিংয়ের একজন পাদ্রি সাহেবের হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া যান। বিদ্যালয়ে কথঞ্চিৎ পাঠ করিয়া অতি অল্প বয়সে পাদ্রি সাহেবের উদ্যোগে উহার নিকটবর্ত্তী কোন চা বাগানে ৫০৲ টাকা বেতনে কার্য্যকরতঃ নিজ কার্য্য-দক্ষতা দেখাইয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিতে থাকেন। পরিশেষে ইনি এই কোম্পানীর এজেণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক ৪০০৲ টাকা বেতনে এই বাগানে নিযুক্ত হয়েন। ইনি অতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া এমন কি অনেক সময়ে কুলিদিগের কুটিরে আহার করিয়া—নানা উৎপাত সহ্য করিয়া—এই প্রকাণ্ড বাগান নিজ হস্তে প্রস্তুত করেন। ইঁহার দক্ষতা দৃষ্টে এজেণ্ট সাহেবেরা ইঁহাকে আরও ২০।২৫টি বাগান প্রস্তুত করিবার ভার দেন। ইনি স্বনামবস্তু-রূপে অনেকগুলি বাগান প্রস্তুত করিয়া এই বাগানের ম্যানেজার এবং এই কোম্পানীর আরও কয়েকটি বাগানের পরিদর্শকের কার্য্য করেন। ইঁহার মাসিক আয় ১৫০০৲ টাকা এবং প্রতি বাগানে যথেষ্ট পরিমাণে অংশ আছে। ইঁনি বড়ই দয়ালু কিন্তু ভয়ানক কৃপণ বলিয়া এ দেশে প্রকাশ। ইঁনি যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন এবং সঞ্চয় করিয়া বিলাতের একজন ধনবানের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বাগানের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতের ছোট ছোট শৃঙ্গ তন্মধ্যে বিগুন নামক একটি পাহাড়ের শৃঙ্গের উপরিভাগে ইহার একটী প্রকাণ্ড বাঙ্গালা; অনেক সময়ে তথায় যাইয়া বিশ্রাম লাভ করেন। পূর্ব্বে যে কষ্ট পাইয়াছিলেন তাহার

ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তথায় নিভৃত ঐ প্রকাণ্ড সুসজ্জিত বাঙ্গালায় বাস করিয়া এবং তথা হইতে প্রকৃতির শোভা সদর্শন করিয়া পূর্ব্বের দুঃখময় জীবন ভুলিয়া হৃদয় শীতল করিয়া থাকেন। এই বাঙ্গালাটী বাগান হইতে এক ক্রোশ দুরে অবস্থিত। যখন সাহেব তথায় অবস্থিতি করেন, তখন দুরবিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বাগানের কার্য্য তথা হইতে দৃষ্টিগোচর করেন। এই সাহেবটি বাঙ্গালা, হিন্দি, নেপালি, ভুটিয়া, ল্যাপচা এবং কোল ভাষায় বেশ কথা কহিতে পারিতেন। আমি প্রায় ৪ বৎসর তাঁহার বাগানে কার্য্য করিয়াছি, কখন কাহাকেও একটি কু-ভাষায় গালি দিতে শ্রবণ করি নাই। বাগানে সর্ব্ব মোট প্রায় ২০০ কুলি ছিল। বাগানের কার্য্য পরিদর্শন জন্য দুইজন ভুটে মুন্সী ছিল। প্রতি বৎসর ৫,০০০ হাজার মণ চা এই বাগান হইতে কলিকাতায় পাঠান হইত। চা ঘর সুবৃহৎ; অনেক প্রকারের কল ছিল এবং তাড়িত আলোকের ব্যবস্থা ছিল। অন্যান্য বাগানের এবং এই বাগানের সমস্ত সাহেবদিগকে নিযুক্ত এবং জবাব দিবার অসীম ক্ষমতা এজেণ্ট সাহেব ইহাকে দিয়াছিলেন। আমিই এই সুবৃহৎ বাগানের প্রথম ডাক্তার নিযুক্ত হই এবং চা ঘরের অন্তর্গত একটি কামরা ঔষধালয়ের জন্য পাইলাম। চা বাগানের নিয়মানুসারে প্রতিদিন আমাকে কুলি লাইনে একজন ঔষধি-বাহক সঙ্গে লইয়া রোগী দেখিতে যাইতে হইত। বর্ষাকালে এই বাগানের নেপালি ও ছোটনাগপুরের কুলিগণ তাহাদিগের কুটিরের সম্মুখস্থ জমিতে মকাই রোপন করিত, তাহা বৃদ্ধি পাইয়া জঙ্গলে পরিণত হইত। আমাকে ঐ জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রতিদিন যাতায়াত করিতে হইত। ঐ মকাই বৃক্ষে ভয়ানক জোঁক বেড়াইত, এত সাবধান হইয়া যাওয়া সত্বেও অলক্ষিত ভাবে জোঁকগণ আমার পোষাকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শরীরের রক্ত শোষণ করিত। কালাগতি বাগানে কাজ করিবার সময় যে সকল বন্ধুবান্ধব পাইয়াছিলাম, কেবল জহর বাবু

ব্যতিত (কারণ তিনি ইহার কিছু দিবস পূর্ব্বে দেশে যাইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন) অন্যান্য সকলকেই পাইয়াছিলাম। প্রতি রবিবারে সমস্ত সঙ্গীগণ একত্রিত হইয়া ফুলবাড়ী হাটস্থিত পোষ্টাফিসে কিংবা বাগ্রাকোর্টের পশ্চিমাংশে চুনভাটীতে গোকুল বাবুর ফরেষ্ট রেঞ্জারের বাঙ্গালায় যাইয়া বেড়াইয়া আসিতাম। রবিবারে চা বাগানের সাহেবেরা বাবুদিগকে একটু দয়া করিয়া বিদায় দিয়া থাকেন তজ্জন্য সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইত। গোকুলবাবু সপরিবারে তথায় বাস করিতেন তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে আমার দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার তথায় হইতে। কারণ তাঁহার সহিত আমার ভালবাসার পরিমাণ একটু অধিক মাত্রায় ছিল। এই বাগ্রাকোর্ট ইংরেজ রাজ্যের বাঙ্গালা প্রদেশের সমতল ভূভাগের উত্তর সীমানা কারণ ইহার উত্তরেই হিমালয় পর্ব্বত আরম্ভ হইয়াছে; এই বাগানের উত্তরাংশ দার্জ্জিলিং এবং দক্ষিণাংশ জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত। বাগ্রাকোর্টের পশ্চিম সীমায় খরতর লীষ নদ। এই বাগানে প্রায় ৪ বৎসর কার্য্য করিয়াছি তন্মধ্যে ২ বার হাপচার স্কন্ধ হইতে ঐ নদের জলে পতিত হইয়া অনেক কষ্টে জীবন লাভ করিয়াছি। হাঁটুর একটু উপরে জল উঠিলে আর পার হইবার উপায় ছিল না কারণ স্রোতের বেগে পাথরের উপর আঘাত লাগিয়া প্রাণনাশ হইবার অধিক সম্ভাবনা।

বাগ্রাকোর্টে কার্য্য করিবার ৩।৪ মাস পরে ৮ দিবসের বিদায় লইয়া জামালপুর হইতে পত্নীকে তথায় আনয়ন করি। বাসাবাটী ভাল ছিল না তজ্জন্য কিছুদিন কষ্টে কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল। এই বাগানের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এ্যাণ্ডারসন্ বিসূচিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। চা সম্প্রদায়ের ইংরেজ ডাক্তার হকিন্স ও আমি উভয়ে মিলিত হইয়া তাঁহার চিকিৎসা করি কিন্তু মৃত্যুর ঔষধি নাই। ফুলবাড়ী বাগানের ম্যানেজার মিষ্টার ভিক্টর ডি, সেভি'র

সহিত আমাদের ম্যানেজার নর্থ সাহেবের বড়ই সৌহৃদ্যতা ছিল। উক্ত বাগানের একজন সহকারি সাহেব সুরাপানে অত্যন্ত অভ্যস্ত ছিলেন; একদিন সুরা না পাইয়া ডাক্তারখানায় যাইয়া অধিক পরিমাণে অহিফেণের আরোক সেবন করিয়া বিষে জর্জ্জরিত হয়েন। আমাদের বড় সাহেব এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার চিকিৎসার জন্য আমাকে লইয়া যান। উক্ত সাহেবের প্রস্রাব বন্ধ হইয়াছিল এবং বিষ-লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়াছিল। শলা দ্বারা প্রস্রাব করাইয়া এবং বিষনাশার্থ অন্যান্য ঔষধি ও প্রক্রিয়া দ্বারা উক্ত সাহেবকে প্রকৃতিস্থ করিয়া নিজ বাগানে প্রত্যাগমন করি। আর এক সময়ে পূর্ব্ব লিখিত বাগানের একটি নেপালি কুলি কল-ঘরে অসতর্কভাবে কার্য্য করার ফলে তাহার একখানি হস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বাহু হইতে হস্ত পৃথক হইয়া পড়ে; যদিও তথায় একজন যুবক ডাক্তার ছিলেম তথাপি তিনি অঙ্গচ্ছেদ করিতে অসম্মত এবং অপারগ হওয়ায় আমাকে সেন্তি সাহেব আহ্বান করেন। আমি বড় সাহেবের গাড়ীতে তথায় উপস্থিত হইয়া আঘাতিত লোকটিকে মুমূর্ষ অবস্থায় দেখিতে পাই। ইহার পূর্ব্বে আমি কখন অঙ্গচ্ছেদ করি নাই কিন্তু সাহসে নির্ভর করিয়া চিনা-মিস্ত্রীদিগের নিকট হইতে কাষ্ঠ কর্ত্তনের করাত দ্বারা তাহার অঙ্গচ্ছেদ করি এবং অল্পদিবসের মধ্যে সেই লোকটী আরোগ্য লাভ করে। সকলই ভগবানে কৃপা।

প্রতি পূজার সময়ে ৩ সপ্তাহের বিদায় পাইতাম সুতরাং প্রতি বৎসর দেশে আসিয়া পূজা দেখিতাম। আমি যে বৎসর এই বাগানে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহার পর বৎসর এই বাগানে ভয়ানক বিষুচিকা ব্যাধির প্রকোপ হয়; প্রতিদিন ২০।২২ জন এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইত এবং ১৫।১৬ জন প্রতিদিনে কালগ্রাসে নিপতিত হইত। এই সময়ে আমাকে দিবারাত্র এই রোগের চিকিৎসার জন্য পরিশ্রম করিতে হইত নেপালি এবং ছোটনাগপুরের কুলিদিগের মধ্যে কাহারও ব্যাধি হইলে

তাহাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিত। পরিত্যাক্ত রোগীর মধ্যে কেহ কেহ আরোগ্য হইয়া উঠিয়া পুনরায় তাহার আত্মীয় স্বজনের সহিত মিলিত হইত। কোন আত্মীয় স্বজনের কোন অসুখ হইলে তাহার পরিবার মধ্যে কোথায় সকলে তাহাকে সেবা শুশ্রূষা করিবে, তাহা না করিয়া আপন আপন জীবনের মায়াতে সবাই ব্যতিব্যস্ত। ইহা যে নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখা যায়, তাহা নহে; আমি সভ্য শ্রেণীর মধ্যেও এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। আমরা সভ্যজাতি বলিয়া আবার কি না পরিচয় দিয়া থাকি! আমাদিগের সভ্যতায়, বিদ্যা অভিমানে এবং ধর্ম্মহীন সমাজে কালের কুটীল গতিতে এই উদাহরণের আর সীমা নাই। এই বাগানে এই ভীষণ ব্যাধিতে প্রায় ৪০০ শত লোকের জীবন সেই বৎসর নষ্ট হয়।

এ দেশে আমাদিগের দেশীয় যাত্রার দল কখনও যায় নাই সুতরাং এ দেশীয় প্রতিবাসীগণ ইহার অর্থ কিছুই বুঝিত না। আমার বাগ্রাকোটে অবস্থান কালীন জলপাইগুড়ি হইতে একদল যাত্রাপার্টি ফুলবাড়ীর বাজারে গিয়া উপস্থিত হয়। আমরা সকল বাগানের বাবুগণ চাঁদা তুলিয়া ঐ যাত্রা দেওয়াই। নেপালি ও ভুটিয়ারা এই সর্ব্ব প্রথম যাত্রা শুনিয়া আহ্লাদিত হয়।

আমার জনৈক সহৃদয় বন্ধু—প্রতাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ওরফে সাহেব মারা চক্রবর্ত্তী আমাদের বাগানের ৩ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে ব্যারণ বাগানে কার্য্য করিতেন। ৺স্বরস্বতী পূজা উপলক্ষে প্রতাপ দাদা আমাদিগের বাগানের প্রত্যেক বাবুকে ঐ বৎসর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমরা অশ্বারোহণে ডামডিমের হাটের মধ্য দিয়া ব্যারণ গমন করি। তথায় যাইয়া দেখিলাম, অনেক বাগান হইতে অনেক বাবুর সমাগম হইয়াছে। মদ্য ও মাংসের ছড়াছড়ি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম কারণ কোথায়

বিদ্বানগণ সমবেত হইয়া বীনাপাণির মহাপূজায় নিরামিষ ভোগ দিয়া তৎপ্রসাদ সকলে একত্রিত হইয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করতঃ শান্তি-সলিলে ভাসিবে। তাহা না হইয়া কি না ৺মাতার উপাসকগণ মদ্য মাংসের দ্বারা রসনাকে তৃপ্তি করিতেছেন? কাল মাহাত্ম্যে সকলই সম্ভবে। এই অভিসম্পাতে বঙ্গবাসী আজ নামে বিদ্বান কিন্তু কাজে অবিদ্বান হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে ধন উপার্জ্জন করিয়াও স্ত্রী পুত্র লইয়া সুখী হইতে পারিতেছেন না। আমরা এল, এ, বি, এ পাশ করিয়া মহা বিদ্যান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি কিন্তু পাশ্চাত্য বিদ্যাকে যে ব্যক্তি বিদ্যা বলিয়া গৌরব মনে করেন তিনি বিদ্যা উপার্জ্জন করেন নাই; অবিদ্যাকেই হৃদয়ে পোষণ করিয়া আছেন সুতরাং তাহার ফলে আমরা ম্লেচ্ছভাবে তন্ময় হইয়া এমন কি মহা-বৈষ্ণবী স্বরস্বতী দেবীকেও ম্লেচ্ছভাবে ভোগ দিয়া থাকি। ইহাপেক্ষা দেশের অধঃপতন আর কি হইবে জানি না।

প্রতাপ দাদা ব্যতীত অপরাপর বাবুগণ আমাদিগকে সমাদর করিয়া সুরাপান করিতে বারম্বার অনুরোধ করিলেন কিন্তু আমরা সকলেই তাহাতে বঞ্চিত। সন্ধ্যার সময়ে আমরা ব্যারণস্থিত বাগানের কল কারখানা দেখিয়া বাগ্রাকোর্টে প্রত্যাগমন করিলাম। এই সময়ের কয়েক মাস পরে এই বাগানের বড় বাবু শ্রীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দেশে গমন করেন; তাঁহার সহকারী বাবু চন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎপদে বরিত হন এবং তাঁহার নিজ গ্রামস্থিত বাবু কেশবচন্দ্র রায় (আমার পূর্ব্ব পরিচিত) তাঁহার সহকারীরূপে নিযুক্ত হন। এই সময়ে আমাদিগের বড় সাহেব বিলাত গমন করিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বাগ্রাকোর্টে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নর্থ সাহেব পূর্ব্বে সুরা স্পর্শ করিতেন না কিন্তু বিবাহের ২।১ বৎসর পূর্ব্ব হইতে সঙ্গীদোষে সুরাতে ভয়ানক আসক্ত হয়েন, তাহা

নিবারণের জন্য মেম্ সাহেব আমার নিকট দুঃখ করিতে ত্রুটি করেন নাই এবং যাহাতে স্বামীর এই অভ্যাস অন্তর্হিত হয় তিনি সতত তাহার চেষ্টা করিতেন। চা ঘরের পরিদর্শক হোগার্থ সাহেব পরলোক গমন করিবার পরে এসিংটন্ টম্‌সন্ নামক একজন উত্তম ভদ্র ইংরেজ ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। তিনি সপরিবারে বাগ্রাকোর্টে আসিয়া আমাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ইনি ইংরেজ বিদ্বেষী ছিলেন। উদ্ধত স্বভাবের ইংরেজগণ ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতবাসীকে অকারণ পীড়ন করে এই কথা মুক্তকণ্ঠে আমার নিকট বলিতেন। খৃষ্টান ধর্ম্মে যে কিছুই নাই, কেবল লোক দেখান ধর্ম্ম—তিনি অনেক সময়ে এই কথাও বলিতেন। তিনি হিন্দু ধর্ম্মের শত শত প্রশংসা করিতেন; ইংরেজ ধর্ম্ম যাজকদিগকে তিনি বিশ্বাস করিতেন না কারণ তিনি বলিতেন, "অনেক ইংরাজ ধর্ম্মযাজকের তাঁহাদিগের নিজ ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস নাই অথচ অর্থ উপার্জ্জনের জন্য পাদ্রি নামে পরিচিত হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন।" তিনি বলিলেন যে,—আমি এই কথা একজন শ্রেষ্ঠ গণ্যমান্য পাদ্রির মুখে শ্রবণ করিয়াছি। এই সময়ে কালীপ্রসন্ন ভায়া মাতাঠাকু-রাণীকে লইয়া বাগ্রাকোর্টে উপস্থিত হয়েন এবং কালীপ্রসন্ন ২।১ মাস তথায় থাকিয়া নলডাঙ্গায় প্রত্যাগমন করেন। উল্লিখিত টম্‌সন্ সাহেবের তিন কন্যা এবং একটী পুত্র; পুত্রটী সর্ব্ব কনিষ্ঠ, ১ম ও ২য় কন্যার বয়ঃক্রম যথাক্রমে ১২ ও ১৩ বৎসর হইবে। এই সকল বালক বালিকাগণ আমার স্ত্রীর নিকট প্রায় প্রতি অপরাহ্নে আসিত এবং আমাদিগের দেশীয় মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইত। কোন কোন দিন আমার স্ত্রীর বস্ত্র এবং অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিত এবং আমার স্ত্রীও তাহাদিগকে পাইয়া অনেক সময়ে আমোদে কালাতিপাত করিত। বর্ষাকালে চুনভাটী যাইতে লীষ্ নদ পার হইতে হয় কিন্তু সময়ে সময়ে অত্যধিক জল বৃদ্ধি হইয়া পারাপার বন্ধ করিয়া

দিত ; হয়ত এরূপ হইয়া পড়িত যে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে চুনভাটীতে গোকুলবাবুর বাঙ্গালায় বেড়াইতে গিয়াছি—গল্পে একটু বিলম্ব হইল, এদিকে দেখিতে দেখিতে নদীর জল হঠাৎ বৃদ্ধি হইয়া বাগ্রাকোটে আগমন করা দুরূহ হইত কাজেই আমাকে অনর্থক ৪।৫ ঘণ্টাকাল তথায় থাকিয়া জল বেগ হ্রাস হইলে ম্যাপচারা পার করিয়া দিত। একদিন বাগ্রাকোটে আমরা তিনজন বাঙ্গালী বিগুন পাহাড়স্থিত বড় সাহেবের বাঙ্গালায় যাইতে মনস্থ করিয়া বেলা অনুমানিক ৩ ঘটিকার সময়ে পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম ; ক্রমে সমতল ভূমি হইতে পর্ব্বতের অসম দেশ অতিক্রম করিয়া বক্রগতিতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। উঠিতে উঠিতে পদঠাকুর মহাশয়ের অসহনীয় কষ্ট হওয়ায় শরীরস্থ ব্রহ্মাণ্ডদেবকে কষ্টের কাহিনী জানাইতে লাগিলেন। আমাদিগের সকলেরই একরূপ অবস্থা, আমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত পর্ব্বতের মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই এবং সময়ে সময়ে পদঠাকুরকে নিবৃত্ত করিয়া মসৃন পাথরের উপর বসিয়া বিশ্রাম করাইয়া লইলাম। যে পার্ব্বতীয় পথে আমরা যাইতেছিলাম ঐ পথ কালিম্পং পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। দয়াময় যেন পথিকের প্রতি সদয় হইয়া পথ পার্শ্বে ঝর্ণা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। অতি সুমিষ্ট পরিস্রুত জল। আবার পথিকের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য পথি পার্শ্বের কিয়দ্দুর ব্যবধানে বিভিন্ন প্রকারের পার্ব্বতীয় ফল রাখিয়া দিয়াছেন। সুঘ্রানের জন্য কত প্রকার পার্ব্বতীয় ফুলের এবং কর্ণ পরিতৃপ্তির জন্য নানাপ্রকার পক্ষীর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন—সে অতি হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য। পাহাড়ে অসংখ্য রম্ভাতরু দৃষ্টি-গোচর হইল এবং নানাপ্রকারের বানরও দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ বানরগণ রম্ভা প্রভৃতিতে পরিতৃপ্ত হইয়া ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। যাহার যে অভাব তিনি তাহা দিয়া সকলকে সমভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

আমরা প্রায় এক ঘণ্টাকাল পর্ব্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া নির্দ্ধারিত স্থানে পৌছিলাম; অনভ্যাসবশতঃ শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িল। যাহা হউক, আমরা বড় সাহেবের বাঙ্গালার সম্মুখের বারান্দায় কাষ্ঠাসনে বসিয়া শরীর এবং পদদ্বয়কে সুস্থ করিয়া লইবার সময় দেখিলাম, যে স্থানে বাঙ্গালাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বেশ সমতল ভূমি। নিম্নদেশ হইতে বাঙ্গালাটীকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইত, এখন দেখিতেছি,—প্রকাণ্ড বাঙ্গালা। বাঙ্গালাটীর চতুঃপার্শে নানা প্রকার পুষ্প-বৃক্ষে সুশোভিত। আমরা বাঙ্গালা-রক্ষকের নিকট হইতে দূরবিক্ষণ যন্ত্র লইয়া বাগ্রাকোর্ট কাপ্পানের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। সাহেব বাহাদুর এখানে থাকিলে যে স্থান হইতে পানীয় জল গৃহীত হয়, তাহা দর্শন মানসে রক্ষককে বলায় সে আমাদিগকে বাঙ্গালার অনেক নিম্নে একটী উপত্যকায় লইয়া গেল; তথায় অবতরণ করিয়া দেখিলাম,—কি সুন্দর একটি নির্ঝরণী! অনবরত জল পতিত হইতেছে। তন্নিম্নে ক্ষুদ্র নদীর আকারে নির্গত হইয়া গিয়াছে; জল বরফের ন্যায় শীতল। ঐ ঝর্ণার চতুর্দ্দিকে দারুচিনী, লবঙ্গ ও রম্ভা প্রভৃতি নানা প্রকার বৃক্ষে পরিশোভিত। তথায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া বাঙ্গালায় পুনরুত্থান করিলাম।

ডেনি সাহেব

এক দিন ড্যাম্‌ডিম্‌ থানার বাঙ্গালী পুলিশ দারোগা মহাশয় পুলিশের পোষাকে এই বাগানের সাধারণের গমনাগমনের রাস্তা দিয়া তিন জন কনেষ্টবল সহ কোথায় যাইতেছিলেন। সেই সময় সহকারী ম্যানেজার ডেনি সাহেব বাগানের মধ্যে কার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন। "কালা আদমি" তাঁহার সমক্ষে অশ্বারোহণে যাইতেছে দেখিয়া উক্ত দারোগা মহাশয়কে বিশেষরূপে অপমানিত করিয়া অশ্ব হইতে নামাইয়া দেন। দারোগা মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল সুতরাং

আমাকে দেখিয়া তিনি বিশেষরূপে অপ্রস্তুত হন এবং চা-ঘরে বড় সাহেবের নিকট এই ঘটনা প্রকাশ করেন। বড় সাহেব তাঁহাকে শান্তনা করিয়া বলেন যে, তিনি ঐ অনভিজ্ঞ যুবক সাহেবকে শাসন করিয়া দিবেন।

ইহার ছয় মাস পরে একটি রুগ্ন নেপালি কুলি বিওণ পাহাড়ের উপরিস্থিত বড় সাহেবের বাঙ্গালার সন্নিকটস্থ পার্ব্বতীয় পথ দিয়া কালিংপুম্ যাইতেছিল। বাঙ্গালা-রক্ষক সামান্য কারণে ঐ রুগ্ন ব্যক্তিকে প্রহার করিয়া পুনরায় তাহাকে সহকারী ম্যানেজার ডেনি সাহেবের নিকট নিয়া যায় এবং তাহার অপরাধ বুঝাইয়া দিয়া সাহেবের অনুমত্যানুসারে প্রকাশ্য স্থানে তাহাকে বার বেত প্রহার করে। রুগ্ন ব্যক্তিটী সেই প্রহারে ভূমে পতিত হয় এবং অবসন্ন হইয়া পড়ায় তাহাকে তাহার আত্মীয়ের কুটিরে প্রেরণ করা হয়। যে দিবস অপরাহ্নে এই ঘটনা হয় তৎপর দিবস প্রাতে ডেনি সাহেব আমার বাসায় আসিয়া আমাকে বলেন যে, একটী লোক শঙ্কটাপন্ন পীড়িত, চল তাহাকে দেখিয়া আসি। আমি জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, "পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে তাহাকে বেত প্রহার করা হয়, তাহাতে সে ভয়ানক পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে।" আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সাহেবের সহিত কুলি লাইনে যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি স্তম্ভিত হইলাম এবং উক্ত রোগীর আত্মীয়গণকে কহিলাম, "ইহার জীবনের আশা নাই কারণ যে লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ধনুষ্টঙ্কার ভিন্ন আর কিছুই অনুমিত হইল না।" রোগী দেখিয়া দ্রুত-পদে ঔষধালয়ে আসিয়া তাহার নিদান-কালোপযোগী ঔষধ পাঠাইয়া দিলাম কিন্তু ঔষধ-বাহক রোগীর কুটিরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার প্রাণবায়ু নিঃস্বরণ হইয়া গিয়াছে। উক্ত সাহেব বাহাদুর আমার সহিতই ছিলেন। তিনি রোগীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমাকে কহিলেন যে, "তুমি এখানে ইহার মৃত সার্টিফিকেট দাও। আমি মৃত-দেহ লোক হেফাজতে

জলপাইগুড়ীতে ডেপুটী কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইতে চাহি।” আমি বলিলাম “আমি সরকারী ডাক্তার নহি; আমার সার্টিফিকেটের মূল্য নাই। আপনি পুলিশের আইনের নিয়ম অনুসারে মৃত-দেহ আপনার লোক দ্বারা পাঠাইতে পারেন না বরং স্থানীয় পুলিশ ষ্টেশনে এই সংবাদ প্রেরণ করুন। পুলিশের লোক যাহা করিবার হয় করিবে, অনর্থক অনধিকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না।” তিনি আমার কথা শুনিয়া বিশেষ কুপিত হইয়া কহিলেন “আমি যাহা বলিতেছি তাহাই কর।” ইহা শ্রবণ করিয়া “আঘাত জনিত ধনুষ্টঙ্কারে রোগীর মৃত্যু হইয়াছে;” এই ভাবে একখানি সার্টিফিকেট দিলাম। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া এবং আনুপূর্ব্বিক সত্য ঘটনা একখানি পত্রে বিবৃত করিয়া ১৫।১৬ জন কুলি দ্বারা ঐ মৃত-দেহ জলপাইগুড়ী পাঠাইয়া দেন।

মৃত-দেহ ড্যাম্‌ডিম্‌ থানার পুলিশ এলাকা অতিক্রম করিয়া ময়নাগুড়ী থানার নিকটস্থ রাজপথ দিয়া যখন লইয়া যায়, তখন পুলিশের লোকের নজরে পড়ে। ঐ সময়ে ড্যাম্‌ডিমের পূর্ব্বলিখিত দারোগা মহাশয় ময়নাগুড়ীতে কার্য্য করিতেছিলেন। ইনি একজন বিচক্ষণ পুলিশের আমলা; তাঁহার নিকট এই সংবাদ পৌছিলে, তিনি স্বয়ং মৃত-দেহ-বহনকারী লোকদিগের নিকট হইতে উক্ত লাস কাড়িয়া লন এবং ডেনি সাহেবের কীর্ত্তি অবগত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। পুলিশের লোক দ্বারা ঐ মৃত-দেহ জলপাইগুড়ীতে চালান দিয়া তিনি এবং ড্যামডিম্‌ থানার হেড কনেষ্টবল অন্যান্য কয়েকজন কনেষ্টবল সহ এই মোকর্দ্দমা তদারক করিতে ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌছেন। ওদিকে ডেপুটী কমিশনর সাহেব একজন সাহেব আসামী হওয়া সংবাদে পুলিশসাহেব ম্যাডেন ওয়ার্থ এবং ইনস্পেক্টর বাবুকে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া দেন। ইহারা ঘটনার ২।৩ দিবস পরে কার্য্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়েন কিন্তু তৎপূর্ব্বে ময়নাগুড়ীর দারোগাবাবু

প্রভৃতি সাহেব আসামীকে সম্পূর্ণ দোষী নির্দ্ধারণ করেন কিন্তু সাহেবকে ধরিয়া চালান দিতে পারিতেছিলেন না। ডেনি সাহেবকে স্পষ্টই দারোগাবাবু বলেন যে, প্রমাণে আপনাকে প্রকৃত আসামী নির্দ্ধারিত করিয়াছি অতএব আপনি আমাদের আসামী এবং সদরে চালান দিবার উপযুক্ত। এইরূপ ভাবে সাহেবকে নজরবন্দিভাবে রাখিতে-ছিলেন। এই ঘটনার সময়ে বড় সাহেব বাগ্রাকোটে ছিলেন না; তিনি ৪।৫ দিবস পরে অন্যান্য বাগান পরিদর্শন করিয়া আসিয়া সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করতঃ যাহাতে ডেনি সাহেব বিনা দণ্ডে মুক্ত হয়েন এই উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। একদিন আমাকে কহিলেন, "যে-কোন উপায়ে অনভিজ্ঞ যুবক ডেনি সাহেবকে এই কঠিন দায় হইতে মুক্ত করিতেই হইবে এবং তোমাকে সরকারী পক্ষ হইতে সাক্ষ্য স্থিরীকৃত করা হইবে; যাহা করিলে নিষ্কৃতি পায় এমত করিবে।"

মোকর্দ্দমার নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্ব দিন অপরাহ্নে ডেনি সাহেব এবং আমি টমটম্ গাড়ীতে শিলিগুড়ী অভিমুখে রওনা হইলাম। শিলিগুড়ীতে পৌছিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে পুনরায় রওনা হইয়া রাত্রি আনুমানিক আট ঘটিকার সময়ে আমরা জলপাইগুড়ী পৌছিলাম। ডেনি সাহেব আমাকে বাগ্রাকোট বাগানের সুবিখ্যাত উকিল বাবু প্রিয়লাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ঐ রাত্রে উক্ত উকিল বাবুর সহিত আর সাক্ষাৎ হইল না; আমি যৎ কিঞ্চিৎ জলযোগ সমাপনান্তে তাঁহার বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া রহিলাম। পর দিবস প্রাতে উকিল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনন্দিত হইলাম; বাবুটী অতি অমায়িক এবং নিরহঙ্কারী ভদ্রলোক। স্নান আহার অন্তে আমরা জলপাইগুড়ীর ডেপুটী কমিশনর সাহেবের এজলাসে উপস্থিত হইলাম। দেখিতে দেখিতে এগারটা বাজিল; হাকিম সাহেব এবং ডাক্তার সাহেব এজলাসে বসিয়া আমাদিগের সাহেবের মোকর্দ্দমাই প্রথমে ধরিলেন।

আমরা ক্ষিপ্র গতিতে আদালতে উপস্থিত হইলাম। ডেনি সাহেব এজলাসের সম্মুখস্থ বেঞ্চে উপবিষ্ট হইলেন, তাহার জবানবন্দী হইলে আমাকে এই মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে হাকিম সাহেব কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করিলাম। ডেনি সাহেব যে আসামী তাহা অনেক পরিমাণে কাটিয়া গেল কিন্তু তিনি ইংরেজ রাজত্বে বাস করিয়া উপরন্তু প্রজা হইয়া রাজার বে-আইনে যে এক জনকে বেত মারিতে আদেশ করিয়াছিলেন তজ্জন্য হাকিম সাহেব তাঁহার ৪০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড করিলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ আদেশ না করেন তজ্জন্য তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন। আমাদিগের উকিলবাবু জরিমানার টাকা দাখিল করিয়া সাহেবকে লইয়া আদালত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

ছোটলাট বাহাদুর

জলপাইগুড়ী সহরটী তত ভাল নহে; মিউনিসিপ্যালিটির বন্দোবস্ত বড়ই শোচনীয়। সহরের মধ্যস্থল দিয়া একটি আবর্জ্জনাময় অপ্রশস্ত নদী প্রবাহিতা, তাহাতে সেঁওলা বোঝাই। বাজারে কতকগুলি লোহারছাদযুক্ত দোকান ঘর; সকল জিনিষ-পত্র তথায় পাওয়া যায় না। সহর পরিদর্শন করিয়া প্রিয়নাথ বাবুর বাসায় আহারাদি সমাপনান্তে যথা সময়ে শয়ন করিলাম। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া জলপাইগুড়ী ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইলাম; ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম, বনাৎ দ্বারা প্লাটফরম বিছান হইতেছে। কমিশনর, ডেপুটী কমিশনর সাহেব সকলেই সেখানে উপস্থিত। শুনিলাম, কলিকাতা হইতে এই গাড়ীতে ছোটলাট বাহাদুর তাঁহার গ্রীষ্মাবাস দার্জ্জিলিংএ যাইতেছেন। বেলা আট ঘটিকার সময় ডাকগাড়ী আসিয়া পৌছিলে, কমিশনর সাহেব বাহাদুর স্বর্ণ বাটিতে করিয়া নিজ হস্তে চা লইয়া ছোটলাট বাহাদুরকে

দিলেন। এই রীতি ইংরেজ সমাজে সম্মানসূচক বলিয়া পরিগণিত কিন্তু আমি দেখিলাম এটি ষোল আনা তোষামোদ। যাহা হউক, আমি টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম কিন্তু আমাদিগের সাহেব আর আসিতে পারিলেন না; গাড়ী পোঁ করিয়া ছাড়িয়া দিল। আমি শিলিগুড়ী পৌঁছিয়া গো-শকটে বাগানাভিমুখে রওনা হইলাম। এই মোকর্দ্দমায় সাহেবের পক্ষে দুই-এক কথা বলায় "সঞ্জিবনী" কাগজে আমার কুৎসা প্রকাশ হয়। আসামে যেরূপ মোকর্দ্দমায় জড়ীত ছিলাম, এখানেও তাহাই হইল।

এই সময়ের ছয় মাস পূর্ব্বে আমার মাতুল মহাশয় পাবনা জেলার অন্তর্গত কোন এক গ্রামে তাঁহার জনৈক ধনী প্রজার বাটীতে হাঁপানি ব্যাধিতে জীবলীলা সাঙ্গ করেন। যিনি এক সময়ে মহাগণ্য-মান্য-সম্ভ্রান্ত তালুকদার বলিয়া লোক সমাজে পরিগণিত হইতেন, তিনি তাঁহার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সম্পত্তি বিহনে পথের ভিখারী তুল্য হইয়া দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যদিও আমরা শোকে অভিভূত হইয়াছিলাম কিন্তু আবার মনে ইহাও ধারণা করিয়াছিলাম যে, এই মৃত্যু তাঁহার পক্ষে অতি সন্তোষজনক হইয়াছে। কারণ শেষ জীবন যে কষ্টে অতিবাহিত হইতেছিল তদপেক্ষা মৃত্যুতে শান্তি পাইয়াছেন নচেৎ আরও কিছুকাল সংসারে থাকিলে যে কি অসীম কষ্টে পতিত হইতেন, তাহা কে বলিতে পারে?

নব-কুমার লাভ

ইহার কিছু দিবস পরে আশ্বিন মাসে আমার স্ত্রীকে নৈহাটীতে শ্বশুর মহাশয়ের নিকটে রাখিয়া নলডাঙ্গায় পূজাদর্শন করতঃ বাগ্রাকোটে প্রত্যাগমন করিলাম। এই সময়ে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র জামালপুরস্থ তাহার মাতামহ ভবনে জন্মগ্রহণ করে। এই সংবাদ

শ্রবণ করিয়া মাতাঠাকুরাণী বিশেষ আনন্দিতা হন। উক্ত বৎসর বাগ্রাকোর্টের চতুর্দ্দিকে ইনফ্লুইঞ্জা জ্বরের প্রকোপ হয়। আমিও এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। নিকটবর্ত্তী বাগানের ডাক্তার মহাশয়েরা আমার চিকিৎসা করেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিতে না পারায় নর্থ সাহেবের নিকট হইতে চির বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে তিনি কোন আপত্তি না করিয়া একখানি প্রশংসা-পত্র প্রদান করিলেন। কার্য্য ত্যাগ করিয়া দিনাজপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার শরীর তখন পর্য্যন্ত খুবই অসুস্থ ছিল; হাঁপানির উপর কাশি ও জ্বর বর্ত্তমান ছিল। বেলা আনুমানিক দশ ঘটিকার সময়ে দিনাজপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। ক্রমে ক্রমে অনেক ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গাড়ী চলিতে লাগিল। নূতন রেলওয়ে লাইন উপরন্তু বর্ষাকাল—দুই ধারে জলেতে জলময় দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিলেই যেন প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয় কারণ যদি এই স্থানে গাড়ী লাইনচ্যুত হয়, তবে যাত্রীদিগকে গাড়ী সহ অতল জলে নিপতিত হইতে হইবে। সমস্ত দিবস গাড়ীখানি অবিশ্রান্ত চলিয়া রাত্রি আনুমানিক আট ঘটিকার সময়ে ভাগীরথি তীরস্থ মনিহারি ঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। তথায় অবতরণ পূর্ব্বক জাহাজে পার হইয়া লুপ লাইনের সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনে জামালপুরের ডাকগাড়ীর প্রত্যাশায় রাত্রি একটা পর্য্যন্ত প্লাটফরমে বসিয়া সময় অতিবাহিত করিলাম। যথা সময়ে কলিকাতা হইতে ডাকগাড়ী উপস্থিত হইলে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। রাত্রি সাড়ে তিন ঘটিকার সময়ে জামালপুরে পৌছিলাম। শ্বশুর মহাশয় প্রেরিত পাল্কিতে আমি এবং মাতাঠাকুরাণী কেশবপুর পাড়াস্থিত শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলাম। আমাকে এইরূপ রুগ্ন দেখিয়া শ্বশুরালয়স্থ সকলেই দুঃখীত এবং চিন্তিত হইলেন।

আমরা জামালপুরে পৌছিয়া নব-কুমারকে সন্দর্শন করতঃ বড়ই আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইলাম। রেলওয়ের ডাক্তার বাবু কেদারনাথ মিত্র এল, এম, এস মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া অল্প দিবসের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইলাম। আমি প্রায় দুই মাস তথায় থাকিয়া শরীর সুস্থ করতঃ সপরিবারে নলডাঙ্গায় রওনা হই। আমরা যশোর হইয়া অশ্ব-শকটে নলডাঙ্গায় পৌছিলাম। নব-কুমার গ্রামস্থ সকল আত্মীয় বন্ধুগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিল।

আশ্বিন মাস—শুভদিন দেখিয়া নব-কুমারের প্রথম-সংস্কার অন্নপ্রাশন কার্য্য আমার অবস্থার সাধ্যাতীতভাবে সম্পন্ন করা হয়। নলডাঙ্গার চতুঃপার্শ্বস্থ প্রায় ছয়-সাতখানি গ্রামের ব্রাহ্মণ এবং এয়ো-স্ত্রীগণকে পলান্ন ও নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা ভোজন করান হয়। ইহাতে সর্ব্ব মোট প্রায় চার পাঁচ শত লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আমার বাল্য বন্ধু বাবু কেশবচন্দ্র দেব রায় তালুকদার মহাশয়ের বিশেষ যত্নে তথাকার প্রধান রাজা প্রমথভূষণ দেব রায় বাহাদুর অন্নপ্রাশন দিবসের রাত্রে প্রায় এক শত আমলা চাকর পরিবেষ্টিত হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসেন; সকলের উৎসাহে এবং যত্নে তাঁহাদিগকেও তদ্রূপ ভাবেই ভোজন করান হয়। গ্রামস্থ সকল তালুকদার এবং আত্মীয় প্রতিবাসিগণের অসীম দয়া ও সহানুভূতিতে এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই কার্য্যে যদি তালুকদার মহাশয়গণ আমাকে সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে রাজা বাহাদুরকে আমার পর্ণ কুটিরে আনিতে সাহসী হইতাম না।

মাতৃহারা

উক্ত কার্য্যের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে মাতাঠাকুরাণী দুরারোগ্য আমাশয় এবং শোথ ব্যাধিতে অল্প দিবসের মধ্যেই শয্যাগত হইলেন।

ইনি গুপ্তী পাড়ায় অবস্থান কালীন প্লীহা রোগে আক্রান্ত হন; তাহার আয়তন একভাবেই থাকাতে শরীরের রক্তানুর বড়ই সল্পতা হইয়াছিল উপরন্তু এই রক্ত আমাশয়ে শরীরের জীবনী-শক্তি অতি অল্প দিবসের মধ্যেই হ্রাস হইয়া পড়িল। নলডাঙ্গার প্রসিদ্ধ রাজ-কবিরাজ ৺রমানাথ কবিরাজের ছাত্র বাবু প্রসন্ন কুমার সেন গুপ্ত এবং রাজ বাটীর ডাক্তার বাবু বিহারীলাল দত্ত মহাশয়দ্বয় মাতাঠাকুরাণীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হয়েন কিন্তু দুঃখের বিষয় যখন মহাকাল মুখ-ব্যাদন করিয়া মায়িক জীবকে গ্রাস করিতে উদ্যত হন, তখন কাহারও সাধ্য নাই যে, সে গতিকে প্রতিহত করে। দুঃখিনী মাতাঠাকুরাণী তাঁহার এই অধম সন্তানের জন্য কত কষ্টই পাইয়াছিলেন! আমার বিদ্যা উপার্জ্জনের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুদূর দেশে আসিয়া—আমাকে যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে দেখিয়া—ভবিষ্যৎ আশার জন্য কত আনন্দিতা হইয়াছিলেন কিন্তু চিরকাল কষ্টে কাল কাটাইলেন; পুত্রের উপার্জ্জিত ধনে সুখী হইতে সক্ষম হইলেন না। বাঞ্ছাকল্পতরু তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন না। এই মৃত্তিকার-জীব দেহে যতদিন ভোগ করিবার কথা, তদনুসারে পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী কালের কুঠোর শাসনের অন্তর্ভূক্তা হইলেন। চিকিৎসায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় সাধের পুত্র, পৌত্র এবং পুত্র-বধুকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অমৃতধামে চলিয়া গেলেন। বাল্য কাল হইতে মাতৃ ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া পিতৃ শোক ভুলিয়াছিলাম; এখন আমি ময়-জগতে মাতার স্নেহ হইতেও বঞ্চিত হইলাম। মনের কত দুরাশা হৃদয় রাজ্যে পোষণ করিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু সকলই মনে বিলীন হইয়া গেল। ৺ গঙ্গাতীরে তাঁহার জন্ম হওয়া সত্বেও অকালে গঙ্গাহীন দেশে নলডাঙ্গাস্থ কালিকাতলার দোহায় তাঁহার সৎকার কার্য্য সম্পন্ন হইল।

এলাহাবাদে

মৃত্যুর কয়েকদিবস পরে আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হইতে কার্য্যের নিযুক্ত-পত্র প্রাপ্ত হই; তখনও অশৌচান্ত না হওয়ায় শোক-বস্ত্র পরিধান করিয়াই পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীর এক খণ্ড অস্থি সংগ্রহ করতঃ প্রাণাধিক শিশু-পুত্র এবং পত্নীকে মাসি-মাতাঠাকুরাণীর নিটক রাখিয়া কলিকাতায় গমন করি এবং ৺গঙ্গা-গর্ভে অস্থি নিক্ষেপ করিয়া যথা সময়ে উক্ত রেলওয়ের সেক্রেটারী ওয়াগ্‌ ষ্টাফ্‌ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার নগ্ন-পদ ও শোক-বস্ত্র দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হয়েন,—আমি যথাযথ কহিলে, তিনি বলিলেন, "এলাহাবাদে তোমার চাকুরী হইয়াছে; এই অবস্থায় যাইতে সক্ষম হইবে?" আমি স্বীকৃত হইলে লুপ লাইন হইয়া এলাহাবাদ যাইতে মধ্যম শ্রেণীর পাস্‌ মঞ্জুর করিলেন। উক্ত দিবসে লুপ ডাকগাড়ীতে জামালপুর রওনা হইয়া যথা সময়ে তথায় অবতরণ করতঃ শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলাম। আমার শোক-বস্ত্র পরিধান দেখিয়া আত্মীয়গণ যেরূপ দুঃখিত হইলেন, রেলওয়ে কার্য্য হওয়া সংবাদে তা'র চেয়েও বেশী আনন্দিত হইলেন। পুত্র ও পত্নীকে সত্বর জামালপুরে আনিতে আমার শ্বশুর মহাশয়কে বলিয়া তৎপর দিবস অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার গাড়ীতে এলাহাবাদ রওনা হইলাম। এলাহাবাদে আমার কোন আত্মীয় ও বন্ধু না থাকায় জামালপুর হইতে আমার জনৈক বন্ধু অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জ্যোতিষপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাহার জনৈক সুহৃদ কালিদাস মজুমদারের নামে একখানি পত্র আমাকে প্রদান করেন; আমি তাহা লইয়া রওনা হইলাম। দেখিতে দেখিতে মোকাম ষ্টেশনে আমাদের গাড়ী পৌছিল। তথায় লুপ লাইন শেষ হইয়াছে সুতরাং গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কর্ড লাইনের গাড়ীর প্লাট ফরমে গাড়ীর অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। এক ঘণ্টা পরে কলিকাতা হইতে

পশ্চিমাভিমুখে যাইবার জন্য যাত্রী-গাড়ী উপস্থিত হইল। মোকামা ষ্টেশনটী একটী বড় ষ্টেশন। আমি জিনিষ-পত্র সহ মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলাম। যথা সময়ে গাড়ীখানি মোকামা পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। বহু গ্রাম ও প্রান্তর অতিক্রম করিয়া রাত্রি আনুমানিক সাড়ে বার ঘটিকার সময়ে বাঁকীপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইল; তথা হইতে গয়া ও ছাপড়া লাইন দুই দিকে বহির্গত হইয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্রতি ষ্টেশনে চার পাঁচ জন বাঙ্গালী যাত্রীর মুখ অবলোকন করিতেছিলাম কিন্তু বাঁকীপুর ও দানাপুর অতিক্রম করিবার পরে বাঙ্গালী যাত্রী বিশেষ দৃষ্টিগোচর হইল না। অতি প্রত্যুষে গাড়ীখানি প্রকাণ্ড সুসজ্জিত মোগলসরাই ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। এই স্থান হইতে আউড-রহিল-খণ্ড রেলওয়ে বাহির হইয়া গিয়াছে এবং ইহার পরের ষ্টেশন মহাতীর্থ কাশীধাম, উক্ত রেলওয়ের প্রথম ষ্টেশন। উহা আর আমার অদৃষ্টে দর্শনলাভ হইল না। প্রত্যুষে এই মোগলসরাই ষ্টেশনে যাত্রীগণ প্রাতঃকৃত্য কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে, সুতরাং আমিও প্রাতঃকৃত্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইলাম। লোকে লোকারণ্য—রথ-যাত্রীর ভীড় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হস্ত মুখ প্রক্ষালন মাত্রে অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ী ছাড়িল। উভয় পার্শ্বে গ্রাম ও প্রান্তর দেখিতে দেখিতে মৃজাপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। আসন, গালিচা এবং প্রস্তর-খোদিত জিনিষের জন্য এস্থান বিখ্যাত। এই ষ্টেশনে আমার পূর্ব্ব পরিচিত মহেশপুর নিবাসী বাবু নিধুরময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে শুনিলাম, ইনি এই রেলওয়ের ডাক্তার। আমাকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং বারম্বার তথায় অবতরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার নিকট এলাহাবাদের রেলওয়ে-ডাক্তার সাহেবের বিষয় অবগত হইয়া জানিলাম, উক্ত ডাক্তার সাহেবটী বড়ই দুষ্ট প্রকৃতির লোক—ডাক্তার বাবুদিগের সহিত বড়ই কু-ব্যবহার করিয়া

থাকেন। আমি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বড়ই ভীত হইলাম। যাহা হউক, ডাক্তার বাবুর অনুরোধ রক্ষা করিতে সক্ষম হইলাম না। অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ী ছাড়িল এবং দেড় ঘণ্টার মধ্যেই এলাহাবাদের সংলগ্ন প্রকাণ্ড যমুনা নদীর সেতুর উপর দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল; সে অতি মনোরম দৃশ্য। সেতু হইতে অল্প ব্যবধানেই এলাহাবাদের প্রকাণ্ড ষ্টেশনের মধ্যে গাড়ী দণ্ডায়মান হইল। আমি বেলা সাড়ে দশ ঘটিকায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। ষ্টেশনটী অতি সুন্দর এবং সুসজ্জিত; ষ্টেশনের লৌহময় ছাদের নিম্ন দিয়া প্রকাণ্ড একটি সেতু চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে ইংরেজ-পল্লি ও সহর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। আমি ষ্টেশন হইতে নির্গত হইয়া একখানি এক্কা গাড়ী ভাড়া করিয়া শ্রীযুক্ত কালিদাস মজুমদার মহাশয়ের বাসাভিমুখে রওনা হইলাম।

এক্কা-চালক যথা সময়ে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিল। কালি বাবু তখন বাসায় ছিলেন না; তাঁহার চাকর আমাকে যথোচিৎ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বাটীর ভিতরে নিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে কালিবাবু (এলাহাবাদের লোকো ফোরম্যান অফিসের বড়বাবু) বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে আমি স্ব-হস্তে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিতে-ছিলাম। তিনি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবা মাত্রই আমি এক অভাবনীয় ভাবে তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম, "আমি আপনাকে বিশেষরূপে চিনি, একত্রে গুপ্তীপাড়ায় ইংরাজী স্কুলে পাঠ করিতাম; আমার নিবাস গুপ্তিপাড়ায়।" তিনি আমাকে প্রথমে চিনিতে পারিলেন না; পরিশেষে আমার পরিচয় পাইয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ইঁহার মাতাঠাকুরাণীকে গুপ্তিপাড়ায় কতবার দেখিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই; কারণ কালিবাবুর ও আমাদের বাটী এক পল্লিতে; আমার মাতাঠাকুরাণীকে বিশেষরূপে জানিতেন। কালিবাবুর মাতাঠাকুরাণী আমার নিকট বসিয়া আলাপ-পরিচয় করিতে লাগিলেন।

আমার মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পাঠক! দেখুন, কালিবাবুর সহিত কিরূপ অভাবনীয়রূপে সাক্ষাৎ হইল! যিনি আমার বাল্যবন্ধু—যাঁহার সহিত একত্রে পাঠাভ্যাস করিয়াছি—যাঁহার নিবাস আমার জন্মস্থানের অতি সন্নিকটে, তাঁহাকে অপরিচিত লোক ভাবিয়া—সুপারিশ-পত্র লইয়া আসিয়াছিলাম অথচ যিনি সুপারিশ-পত্র দিয়াছিলেন, তদপেক্ষা আমার সহিত অধিক আলাপ পরিচয় ছিল। যাহা হউক, পূর্ব্ব-পরিচিত কালিবাবুকে পাইয়া আমার ক্লীষ্ট মনে কতক পরিমাণে শান্তির উদয় হইল। ইঁহার বাসায় হালিসহর নিবাসী নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও বাস করিতেছিলেন সুতরাং নূতন স্থানে আমাকে চোরের মত চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল না। আমি এলাহাবাদের ডাক্তার হইয়া আসিয়াছি, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ রায় রেলওয়ে হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবুদ্বয় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কালিবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আমার সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া যথা সময়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

আমি পরদিবস প্রাতঃকালে শোক-বস্ত্র পরিধান করিয়া বিনামা-শূন্য পদে রেলওয়ের প্রধান ডাক্তার গ্রিফিথ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেক্রেটারী সাহেবের পত্রখানি তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি আমার বক্ষঃস্থল ও প্লীহা পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "তুমি অদ্য হইতে কার্য্য করিতে আরম্ভ কর।" আমি তাঁহার আদেশ মত ঐ দিবস হইতে কার্য্য করিতে লাগিলাম। তিনি আমার শোক-বস্ত্র পরিধানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি যথাযথ কহিলাম। অশৌচ অন্তের দিবস ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে দুই দিবসের বিদায় গ্রহণ করিয়া কালিবাবুর সাহায্যে প্রয়াগের ৺ বেণীমাধবের ঘাটে ক্ষৌর-কার্য্য, সম্পন্ন করিয়া ঐ

দিবসের সমস্ত কার্য্য ঘাটে সমাধা করিলাম। পর দিবস শ্রাদ্ধোপলক্ষে আমি ও কালিবাবু প্রাতে অশ্ব-শকটে পুনরায় বেণীমাধবের ঘাটে উপস্থিত হইয়া হিন্দুস্থানী পুরোহিত দ্বারা সমস্ত শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা করিয়া ভাট ব্রাহ্মণদিগকে জলপান করাইলাম এবং ঘাটে কতকগুলি গরীব লোককে আমার অবস্থানুযায়ী যৎসামান্য বিতরণ করিয়া কালিবাবুর সহিত বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। তৃতীয় দিবসে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে জ্ঞাতিকে আমিষ ভোজন করাইতে হয়। এলাহাবাদে আমার জ্ঞাতি কোথায় পাইব? সুতরাং স্ব-গোত্রীয় নিত্যসখা বাবুকে ভোজন করাইয়া কার্য্য শেষ করিলাম। ওদিকে নলডাঙ্গায় আমার পত্নীও অশৌচান্তে শব-বহনকারী ব্রাহ্মণদিগকে যথাযোগ্যভাবে জলপান করাইয়াছিল।

মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যুর চতুর্দ্দশ দিবসে আমি কালিবাবুর বাসা হইতে স্থায়ীভাবে রেলওয়ের ডাক্তার বাবুদিগের বাসায় একত্রিত হইলাম এবং তাঁহাদিগের সহিত আহারাদি করিতে লাগিলাম। তিন জন বন্ধু একত্রিত হইয়া বেশ আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। ডাক্তার হেমবাবু পূর্ব্বে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সুতরাং আমিই তাঁহার স্থানে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। কয়েক দিবসের মধ্যে হেমবাবু আমাকে কার্য্যভার প্রদান করিয়া পূর্ণিয়ায় একজন নবাবের অধীনে কার্য্য পাইয়া এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আমি প্রাতে হাঁসপাতালে সারদাবাবু সহ ডাক্তার সাহেবের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলাম এবং নাইনি, সিরাজপুর, মালয়ারি এবং ভাবোয়ারী ষ্টেশনে রোগী দেখিতে মধ্যে মধ্যে যাইতে লাগিলাম। এতদ্ভিন্ন এলাহাবাদ সহরস্থ রেল কোম্পানীর বাবুদিগকে ও অন্যান্য কারখানার লোকদিগকে এক্কা করিয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে দেখিতে যাইতে হইত। অনেক সময়ে রেল কোম্পানীর ইংরেজ পল্লিতে সাহেব ও মেমদিগকে প্রায়ই দেখিতে যাইতে হইত। বিশেষতঃ প্রতিদিন

রাত্রেই ইংরেজ পল্লি হইতে ডাক আসিত। প্রতিদিন রাত্রে একজনের যাইতে হইলে অনেক কষ্ট হইবার সম্ভাবনা তজ্জন্য এক দিবস অন্তর আমরা দুইজন যাইতে আরম্ভ করিলাম। রেলওয়ের হাঁসপাতালটি মন্দ নহে; সাহেব এবং বাঙ্গালীদিগের জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা আছে। এই স্থানেই ডাক্তার সাহেবের তত্ত্বাবধানে রেল কোম্পানীর ঔষধের প্রকাণ্ড গুদাম; এই গুদাম হইতে সকল স্থানে ঔষধ প্রেরিত হইত। উক্ত গুদামে একজন সাহেব গুদাম-রক্ষক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন ডাক্তার সাহেবের অধীনে একজন ইংরেজ কেরানীও ছিলেন।

কয়েক দিবসের মধ্যে কাটনির ডাক্তারবাবু জব্বলপুরে নর্ম্মদা নদীর জল প্রপাত এবং মারবল বক দেখিতে দুই তিন দিবসের জন্য বিদায় প্রার্থনা করায় ডাক্তার সাহেব তাহা মঞ্জুর করিয়া আমাকে তথায় তিন দিবসের জন্য উক্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন।

কাটনিতে

নির্দ্ধারিত দিবসের প্রাতের যাত্রী-গাড়ীতে উঠিয়া যমুনা নদীর উপর দিয়া নাইনি ষ্টেশন হইতে জব্বলপুর লাইনের অভিমুখে রওনা হইলাম। দুইধারে বিন্ধ্যগিরি পর্ব্বত উচ্চ-শির করিয়া দণ্ডায়মান; উপত্যকার মধ্য দিয়া জব্বলপুর রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। অসম প্রদেশ বলিয়া গাড়ীগুলি মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে মাণিকপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। এই মাণিকপুর হইতে ঝান্সি লাইন-বহির্গত হইয়া গিয়াছে; ইহার তিন চারটি ষ্টেশন পরেই চিত্রকূট পর্ব্বত।

এই চিত্রকূট পর্ব্বতে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার বনবাসের অনেক সময় কাটাইয়াছিলেন। ইহা আমাদিগের একটী প্রধান-তীর্থ স্থান। দেশ বিদেশ হইতে অনেক যাত্রী উক্ত তীর্থ স্থানে গমন করিয়া থাকেন। তৎপরেই মাকুণ্ডি ষ্টেশন।

এই ষ্টেশন পর্য্যন্ত সাতনার ডাক্তার বাবুর সীমানা। এই ষ্টেশনের অতি নিকটে সিদ্ধ-বাবা নামক একজন সিদ্ধ-যোগীপুরুষ বাস করিতেন। বেলা ১২টার সময় এই লাইনের একটী প্রধান ষ্টেশন সাতনায় গাড়ীখানি উপস্থিত হইল। ষ্টেশনটী বেশ সুসজ্জিত—লোকজনে পরিপূর্ণ। এই ষ্টেশনে প্রত্যেক গাড়ীর গার্ড সাহেব এবং ইঞ্জিন বদল হইয়া থাকে। আমি তথায় পৌঁছিলে সাতনার ডাক্তার ইপতাকায় হোঁসেন আমার কাটনি যাওয়ার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার কম্পাউণ্ডার সহ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। এই ডাক্তার বাবুটি এলাহাবাদে স্থায়ীভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন; কিছু দিবসের জন্য এখানে আসিয়াছেন। আমাকে যথাবিহীত সম্ভাষণ করিয়া আমার জন্য জল খাবারের আয়োজন করিয়া দিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার ডাঙ্কান সাহেবের সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিলেন। সময় কাহারও হাত ধরা নহে সুতরাং দেখিতে দেখিতে এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। যথা সময়ে গাড়ী পুঁ করিয়া ছাড়িয়া দিল। বলা বাহুল্য, আমি মধ্যম শ্রেণীর পাশ পাইয়া যাইতেছি; রেলওয়ের ৭৯৲ টাকা মাসিক বেতনভুক্ত কর্ম্মচারীগণ মধ্যম শ্রেণীর পাশ পান, তদূর্দ্ধ দ্বিতীয় শ্রেণীর পাশ পান। যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে উচেরা, মাইহারা এবং ভাদনপুর ষ্টেশন উত্তীর্ণ হইয়া কাটনির ডাক্তারের এলাকাধীন ষ্টেশন সমূহ অতিক্রম করিয়া বেলা আনুমানিক পাঁচটার সময়ে কাটনি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এই ষ্টেশনটিতে রেল কোম্পানীর কার্য্য বড় কম হয় না কিন্তু ষ্টেশনটী ক্ষুদ্র আয়তনের। এই ষ্টেশন হইতে বেঙ্গল নাগপুর লাইন বহির্গত হইয়া বিলাশপুরের সংযোগে মিলিত হইয়াছে। আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে ডাক্তারখানার চাপড়াসি আমাকে ষ্টেশনের অতি নিকটস্থ রেলওয়ের ডাক্তারখানায় লইয়া গেল। সেখানকার ডাক্তার বাবুটীর সহিত আলাপ হইলে জানিতে পারিলাম, ইহার নাম শ্রীহরিমোহন চক্রবর্ত্তী নিবাস

চন্দননগর, সুবর্ণ-বণিক ব্রাহ্মণ। বয়ঃক্রম আনুমানিক পঞ্চাশ বৎসর হইবে। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, তাঁহার শরীরে কোন ব্যাধি আছে। ইনি অনেক বৎসর যাবৎ এই রেল কোম্পানীর কার্য্য করিতেছেন। প্রথমে ইনি কম্পাউণ্ডার ছিলেন; ডাক্তার সাহেবগণ ক্রমে ক্রমে ইঁহাকে ডাক্তার করিয়া উচ্চ বেতন দিতেছেন; এক্ষণে ইনি ৭৫৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। ইহাকে অনেকে 'ব্রহ্মা' বলিয়া ডাকিত। পাঠক! অনুমান করিয়া লইবেন; তাহা প্রকাশ করিয়া মুখ কেন কলুষিত করিব? আমি অপরাহ্ণের গাড়ীতে পৌঁছিলে আমাকে ডাক্তার খানার যথাযোগ্য ভার দিয়া ঐ রাত্রে ডাক-গাড়ীতে ডাক্তার বাবু জব্বলপুর গমন করিলেন। পর দিবস আহারান্তে অপরাহ্ণের গাড়ীতে জব্বলপুরের এক ষ্টেশন পূর্ব্বে ডিউরী ষ্টেশনে রোগী দেখিতে গমন করি। ডিউরী যাইতে দুই ধারে জঙ্গল, পাহাড় ও যৎসামান্য প্রান্তর ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলাম যে, ডিউরী ষ্টেশন-মাষ্টার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হইয়া হিন্দুস্থানী একজন গোপ জাতি স্ত্রীলোককে উপপত্নীরূপে রাখিয়া বাস করিতেছিলেন এবং তৎগর্ভে কয়েকটী পুত্র-কন্যাও জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বালকগণ বাঙ্গালা ভাষায় কথোপ-কথন, বাঙ্গালীর ন্যায় বেশ ভূষা এবং বাঙ্গালা পাঠ অভ্যাস করিতেছে। অপরাহ্নে জলযোগ সমাপনান্তে ডিউরিতে যাত্রী-গাড়ীতে যাত্রা করিলাম। যথা সময়ে তথায় উপস্থিত হইলে মাষ্টার বাবু আমাকে আহার করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি জলযোগ করিয়া আসিয়াছি বলায়, তিনি বোধ হয় আমার মনোগত ভাব অনুমান করিয়া আর অনুরোধ করিলেন না। রাত্রে রোগী দেখিয়া তৎপর দিবস প্রাতের গাড়ীতে উত্তর পূর্ব্বদিকের ষ্টেশনগুলি পরিদর্শন করিয়া সন্ধ্যার সময়ে কাটনি প্রত্যাগমন করিলাম। উক্ত রাত্রে হরিমোহন বাবু জব্বলপুর

হইতে প্রত্যাগমন করিলে আমিও পর দিবস প্রাতে ডাক্তারখানার ভার উক্ত ডাক্তার বাবুকে বুঝাইয়া দিয়া এলাহাবাদে যাত্রা করিলাম। কাটনির ষ্টেশন মাষ্টার বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বড়ই ভদ্রলোক; তিনি সপরিবারে তথায় বাস করিতেন। ইঁনি সাহেবদিগের মনোরঞ্জন করিতে সিদ্ধহস্ত এবং তাঁহার অধীনে দশ এগার জন বাঙ্গালী বাবু কার্য্য করেন।

সাতনাতে

উক্ত দিবসের সন্ধ্যাকালে এলাহাবাদ সহরে পৌছিলাম এবং তৎপর দিবস প্রাতে ডাক্তার সাহেব হাঁসপাতালে আসিয়া আমাকে হঠাৎ স্থায়ীভাবে জব্বলপুর মধ্যস্থিত সাতনা ষ্টেশনে বদলি করিলেন। আমি উক্ত দিবস অপরাহ্ন চার ঘটিকার বোম্বে ডাক-গাড়ীতে জিনিষ-পত্রসহ সাতনা অভিমুখে রওনা হইলাম। পূর্ব্বেই সাতনার ডাক্তার ইপতাকার হোসেনকে সংবাদ প্রেরণ করি যে, "আমি ডাক-গাড়ীতে সাতনায় যাইতেছি, আমার রাত্রের আহারের বন্দোবস্ত যেন সাতনার কোন রেলওয়ের বাবুর বাসায় ঠিক থাকে।" রাত্র সাড়ে নয় ঘটিকার সময়ে সাতনায় পৌছিয়া দেখিলাম, ষ্টেশনে রেলওয়ে ডাক্তার বাবু, কম্পাউণ্ডার এবং চাপরাসিসহ আমার জন্য উপস্থিত। সকলে আমাকে সাদরে অবতরণ করাইয়া ডাক্তার বাবুর বাসাভিমুখে লইয়া চলিলেন। ষ্টেশনের অনতিদূরে ইংরেজ পল্লীর মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকায় ডাক্তার বাবুর বাসস্থানে উপস্থিত হইলাম। ঐ রাত্রে আর অন্যত্র যাওয়া হইল না; যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ সমাপনান্তে নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া দৈহিক ক্লেশ নিবারণ করিলাম। প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম,—ডাক্তার বাবুর দ্বিতল অট্টালিকাটি অতি সুন্দর—চতুষ্পার্শ্বে বাগান; ইহার নিম্নতলে অফিস, বাটীর এক পার্শ্বে চাপরাসি ও মেথরের পাকাঘর। বাঙ্গালার চারিদিকে অতি পরিষ্কার

মোরমের রাস্তা! প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে উপরতলা হইতে ডাক্তার বাবুসহ অবতরণ করিয়া কোম্পানীর ডাক্তারখানাভিমুখে চলিলাম এবং তথায় উপস্থিত হইয়া ডাক্তারখানার ঔষধ ও অস্ত্রাদি বুঝিয়া লইলাম। কম্পাউণ্ডার আবদুল্লা খাঁ সাহেবের বাসা ডাক্তার-খানার সংলগ্ন; তথায় তিনি সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। ডাক্তার-খানার সকল ভার গ্রহণপূর্ব্বক আমরা উভয়ে অফিসে প্রত্যাগমন করতঃ অন্যান্য বিষয়ের চার্জ্জ লইয়া ডাক্তার বাবুকে অব্যাহতি দিলাম। তিনি জলযোগ সমাপনান্তে মধ্যাহ্নের যাত্রী-গাড়ীতে এলাহাবাদ গমন করিলেন।

ডাক্তার বাবু এলাহাবাদে রওনা হইবার পরে, খাঁ সাহেব সমভি-ব্যাহারে সাতনা সহর পরিদর্শন করিতে চলিলাম। ষ্টেশনের অল্প ব্যবধান দক্ষিণে রেওয়ার মহারাজের নূতন রাজপ্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হইল। এই বাটীতে মহারাজ শীতকালে অবস্থান করিয়া থাকেন। রাজপ্রাসাদের পশ্চিমে সাতনার শাসনকর্ত্তার এবং মুন্সেরিমের আদালত গৃহ; তৎসংলগ্ন জেলখানাও দৃষ্টিপথে পতিত হইল। শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী নামক একজন বাঙ্গালী সেখানকার শাসনকর্ত্তা। আমার কথ মত খাঁ সাহেব শাসন-কর্ত্তার এজলাসে আমাকে লইয়া উপস্থিত হইল। রাজকুমার বাবু আমাকে শিষ্টভাবে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার নিকটস্থ কাষ্ঠাসনে উপবেশন করাইলেন এবং অল্প সময়ের জন্য মোকর্দ্দমা স্থগিত রাখিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন। আলাপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম, ইনি একজন উচ্চ হৃদয়বান ভদ্রলোক। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণকরতঃ জেলখানা দেখিয়া মহারাজের প্রকাণ্ড হাঁসপাতাল দেখিয়া বাজারে প্রবেশ করিলাম। বাজারটি ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকায় পরিপূর্ণ। রাস্তাগুলি অতি সুন্দর; স্থানে স্থানে পথিকগণের জন্য মলমূত্র ত্যাগ করিবার পায়খানা স্থাপিত এবং

মধ্যে মধ্যে ইঁন্দারা প্রতিষ্ঠিত। বহু জনতাপূর্ণ বিপনী শ্রেণী বাজারের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। অন্যূন বিশ হাজার লোক এই সহরে বাস করিয়া থাকে। বিলাতী লবণ এ দেশে অব্যবহার্য্য; সকলই যেন পবিত্র ভাব। মৎস্য বাজারে অতি কম পাওয়া যায় কারণ এতদ্দেশীয় হিন্দু মাত্রেই তাহা অভক্ষ্য বলিয়া ব্যবহার করে না। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় রাস্তায় আলোকেরও ব্যবস্থা আছে।

মহারাজ সাহেবের অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে গমন করিয়া দেখিলাম, অনেক ছাত্র পাঠাভ্যাস করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু আশুতোষ ঘোষ মহাশয় আমাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটস্থ কাষ্ঠাসনে উপবেশন করাইয়া আলাপ পরিচয় করিলেন। তাঁহার জন্মস্থান ৺কাশিধাম এবং তৃতীয় শিক্ষক লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিবাসও ৺কাশিধামে। ইঁনিও অতি শিষ্টাচারে আমার সহিত আলাপ করিলেন। এই দুই জন বাঙ্গালী শিক্ষক মহারাজের বিদ্যালয়ে দেখিলাম। প্রথমোক্ত প্রধান শিক্ষক মহাশয় বি, এ, উপাধিধারী। ঐ দিবস আর অধিকক্ষণ থাকা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া নিজ বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। রেওয়ার মহারাজা নাবালক, বয়ঃক্রম ষোল বৎসর মাত্র। বাঘেনখণ্ড এজেন্সী সারজন ডাক্তার গিমলেট সাহেব তাঁহার শিক্ষক। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আর একজন দেশীয় শিক্ষকও ছিলেন। মহারাজা নাবালক বিধায় রেওয়া ষ্টেটের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট (পলিটিকাল্ এজেণ্ট) কর্ণেল বরার্টসন কার্য্য করিতেন। মহারাজ সাহেব সাতনা অবস্থান কালীন প্রতিদিন প্রাতে এবং অপরাহ্নে শরীর-রক্ষকসহ অশ্বযানে অথবা অশ্ব-শকটে সহরের রাজপথ দিয়া বায়ু সেবনার্থ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। মহারাজার গর্ভধারিনী ভিন্ন তিনটী বিমাতা ছিলেন; সাহেবদিগের বিনা অনুমতিতে পুত্রের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ করিবার সাধ্য ছিল না।

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস অধিকারী সাতনার মাল গুদামের বড় বাবু; লোকটী অতি অমায়িক ও সদালাপি। কয়েক বৎসর হইতে সপরিবারে এই ষ্টেশনে কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার বয়ঃক্রম আনুমানিক পঞ্চাশ বৎসর। শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন লাহিড়ী দুর্গাদাস বাবুর সহকারী; ইনিও সপরিবারে সাতনায় আছেন। এই ষ্টেশনে আরও দুই তিনটী বাঙ্গালী বাবু ছিলেন; সকল বাঙ্গালী বাবুই আমার আগমনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন সাতনায় আরও পাঁচ ছয় জন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী বাবু ছিলেন, ইহাদিগের মধ্যে বাবু রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পলিটিকেল এজেন্টের বড় বাবু এবং বাবু কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এজেন্সী সারজনের বড় বাবু। ইহাদিগের সহিত আমার বিশেষরূপ বন্ধুত্ব স্থাপন হয়। ইংরেজ পল্লির উত্তর দিকে ইংরেজ রাজের রোসানা অবস্থিত; তথায় একশত দেশীয় অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত, দিবা রাত্র ভেড়ির রবে আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিত। পূর্ব্বাংশে ইংরেজ রাজের এজেন্সী অফিস, জেলখানা এবং ইংরেজ সম্রাটের জয় পতাকা দণ্ডায়মান থাকিয়া মিত্র রাজার রাজ্যের মধ্যে সাম্রাজ্ঞীর জয় ঘোষনা করিতেছিল। এজেন্সীতেও একজন হিন্দুস্থানী পুরাতন ডাক্তার ছিলেন। মহারাজের হাঁসপাতালেও একজন হিন্দুস্থানী ডাক্তার বাবু থাকিতেন। সকল ডাক্তারখানায়ই ডাক্তার গিমলেট্ পরিদর্শক। কেবল রেলওয়ের ডাক্তারখানার উপর তাঁহার কোন আধিপত্য ছিল না। এই এজেন্সীর অধিনে পাঁচটী মিত্র রাজ্য ছিল; ঐ সকল রাজ্যের মামলা মোকর্দ্দমা প্রত্যেক রাজার কর্ম্মচারীগণ বিচার করিতেন। রেওয়া ভিন্ন অন্যান্য রাজ্যের ডাকাতি মোকর্দ্দমার বিচার পলিটিকেল সাহেবকেই সাতনায় করিতে হইত।

কম্পাউণ্ডার আবদুল্লা খাঁ কুড়ি টাকা বেতনে কার্য্য করিতেছিলেন। এই লোকটী আমার যথেষ্ট উপকারে আসিত। আমার অধীনে ডাক্তার

বাবুর একজন খাস আরদালি, একজন চৌকিদার এবং একজন মেথর কার্য্য করিত। প্রাতে সাত ঘটিকার সময়ে আমাকে প্রতিদিন ডাক্তার-খানায় যাইতে হইত এবং তথাকার কার্য্যান্তে সহরে বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিতাম। এই সকল বাঙ্গালী বাবুদিগের সহিত এতাদৃশ বন্ধুত্ব হইয়াছিল যে, যদি কোন কারণে আমি তাঁহাদিগের সহিত একদিন দেখা করিতে না পারিতাম, অমনি পরদিবস সহরের সকল বন্ধু বান্ধবগণ আমার বাঙ্গালায় আসিয়া খবর লইতেন। পরস্পরের মধ্যে মনের এক ঐক্যতা সূত্রে যেন গাঁথা ছিল। আমি ৭৫ মাইল লাইনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম সুতরাং পূর্ব্বদিকে মাকুণ্ডি এবং পশ্চিমদিকে ভাগলপুর ষ্টেশন; এই মোট সাতটী ষ্টেশন আমার এলাকাধীন ছিল।

সাতনা হইতে পূর্ব্বদিকে প্রথম ষ্টেশন জেতোয়ার; এই স্থানে খুব ফসল হইয়া থাকে। তৎপরের ষ্টেশনের নাম মাজগাঁও। ষ্টেশনটী পাহাড়ের গাত্রে সংলগ্ন; এই ষ্টেশনের জলবায়ূ বড়ই অস্বাস্থ্যকর কারণ এখানকার কূপের জলে এক প্রকার তৈলজ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত জল পান করিয়াই অনেকের শরীর অসুস্থ হইত সুতরাং এই ষ্টেশনে আমাকে অধিকাংশ সময়েই আসিতে হইত। ইহার পরের ষ্টেশন মাকুণ্ডি; এখান হইতে পদব্রজে পাঁচ ছয় মাইল দূরত্ব হইবে কিন্তু পার্ব্বতীয় রেল রাস্তা এত বক্র গতিতে এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে যে, উক্ত পাচ ছয় মাইলের পরিবর্ত্তে আঠার মাইল ব্যবধানে মাকুণ্ডি ষ্টেশন। ভয়ানক দুর্গম রাস্তা—কেবল পাহাড় জঙ্গল ভিন্ন এই আঠার মাইলের মধ্যে মনুষ্যের বাস নাই। মাকুণ্ডি ষ্টেশনের অতি নিকটে মার্কণ্ডেয় মুনির আশ্রম; আমি ঐ ষ্টেশনে রোগী দেখিতে যাইয়া ষ্টেশন মাষ্টারসহ ঐ পবিত্র স্থানে গমন করিয়া দেখিলাম একটি নির্ঝরিণীর এক কিনারায় একখানি মসৃন প্রস্তর এবং তাহা

অতি বিস্তৃত। চতুষ্পার্শ্বে অনেক পুষ্প বৃক্ষের শোভা এবং একটি গহ্বরে একটি মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। কিন্তু কোন্ দেবতার মূর্ত্তি ঠিক অনুমান করিতে পারিলাম না। তবে স্থানটী বড়ই পবিত্র বলিয়া বোধ হইল। কিম্বদন্তি আছে, এই প্রস্তরাসনে মহামুনি মার্কণ্ডেয় উপবেশন করিয়া ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, একটি নির্ঝরনীর তীরদেশে এই প্রস্তরাসন। সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম, নির্ঝরিনীর জল লালবর্ণ কিন্তু একটু ব্যবধানে আসিয়া দেখিলাম আর লালবর্ণ জল নাই, স্বাভাবিক বর্ণে পরিণত হইয়াছে। ইহার কারণ কিছুই আমরা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। এই মাকুণ্ডির উত্তরাংশে মধ্য-হিন্দুস্থান শেষ হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বান্দা জেলার সীমানা আরম্ভ হইয়াছে। এই ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার বাবু গোবিন্দচন্দ্র মিত্র; ইহাকে অধিকাংশ লোকে উন্মাদ বলিত কারণ বয়ঃক্রম অধিক হওয়া সত্বেও ইংরাজী লেখায় হাত পাকা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকিতেন। উন্মাদ বলিবার এই কারণটিই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ইনি কোন ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠ অভ্যাস করেন নাই; ঘরে বসিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিয়া একজন ষ্টেশন মাষ্টার পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। অতি সরল ভাবে ইংরাজী লিখিতে, পড়িতে এবং বলিতে পারেন। এখন পশ্চিম দিকস্থ ষ্টেশনগুলির বিষয় বলিব।

সাতনার পশ্চিমদিকের প্রথম ষ্টেশনের নাম উচেরা; এই ষ্টেশনের অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে নাগোদ রাজ্যের রাজধানী। এখানে একজন মিত্র রাজা সম্মানসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। ইহার দেওয়ান একজন ৺কাশি নিবাসী কায়স্থ ভদ্র সন্তান। দুই একবার ৺দুর্গাপূজার সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়া নাগোদ রাজধানীতে গমন করিয়াছিলাম। রাজবাটী একটী ছোট দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। রাজা বাহাদুর দিবারাত্র অহিফেনে তন্ময় হইয়া থাকেন। তিনি অপুত্রক; রাজ্যের আয় তিন চার লক্ষ

টাকা হইবে কিন্তু ঋণ দায়ে জড়িত। ইংরেজ রাজ তাঁহার সম্পত্তি নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া ঋণ শোধ করিতে মনস্থ করিতেছিলেন। এই উচেরা ষ্টেশনে প্যারীমোহন পালিত নামক একজন ভদ্র কায়স্থ বংশীয় ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন। ইহার সহকারি নটবর বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন কুলিন সন্তান কার্য্য করিতেন। ইহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব থাকায় অনেক সময়ে উচেরা যাইতে হইত। নাগোদের রাজার পিতা সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজ রাজাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহারও অনেক ক্ষমতা আছে তবে প্রাণদণ্ড এবং বলাৎকার প্রভৃতি অপরাধের বিচার পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেব করিয়া থাকেন। একদিন আমি সন্ধ্যার গাড়ীতে ভাদনপুর ও মাইহারা ষ্টেশনে যাইতেছিলাম, দেখিলাম—উচেরা ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য। নাগোদের রাজা প্লাটফরমে বনাৎ বিছাইয়া বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক প্রায় শতাধিক সৈন্য এবং ইংরাজী বাজানা সমভিব্যহারে পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেবের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। যখন গাড়ীখানি তথায় উপস্থিত হইল, তখন সূর্য্যদেব অস্তাচলে আরূঢ় হইয়াছেন। যে গাড়ীতে আমি যাইতেছিলাম ঐ গাড়ীতেই এজেণ্ট সাহেব ছিলেন: তিনি উচেরায় অবতরণ করিবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে দেশীয় এবং ইংলণ্ড দেশীয় বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক বন্দুকের ধ্বনি এবং চতুর্দ্দিকে আলোক মালায় পরিশোভিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। শুনিলাম, ঐ আলোক রাজবাটী পর্য্যন্ত রাজপথের দুই পার্শ্বে সন্নিবেশিত ছিল। রাজাবাহাদুর অগ্রবর্ত্তী হইয়া সর্দ্দারগণ সহ সাহেব বাহাদুরকে সম্ভাষণ করিলেন; সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সাহেব বাহাদুর শিকারে আসিয়াছেন, এইজন্য এত সমাদর। এজেণ্ট সাহেবগণ মিত্র রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, ইহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি।

এই উচেরা ষ্টেশনের পশ্চিমে মাইহারা ষ্টেশন। এখানেও এক মিত্র

রাজ্যের রাজধানী। এই রাজধানীতে একজন যোগী রাজা রাজত্ব করেন; ইনি ব্রাহ্মণকে বড়ই সম্মান করিয়া থাকেন। ইহার পিতাঠাকুর মহাশয় সিপাহী যুদ্ধের সময় ইংরেজ রাজকে সৈন্য দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজার বাৎসরিক আয়ও তিন চার লক্ষ টাকা হইবে। ইহার রাজধানী মাইহারা—সহরটি অতি সুন্দর; চতুর্দ্দিকে জলাশয়, তৎপরেই চতুর্দ্দিকে দুর্গের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। একটি মাত্র সিংহদ্বার; রাত্রি নয় ঘটিকার সময়ে ঐ সিংহদ্বার প্রতিদিন বন্ধ করা হয়। এই দুর্গের ভিতরে সহর, বাজার, রাজবাটী, পুষ্করিণী, আদালত, ও জেলখানা স্থাপিত। সিংহদ্বার হইতে একটি প্রকাণ্ড পাকা রাজপথ প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তরাভিমুখে গমন করিয়াছে। উচেরার রাজবাটী অপেক্ষা এই রাজবাটীটি মনোহর। আমি কয়েকবার রাজমন্ত্রী অথবা দেওয়ান (বঙ্গদেশীয় সদ্গোপ জাতীয় একটি অধিক বয়স্ক বাঙ্গালী বাবু)কে এবং তাঁহার পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য তথায় গিয়াছিলাম। মাইহারা ষ্টেশনে সুসজ্জিত পাল্কী এবং শোয়ার আমার জন্য অপেক্ষা করিত। আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া উক্ত রাজধানীতে গমন করিতাম। ঐ রাজধানীর ডাক্তার বাবুটী হিন্দুস্থানী বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক আমাকেই অনেক সময়ে চিকিৎসা করিতে তথায় যাইতে হইত। এই মাইহারা ষ্টেশনের দুই ক্রোশ ব্যবধানে একটি পাহাড়ের উপরে স্থাপিত ৺সারদা মায়ীর মন্দির। তিনশত সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া মহামায়ার পাদপদ্ম দর্শন করিতে হয়। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার দর্শন লাভ হয় নাই। মনে করিয়াছিলাম, রেলের চাক্‌রী চিরস্থায়ী, যে কোন সময়ে দর্শন করিলেই হইবে কিন্তু তিন বৎসর পরেই যখন স্থান ত্যাগ করিতে হইল, তখন আর মহামায়ার দর্শন লাভ ঘটিল না। এই মাইহারা ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার একজন ভদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ, নাম হরিদাস

বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়, এমন কি সাতনায় যাইয়া তিন চার মাসের মধ্যেই ইহার সাহায্যে পরিবার লইয়া আসি। ইহার সহকারী রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় অতি ভদ্র লোক। ঐ সময়ে আমার প্রথম পুত্র নিলু ওরফে শ্রীমান জ্যোতির্ষ চন্দ্রের বয়ঃক্রম এক বৎসর দুই মাস।

ইহার পশ্চিমের ষ্টেশনটীর নাম ভাদনপুর; অতি ক্ষুদ্র ষ্টেশন। এখানকার ষ্টেশনমাষ্টার কালীপ্রসন্ন বাবু অতি অমায়িক ভদ্রলোক। এই ষ্টেশনে ডাকগাড়ী জল লইয়া থাকে। এ স্থান সম্বন্ধে লিখিবার কিছুই নাই; কেবল ময়দান ধূ ধূ করিতেছে মাত্র। প্রতিদিনই আমাকে মফঃস্বলে কোন না কোন দিকে যাইতে হইত সুতরাং জামালপুর হইতে পরিবার আনিয়া বাস করিতে লাগিলাম এবং প্রায়ই সাতনায় প্রত্যাগমন করিতাম কারণ সাতনায় অনেকগুলি সাহেব সপরিবারে বাস করিতেন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ না কেহ প্রায়ই পীড়িত থাকিতেন। অনেকগুলি গাড়ীর গার্ড এবং ড্রাইভার সাহেবগণ তথায় বাস করিতেন এবং বোম্বাই ডাকগাড়ীর ইঞ্জিন এবং গার্ড সাহেব এই ষ্টেশনেই বদল হইত। এখানকার জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। সাহেব ও মেমগণ আমাকে যথেষ্ট খাতির করিতেন এবং নিকটবর্ত্তী সাহেব বাঙ্গালার মেম সকল আমার বাসায় আসিয়া আমার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। আমার নব-কুমার সাহেব পল্লীর প্রায় সকলেরই অতি আদরের হইয়াছিল; এমন কি আমার খাস আরদালি তাহার ভার লইয়াছিল। প্রতিদিন সাহেবদিগের আদেশমত নিলুকে সাহেবদিগের কুটিতে লইয়া যাইত। যদি কোন দিন ভুল বশতঃ বা কার্য্য বশতঃ লইয়া যাইতে না পারিত তবে মেম ও সাহেবেরা দুঃখ প্রকাশ করিতেন।

বৎসরান্তে আমি স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর সপিণ্ডকরণ কার্য্য তথায় সমাধা করিবার জন্য বন্ধুগণের পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। সকলেই উৎসুক হইয়া ঐ কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে বলিলে, আমি তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করিয়া এলাহাবাদ হইতে বাঙ্গালী পুরোহিত আনয়ন করতঃ উক্ত কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন করিলাম। এই ইংরেজ পল্লীতে আর কোন বাঙ্গালী বাবু ছিলেন না; কেবলমাত্র লোকো ফোরম্যান সাহেবের কেরানী বাবু পরাণচন্দ্র বসু মহাশয় সপরিবারে থাকিতেন। তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়ায় বড়ই সুখী হইয়াছিলাম এবং তিনিও আমাকে ইংরেজ পল্লীতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। আমি প্রায় প্রতি সন্ধ্যার সময়ে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় সকল বাবু সহ সমবেত হইতাম এবং নানা প্রকার সদালোচনা করিয়া রাত্রি নয়টার সময়ে বাঙ্গালায় আসিতাম। এখানে জিনিষ-পত্র অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত। ঘৃত ও দুগ্ধ অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত। যাহা হউক, অতি অল্প দিবসের মধ্যেই শরীর সম্পূর্ণ বলবান হইল এবং শরীরের ভার বৃদ্ধি পাইয়া স্থূলাকায় হইলাম। এক বৎসর পরে ৺দুর্গা পূজার সময়ে সপরিবারে যখন দেশে গমন করি তখন আমার শরীরের পরিবর্ত্তনে অনেকেই আমাকে চিনিতে পারে নাই। প্রায় অধিকাংশ দিনই সন্ধ্যার সময়ে পরাণবাবু এবং আমি আপন আপন যন্ত্র লইয়া আমার বাঙ্গালার নিম্নতলের বারাণ্ডায় ঐক্যতান বাদন করিয়া বিমল আনন্দানুভব করিতাম। আমার তৎকালীন এস্রাজ বাদ্য-যন্ত্র ছিল এবং পরাণবাবু বেহালায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আমরা দুইজনে এই আমোদে মত্ত হইয়া রাত্রি নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত সুখানুভব করিয়া আপন আপন ভবনে গমন করিতাম। এবং সময়ে সময়ে সহরের বাবুগণ তাঁহাদিগের হারমোনিয়াম, ক্লারিওনেট্ যন্ত্র আনিয়া আমাদিগের সহিত ঐক্যতান বাদন করিতেন।

গ্রীষ্মকালে এদেশে প্রাতে নয় ঘটিকা হইতে রাত্র নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত ভয়ানক গরম হাওয়া প্রবল বেগে বহিতে থাকে। বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ দিবাভাগে যদি কাহারও বাটীর বাহিরে যাইতে হইত তবে মস্তকে ও কর্ণদেশে কাপড় বন্ধন করিয়া যাইতে হইত, নচেৎ লূ সংস্পর্শে ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। কয়েকজন নীচ জাতীয় লোককে এই লূ লাগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছি। সুবিধার জন্য আমাদিগের ডাক্তার সাহেবকে খস্ খস্ টাট্টির জন্য লিখায়, তিনি দয়া করিয়া কয়েকখানি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ব নিয়ম অনুসারে টানা পাখাও অফিসে এবং শয়ন কক্ষে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। নিজ অধীনস্থ লোক দ্বারা পাখা টানাইতে হইত। অফিসে উল্লিখিত খস্ খসের টাট্টি দিয়া জল দেওয়া হইত, তাহাতে অফিস কামরা অতিশয় শীতল থাকিত। মুল কথা অনেক বিষয়ে সাতনার চাকুরী সুখজনক হইয়াছিল। ডাক্তারি পাশ করিয়া রেলের ডাক্তারের পদ গ্রহণ করিতে বড়ই উদ্‌গ্রীব ছিলাম কারণ গাড়ীতে গাড়ীতে বেড়াইয়া কতই সুখানুভব করিব এইটী মনে করিতাম। চাকুরী প্রাপ্ত হইয়া যখন দিবারাত্র গাড়ীতে ঘুরিতে হইত তখন পূর্ব্ব চৈতন্য জাগরূক হইত, তখন মনে মনে কত আক্ষেপ করিতাম যে এ চাকুরী যেন কোন শত্রুও না করে কারণ দিবা রাত্র গাড়ীতে গাড়ীতে থাকায় মনে নরক যন্ত্রণা সদৃশ অনুভব হইত। সাতনার ষ্টেশন মাষ্টার ডাঙ্কান্ সাহেব অতি ভদ্র ইংরেজ; আমাকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। গার্ড সাহেবদিগকে বলিয়া আমার সীমানার মধ্যে আমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করিতে ভূয়ঃ ভূয়ঃ অনুরোধ করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিতাম। অবশ্য আমি মধ্যম শ্রেণীর সম্মাযিক পাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। চালক এবং রক্ষক সাহেবগণও আমাকে বারম্বার দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতে অনুরোধ করিতেন। আমার

সুবিধার জন্য হয়তো কোন কোন দিন বোম্বাই ডাকগাড়ীতে মাকুণ্ডি ষ্টেশনে যাইতে হইত অথচ তথায় ডাক গাড়ী থামে না। আমার সুবিধার জন্য ডাকগাড়ীর চালক ও রক্ষক গাড়ী লাগাইয়া আমাকে অবতরণ করাইয়া চলিয়া যাইত; তাহার কারণ সকলেই আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। সাতনায় সাহেবদিগের বাঙ্গালায় গমন করিলে, সাহেব ও মেমগণ আমাকে বিশেষ সম্মান পূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া তৎপরে আপন আসনে উপবেশন করিতেন। মেম ও সাহেবগণ সময়ে সময়ে আমাকে অর্থ দ্বারা মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। রেলওয়ের লাইব্রেরীতে সাহেবগণ পরামর্শ করিয়া আমাকে অবৈতনিক সভ্যরূপে নিযুক্ত করিলেন। আমি বক মধ্যে হংসরূপে শোভিত হইতাম। অবসর কালে অধিকাংশ সময়ে সাতনায় লোকো ফোরম্যান ইয়ং সাহেবের বাঙ্গালায় নানা প্রকার গল্প করিয়া সময় কাটাইতাম। সাহেবটী বিশেষ ভদ্র এবং বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপে কথোপকথন করিতে পারিতেন। এই সাহেবের দুইটি অবিবাহিতা যুবতী কন্যা অনেক সময়ে আমার স্ত্রীকে দেখিতে যাইতেন; তাঁহাদিগের বাঙ্গালায় আমি গমন করিলে আমার সহিত তাঁহারা বন্ধুচিতভাবে আলাপ করিতেন। যদি কোন দিন যাইবার সুযোগ না ঘটিত তবে সাহেবের কন্যাদ্বয় বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতেন।

হাইও হক্ নামক একজন বিলাতী ইংরাজ ডাকগাড়ীর চালক; ইনি অতিশয় সুরাপায়ী ছিলেন, তবে লোকটি বড়ই আমোদপ্রিয়। ইনি লণ্ডন নগরের একটি যুবতীকে বিবাহ করিয়া এখানে আনয়ন করেন এই সাহেবটি আমার বাঙ্গালার অতি নিকটেই সপরিবারে বাস করিতেন। সময়ে সময়ে বিবাহিতা মেমটিকে বোতল প্রভৃতির দ্বারা তিনি, প্রহার করিতেন। মেম সাহেব আমার নিকট স্বামীর যথোচিত কুৎসা করিয়া বলিতেন,—দেশে চলিয়া যাইব, এরূপ স্বামীর

সহবাসে কালাতিপাত করিব না। প্রকৃতপক্ষে কয়েক মাসের মধ্যেই মেম বিলাতে চলিয়া গেলেন এবং বোর্ড হইতে মাসহারার টাকা কর্ত্তন করিয়া লইতে লাগিলেন। এদিকে সাহেব মনদুঃখে এক দিবস আপন বস্ত্রে অগ্নি সংযোগ করিয়া সাংঘাতিকরূপে দগ্ধ হন। প্রথমতঃ আমি এবং বাঘেনখণ্ড এজেন্সীর ডাক্তার গিমনেট্‌ উভয়ে রোগীকে দেখিতাম; পরে আমাদিগের সাহেব সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে এলাহাবাদ চিকিৎসালয়ে লইয়া যান এবং কিছুদিন পরে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরার দিবস সাতনার পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে তামসী নদীতে আমরা ছয় সাত জন বন্ধু একা-যানে স্নান করিতে গমন করি। স্নান অন্তে নদীর বিপরীত পারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নাবালক মহারাজের খুল্লতাত মহাশয়ের দুর্গ অতি সুন্দররূপে শোভা বিস্তার করিতেছে। নদীর নিম্নতল হইতে দুর্গ প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। আমরা সকলে দুর্গের অধিশ্বরী মহারাজের খুড়িমাতাঠাকুরাণীর অনুরোধে তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক পুরাকালিন দুর্গের কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাটী তন্মধ্যে রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই দুর্গে বর্ত্তমান মহারাজ জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গের অধিশ্বরী আমাদিগের জন্য তথাকার বিখ্যাত তরমুজ ও অন্যান্য ফল মুল, মিষ্টান্ন প্রেরণ করেন। আমরা তাহা পরিতোষের সহিত জলপান করিয়া অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময়ে সাতনাভিমুখে যাত্রা করিলাম এবং যথা সময়ে সাতনায় পৌছিলাম।

পান্না রাজ্য বুন্দেলখণ্ড প্রদেশের অন্তর্গত; সাতনা হইতে ঐ রাজ্য অধিক দূর নহে। উক্ত রাজার আয় তিরিশ লক্ষ টাকা; তথায় অনেক বহুমূল্য প্রস্তর পাওয়া যায়। ঐ রাজার ডাক্তার বাবু এসিষ্টেন্ট সারজেন; আমার বাসায় মধ্যে মধ্যে আসিতেন। এক সময়ে রেওয়ার

মহারাজের জন্মদিন উপলক্ষে রাজ বাটীতে পার্শি থিয়েটার হয়। আমরা সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় দেখিতে গমন করি। এই জন্মদিনে পলিটিকেল এজেণ্ট রাজ প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার বক্তৃতা করেন। দরবার শেষে তোপ-ধ্বনি দ্বারা সম্মান রক্ষা হয়। এই সময়ে নাচ, তামাসা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদিতে বহু টাকা নষ্ট হইয়া থাকে। শ্বেত-পুরুষদিগের আহারেও কতকগুলি টাকা এইরূপ ভাবে নিঃশেষ হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে জব অঙ্কুর হইলে দেশের রীতি অনুসারে মহারাজা প্রায় তিন চার হাজার পদাতিক, অশ্বারোহী সৈন্য, হস্তি, ঘোড়া এবং উষ্ট্র সজ্জিত করিয়া স্বর্ণ সিংহাসনে দুই মাইল ব্যবধানস্থ একটী পুষ্করিণীতে গমন করেন; তথায় খেজুরা পর্ব্ব সম্পূর্ণ করতঃ নানাবিধ আলোক মালায় সুশোভিত হইয়া সহরে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে মহারাজার সাজ সজ্জা দৃষ্টি করিলে, পূর্ব্বতন হিন্দু স্বাধীন রাজাদিগের কথা স্মরণপথে উদিত হয়। এখানে দোলযাত্রা এবং ৺কালীপূজার সময়ে খুব আমোদ প্রমোদ পূর্ব্বক সমারোহ হইয়া থাকে। আমার সাতনা থাকিবার প্রথম বৎসরের শীতকালে বাঙ্গালী বাবুদিগের তত্ত্বাবধানে শ্রীকৃষ্ণদেবের রাসযাত্রা ধুমধামে সম্পন্ন হয়। এই বারোয়ারিতে সাহেব পাঁচ শত টাকা প্রদান করেন। পলিটিকেল এজেণ্ট বাহাদুর নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন; তাঁহাকে ইংরাজী এবং হিন্দিতে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়। প্রথম বৎসর আমাকে মহারাজ সাহেবের অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয়ের সভ্য পদে বরণ করেন কিন্তু আমার অবসর বড় অল্প থাকায় উক্ত কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সাতনায় আমাকে অনেক বিষয়ে কার্য্য করিতে হইত অর্থাৎ জল হাওয়ার দৈনিক রিপোর্ট, স্বাস্থ্য রক্ষকের কার্য্য এবং টিকা দেওয়ার পরিদর্শকের কার্য্য করিতে হইত। মোট কথা একজন কেরানীর ন্যায় প্রতিদিন লেখা পড়ার কার্য্য করিতে হইত। চিকিৎসা

বিভাগের খরচ কম দেখাইবার জন্য আমার কম্পাউণ্ডার আবদুল্লা খাঁর চাকুরী যায়। সাতনার সকল সাহেব, হিন্দুস্থানী এবং বাঙ্গালীবাবুগণ তাহার অবস্থিতির জন্য আবেদন করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আমি ডাক্তারখানা বাঙ্গালার নিম্নে আনিলাম এবং আমাকেই ঔষধাদি তৈয়ারী করিয়া দিতে হইত। কোন সাহেব আমার কার্য্য শৈথিল্যতার জন্য আমার বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে পারেন নাই। আমার সময়ে অনেকগুলি কঠিন পীড়া আরোগ্য হয় তজ্জন্য আমাকে সকল সাহেব ও মেম বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এই সময়ে এই রেলওয়ের প্রধান ডাক্তার গ্রিফিথ সাহেব এই নিয়ম করেন যে, নেটিভ ডাক্তার এবং এসিস্‌টেণ্ট সারজনকে প্রধান ডাক্তার সাহেবের নিকট বৎসরে দুইবার পরীক্ষা দিতে হইবে। উক্ত নিয়মানুসারে ডাক্তার সাহেব আমাকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। আমি প্রথমতঃ শম্পূর্ণ অস্বীকার করি; তাহাতে আমার প্রতি তিনি রাগান্বিত হয়েন।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমার বেতন বৃদ্ধির সময় উপস্থিত হয়। এজেণ্ট পূর্ব্ব নিয়ম অনুসারে আমার পাঁচ টাকা বৃদ্ধি মঞ্জুর করেন কিন্তু ডাক্তার গ্রিফিথ সাহেব তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং লিখিলেন "যে পর্য্যন্ত আমি পুনরায় এই বিষয় অনুমোদন না করিব, সে পর্য্যন্ত ইহা বন্ধ থাকুক।" আমি অনেক বার বেতন বৃদ্ধির কথা বলি কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। এই ঘটনায় মনে ভয়ানক ঘৃণা হওয়ায় কার্য্য ত্যাগ করাই স্থির করিলাম। কিছু দিবস পরে ফলিয়ার সাহেব নামক একজন ডাক-গাড়ীর চালকের বাটীতে তাঁহার স্ত্রীকে দেখিতে গমন করি। একটি বিলাতী কুকুর আমার পায়জামার উপর দংশন করে। দংশিত স্থানে নানা প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করি এবং শ্বশুর মহাশয়কে ইহা জানাইলে তিনি গোঁদলপাড়া হইতে ঔষধ আনাইয়া পাঠাইয়া দেন। ইহার দুই দিবস পরে ডাক্তার

গ্রিফিথ সাহেব পরিদর্শন করিতে সাতনায় উপস্থিত। সাহেবের সহিত নানা কার্য্য পরিদর্শন করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়া আহারান্তে সাহেবের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে যাই। ঐ দিন সাহেবের মেজাজ ভাল বিবেচনা করিয়া আমার বেতন বৃদ্ধির জন্য এজেণ্ট সাহেবকে সুপারিশ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। সাহেব তাঁহার মেমের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক আমাকে আবেদন করিতে অনুমতি করিয়া রাত্রের গাড়ীতে এলাহাবাদ গমন করেন। ইহাতে মনে কিয়ৎ পরিমাণে আশার সঞ্চার হইয়া পর দিবস বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিলাম। আমার পত্র তাঁহার হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই আমাকে লিখিয়া পাঠান যে, ১লা সেপ্টেম্বর হইতে তোমাকে অস্থায়ীভাবে এলাহাবাদে বদলি করা হইল।" আমি পত্র পাইয়া অবাক হইয়া সাতনার সকল বন্ধু-বান্ধবকে কহিলাম, "এলাহাবাদেই আমার কার্য্যের শেষ হইবে, সেই মতলবেই আমাকে এলাহাবাদে বদলি করিয়াছেন।" পাঠক! এ ঘটনার ছয় মাস পূর্ব্ব হইতেই কোন এক আশ্চর্য্য ঘটনায় আমার মন দোলায়মান থাকিত। সেই ঘটনার বিষয় পরে লিখিব।

এলাহাবাদে

আমি এলাহাবাদে পৌছিলে সাহেব আমাকে জব্দ করিবার জন্য নানারূপ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। মন অশান্তিতে অহরহ নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি আমায় কহিলেন,—"কলিকাতা হইতে সেক্রেটারী সাহেব কল্য এখানে আসিয়া পৌছিবেন, তাঁহার সমক্ষে তোমায় পরীক্ষা করিব; বিবেচনা হয় তখন বেতন বৃদ্ধি করা যাইবে, নচেৎ বেতন বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ থাকিবে। ইহাতে আমি এলাহাবাদের প্রধান হেডক্লার্কের আমার পরিচিত বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া মনে মনে এই স্থির করিলাম যে,—সেক্রেটারীর সম্মুখে আমাকে অনর্থক

অপমান এবং আমি যে এ কাজে সম্পূর্ণ অযোগ্য ইহা সহজেই প্রমাণ করাইবার পূর্ব্বে আমার এই কার্য্য পরিত্যাগ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সাতনা হইতে, এখানে আসিবার দুই তিন মাস পূর্ব্বে পরিবারবর্গকে জামালপুরে পাঠাইয়াছিলাম কারণ স্ত্রী তখন সন্তান সম্ভাবিতা ছিলেন। এখন এলাহাবাদে এই পরামর্শ আঁটিয়া শ্বশুর মহাশয়কে এই ভাবে তারে সংবাদ দেওয়া স্থির করিলাম যে, আমার স্ত্রী ভয়ানক পীড়িতা তিনি যেন আমায় এইরূপ ভাবে জামালপুর যাইতে তার করেন"। ইহা ভিন্ন পরীক্ষা হইতে অব্যাহতির আর কোন উপায় নাই। এই স্থির করিয়া রাত্রি নয় ঘটিকার সময়ে শ্বশুর মহাশয়কে তারে সংবাদ দিলাম। তিনি তারের মর্ম্মানুসারে পুনরায় আমাকে তার করেন যে,—"তোমার স্ত্রী ভয়ানক পীড়িতা, তুমি প্রথম গাড়ীতেই চলিয়া আইস"। তার প্রাপ্ত হইয়া হাসপাতালে প্রেরণ করি যে,—আমি পদ বেদনায় কাতর, উপরন্তু তারে সংবাদ পাইয়াছি যে, জামালপুরে আমার স্ত্রী সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত। সুতরাং আমি হাঁসপাতালে যাইতে অপারগ। ডাক্তার সাহেব হাঁসপাতাল পরিদর্শনে আসিয়া যখন এই সংবাদ প্রাপ্ত হন, তখন আমার প্রতি ভয়ানক কুপিত হইয়া ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি অতি কষ্টে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করতঃ কার্য্যে অপারগ প্রকাশ এবং তারের সংবাদ সাহেবের নিকট দিয়া বিদায় প্রার্থনা করিয়া কহিলাম,—"কিছুতেই কার্য্য করিতে পারিব না, তোমার যাহা খুসী কর।" যদি মঞ্জুর না কর তবে ইহাই আমার কার্য্যত্যাগের আবেদন পত্র হইবে এইরূপ ভাবে জানাইলাম। তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন—বিদায় দিবও না। জামালপুরের ডাক্তার ব্রুক সাহেবকে বিস্তৃত এক তারে সংবাদ জানিয়া পাঠাইলেন যে,—"আমার স্ত্রী ঠিক পীড়িতা কি না? উত্তর যেন সত্বর এলাহাবাদে পাঠান হয়।" আমি অপরাহ্নে সাহেবের বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়া ইস্তফা পত্র

প্রদান করি। তাহার মর্ম্ম এইরূপ "আমার শরীর অসুস্থ ওদিকে পরিবার সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত; এই সংবাদে মন বড়ই অশান্তিতে ভাসিতেছে সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমার দ্বারা কোম্পানীর কার্য্য হওয়া একান্ত অসম্ভব। অতএব আমার ইস্তফা মঞ্জুর করা হউক। যদি ছুটি পাইতাম তাহা হইলে সম্ভবতঃ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইত না।" পর দিবস প্রাতে কলিকাতার সেক্রেটারীসহ ডাক্তার সাহেব হাঁসপাতালে উপস্থিত হইয়া আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি লাঠির উপর ভর দিয়া অতি কষ্টে তথায় উপস্থিত হইলাম। আমাকে সেক্রেটারী সাহেব কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমিও যথাযথ উত্তর প্রদান করিলাম। ডাক্তার সাহেব কহিলেন—"ইনিই সাতনার ডাক্তার; গতকল্য ইস্তফা পত্র দিয়াছেন; আমি তাঁহার ইস্তফা মঞ্জুর করিয়াছি।" আমি সেক্রেটারীর নিকট হইতে কয়েক দিবসের বিদায় প্রার্থনা করায় মঞ্জুর হইল। কলিকাতা হইতে যাতায়াতে পাস পাইলে আট দিনের জন্য জামালপুর গমন করিলাম। আমার আত্মীয় স্বজন সকল বিষয় শ্রুত হইয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। আমি জামালপুর হইতে কলিকাতায় যাইয়া সেক্রেটারী সাহেবেব সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। ঐ সাহেব বলিলেন,—"যখন গ্রিফিথ সাহেব তোমার উপর কুপিত এবং তুমি কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছ, তখন কোন উপায় নাই। আমরা যদি অন্যত্রও তোমাকে নিযুক্ত করি, তবেও ঐ সাহেব তোমার প্রতি অত্যাচার করিয়া তোমার চাকুরী নষ্ট করিবে। যেহেতু তিনি ডাক্তার বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা। যথা সময়ে জামালপুরে আসিয়া আমার নামীয় একখানি পত্রে ডাক্তার গ্রিফিথ লিখিয়াছেন,—"তোমার ইস্তফা এজেন্ট সাহেব মঞ্জুর করিয়াছেন সুতরাং এক মাসের বিজ্ঞাপনে তোমাকে কার্য্য করিয়া একেবারে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে।" এরূপ ভারের পত্র পাইয়া যথা সময়ে এলাহাবাদ পৌঁছিলাম এবং

তথায় এক দিবস অপেক্ষা করিয়া পুনর্বায় সাতনায় এক মাসের জন্য চলিলাম।

সাতনায় যাইয়া মহাদুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলাম। এতদিন পরে মনে পরিতাপের আবির্ভাব হইল। হায় হায়! কি করিয়াছি! কেন, ইস্তফা দিলাম? যে কার্য্য গ্রহণ করিবার জন্য কলিকাতার বড় বাবুকে একশত টাকা পর্য্যন্ত পূজা দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম—যে কার্য্যের জন্য কলিকাতা হইতে গ্রিফিথ্ সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলাম, যে কার্য্যের জন্য মাতৃবিয়োগ অবস্থায় শোক-বস্ত্র পরিধান করিয়া কত লোকের উপহাসাস্পদ হইয়া কার্য্য লইয়া আগমন করিলাম, সেই দুঃখের চাকুরী কিনা সামান্য কারণে পরিত্যাগ করিলাম। আমার অদৃষ্টে কত দুঃখ আছে ভগবানই জানেন।

প্লাঞ্চেট কাহিনী

১৮৯৩ সালের জুন মাসে একদিন আমি রোগী দেখিতে মাকুন্দি ষ্টেশনে গমন করি। তথাকার ষ্টেশন মাষ্টার কালিবাবু আমার হস্তে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রদান করিয়া বলিলেন—"দেখুন, ডাক্তার বাবু! প্লাঞ্চেট নামক এক প্রকার ভৌতিক-যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে মন সংযম করিয়া কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে হস্তস্থিত পেন্সিল দ্বারা নিম্নস্থিত কাগজে উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অতি অদ্ভুত নহে কি? আমি প্রথমে ইহা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম এবং বলিলাম,—ইহা অসম্ভব কারণ কাষ্ঠ-ফলক আপনি চলিয়া নিম্নস্থিত কাগজে কি প্রকারে উত্তর প্রদান করিবে। যাহা হউক, কাগজখানি লইয়া সাতনায় যাইয়া বন্ধু বান্ধবগণকে দেখাইলাম। তাঁহারাও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিলেন কিন্তু আমার অনুরোধে দুই তিন জন একত্রিত হইয়া কলিকাতায় একটি প্লাঞ্চেটের জন্য লিখিলাম। যথা সময়ে

আমরা ইহা প্রাপ্ত হইয়া প্রথম দিবস তিন চার জন বন্ধু একত্রিত হইয়া কালীবাবুর বৈঠকখানায় ঐ যন্ত্র ধরিলাম। টেবিলের উপর কাগজ রক্ষা করিয়া আমরা চার জন কাষ্ঠ-ফলকের উপর হস্ত লাগাইয়া বসিয়া রহিলাম; অল্পক্ষণ পরে কাষ্ঠ চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে প্রশ্নকারী বাবুগণ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলে সংক্ষেপে তাহাদের উত্তর হইতে লাগিল। ঐ দিবস মহারাজা নন্দকুমার রায়ের আত্মার আবির্ভাব হয়। কতক উত্তর ঠিক কতক বা মিথ্যা হইতে লাগিল এমন কি অবশেষে কাগজে নানাপ্রকার গালি লিখিতে লাগিল। অনেকের অল্প অল্প বিশ্বাস হইল, আবার অনেকের ধারণা হইল আমরা হস্তের সাহায্যে লিখিয়া উত্তর দিতেছি। এক ঘণ্টা পরে আমরা স্ব স্ব বাস ভবনে চলিয়া গেলাম। তৎপর দিবস পুনরায় ধরা হইল ঐ দিবস আরও স্পষ্ট অভাবনীয়ভাবে উত্তর হইতে লাগিল। একজন ওভারসিয়ার বাবু (অপরিচিত ভদ্রলোক) তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি কয়েকটী প্রশ্ন করেন ; তাহার যথার্থ উত্তর পাইয়াছিলেন। ইহাতেও অনেকের ততদূর বিশ্বাস হইল না বরং কেহ কেহ বলিলেন অনর্থক অর্থব্যয় করিয়া এই যন্ত্র আনা গর্হিত হইয়াছে। আমি ভাব গতিক বুঝিয়া ঐ যন্ত্রটী খরিদ করিয়া আপন করিয়া লইলাম।

সাতনার কেলনার কোম্পানীর ম্যানেজার ম্যাকভিকার সাহেবের সহিত আমার সৌহৃদ্যতা হইয়াছিল। ইনি সম্প্রতি স্কটল্যাণ্ড হইতে আসিয়াছেন ; ইতি একজন স্প্রিচুয়ালিষ্ট। ইনি আমাকে বলিলেন,—জিনিষ ভাল, তুমি নিজে গোপনে গোপনে অভ্যাস করিতে আরম্ভ কর, কখনও পশ্চাৎপদ হইও না। পরে তুমি মিডিয়াম হইয়া এই যন্ত্রের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া মোহিত হইবে। তাঁহার এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রতিদিন রাত্রে ইহার অভ্যাস করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনই ফল উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। উপরোক্ত সাহেবও

মধ্যে মধ্যে আমার নিম্নতলস্থ অফিসে আসিয়া উক্ত যন্ত্র ধরিতেন কিন্তু তিনি বেশ ফল পাইতে লাগিলেন। সাতনায় সকল বাবুই আমার এই যন্ত্র সম্বন্ধে নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মন তাহাতে শিথিল হইল না।

প্রথম দিবস আমি ও রাজার স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য প্লাঞ্চেট ধরি; হঠাৎ আশ্চর্য্য ও অভাবনীয়রূপে গাজিপুরের সুবিক্ষ্যাত মৃত উকিল বাবু শিবনানক সিং মহাশয়ের আত্মা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বা লক্ষ্মী বাবু ঐ আত্মার বিষয় কিছুই অবগত ছিলাম না এমন কি আমি গাজিপুর গমনও করি নাই। আমি প্রথমে অবিশ্বাস করিলে ঐ আত্মা কহিলেন—সাত আট বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বসন্ত ব্যাধিতে দেহত্যাগ হইয়াছে। সাতনার হরপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের শ্বশুরালয় গাজিপুর, তাঁহার নিকট হইতে সঠিক সংবাদ পত্রের দ্বারা জ্ঞাত হইলাম। উক্ত উকিল আট বৎসর পূর্ব্বে বসন্ত ব্যাধিতে মারা যান।

দ্বিতীয় দিবস—গভীর রাত্রে আমি যখন একাকী ঐ যন্ত্র ধরিয়াছিলাম, তখন রামহরি বিদ্যালঙ্কারের আত্মা আবির্ভাব হন; তিনি ক্রমে ক্রমে সকল সংবাদ বলিলেন। ২৪ পরগনা জেলার অধিনে জঙ্গল গ্রামে তাঁহার জন্ম ৺কাশিতে বিসূচিকা ব্যাধিতে দেহ নষ্ট হইয়াছে। সাতনার মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত হইয়া জানিলাম, উত্তর ঠিক হইয়াছে। এইরূপ নানাপ্রকার প্রশ্নের উত্তরে এই যন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু অপরাপর বন্ধুগণের অবিশ্বাস অটল রহিল। আমার ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মধ্যে ইহা যে একটী আশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ রহস্য তাহা স্মৃতিপথে রহিয়া যাইবে। ক্রমে ক্রমে আমার ৺পিতা মাতা এবং পত্নীর আত্মা আনাইয়া আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উত্তর পাইয়া আনন্দিত হইতে লাগিলাম। অপরাপর বন্ধু-বান্ধবগণকে

তাঁহাদের মতলব মত ইহা যে কিছু নহে এইভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলাম। কিন্তু ইহার প্রকৃত উত্তর পাইয়া আমার বিশ্বাস ইহার প্রতি বিশেষ দৃঢ় হইতে লাগিল। অতীত এবং ভবিষ্যৎ কালের প্রকৃত প্রশ্নের উত্তর বাবুদিগকে দিতে আরম্ভ করিল, অথচ আমি তাহার বিন্দুমাত্রও অবগত ছিলাম না। কিন্তু মনুষ্য মনে যাহা একবার ধারণা করে তাহার মূলোৎপাটন হওয়া বড়ই সুকঠিন অর্থাৎ যাঁহাদিগের এই যন্ত্রের সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই অবিশ্বাস, তাহাদিগের প্রকৃত সত্য উত্তর পাইলেও যে বিশ্বাস মনেতে স্থাপনা করিতে অপারগ হয়েন ইহাই আশ্চর্য্য নহে কি?

সাতনার মাল গুদামের সহকারী বাবু হরপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের নামে একটী ইন্‌সিওর পার্শেল ৺কাশীধাম হইতে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী পাঠান; তাহাতে দুই গাছি স্বর্ণবালা ছিল। কিন্তু উক্ত বাবু কার্য্যে ব্যস্ত থাকাবশতঃ ভালরূপ না দেখিয়া কেবল রসিদ সহি করিয়া লয়েন। পিয়ন চলিয়া গেলে পার্শেল খুলিয়া দেখেন, তন্মধ্যে বালার ওজানানুযায়ী তামাক রহিয়াছে। ইহা ডাক বিভাগের পিয়নের সমক্ষে খোলা হয় নাই, তখন একথা এখন কে বিশ্বাস করিবে। পরে যখন তদন্ত করা হয়, তখন প্ল্যাঞ্চেটকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, উক্ত জিনিষের অনুসন্ধানে কোন ফল হইবে কি? তাহার উত্তর পাওয়া যায় যে, "জিনিষই পাওয়া যাইবে কিন্তু একগাছি বালার উপরিস্থ ফুলটী পাওয়া যাইবে না।" ক্রমে ক্রমে ৺কাশির ডাক চালকের প্রতি সন্দেহ হয়। পরিশেষে পার্শেল রানারের নিকট উক্ত বালা পাওয়া যায় এবং তাহার দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবাস হয়।

আর একটী ঘটনা। সাতনার ইংরাজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক বাবু লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতি পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেবের আদেশ হয় যে,—"তাঁহার দশ টাকা বেতন হ্রাস করা হইবে।"

প্ল্যাঞ্চেটকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, তাহার এই উত্তর পাওয়া যায় যে—"দরখাস্ত করিলে, বেতন হ্রাস কোন মতেই হইবে না।" প্রকৃত পক্ষে দরখাস্তে তাহাই হইল।

প্ল্যাঞ্চেটে সাতনা স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশুবাবুর স্ত্রীর নাম কহিয়া দেয়; ইঁহার নাম আমি ঘুণাক্ষরেও জানিতাম না। একদিন স্ত্রী আমার অনুপস্থিতিতে প্ল্যাঞ্চেট ধরেন; ঐ সময় আমার খুল্লতাত শ্বশুর এবং মৃত পত্নীর আত্মা আবির্ভাব হয়। তাঁহারা আমার পত্নীকে বলিয়া দান প্রসব কালীন জীবন সংশয় হইবে। আমি সন্দেহ দূরীকরণার্থ পুনরায় তাঁহাদিগের আত্মাকে আনাইয়া জানিলাম,—'গর্ভাবস্থায় ভৌতিক যন্ত্র ব্যবহার করা নিষেধ আছে; অজানিত অবস্থায় যখন ধরিয়াছিল, তখন আমরা নিকট আত্মীয়ের আত্মাবশতঃ কোন ভয়ের কারণ নাই, কিন্তু প্রসব কালীন কষ্ট হইবে, জীবনের ভয় নাই।' কোন কোন সময়ে ইংরেজের আত্মা আসিয়া ইংরাজীতে উত্তর প্রদান করিত, সে সব উত্তর ইংরাজী ভাষায় আমার লিখা অসম্ভব।

আমার কার্য্যত্যাগে সাতনার ইংরাজ, বাঙ্গালী এবং হিন্দুস্থানী সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইলেন। সাহেব মহলে চাঁদা করিয়া সাহেবগণ আমাকে পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দেন। এবং সাতনায় সকল সাহেব সমবেত হইয়া স্ব স্ব নাম সহি করতঃ একখানি উত্তম প্রশংসা-পত্র প্রদান করেন। সাতনার বাঙ্গালীমণ্ডলী কালীবাবুর বাটীতে আমার বিদায় ভোজ মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন এবং তথায় একটি সভায় সকল বাঙ্গালী বাবু একত্রিত হইয়া একটী শোক প্রকাশক বক্তৃতা সমাপনান্তে একটী উত্তম ক্লক ঘড়ি উপহার প্রদান করেন। আহারান্তে পুনরায় সকলে একত্রিত হইয়া আমাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তৎপর দিবস প্রত্যুষ পাঁচ ঘটিকায় বোম্বাই ডাক গাড়ীতে জামালপুর রওনা হই এবং যথা সময়ে জামালপুরে পৌছিয়া

মুঙ্গেরের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীনে চাকুরীর চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হই। কয়েক দিন পরে এ্যাম্বলার সাহেবের অফিসে গমন করতঃ সাহেবকে সাতনার ইয়ং সাহেবের সুপারিশ পত্র প্রদান করিয়া মৌখিক বলিলাম,—যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে আমার জন্য সুপারিশ করেন তবে আমার কার্য্য হইতে পারে।" সাহেব সুপারিশ করিতে অস্বীকৃত হইয়া আমাকে বলিলেন,—আমাদিগের ডিয়ার কোম্পানীর ছোটনাগপুর অঞ্চলে একজন ডাক্তারের আবশ্যক; তুমি আবেদন করিলে খুব সম্ভব কার্য্য পাইবে।" আমার প্রশংসাপত্রের অনুলিপি সহ উক্ত কোম্পানীর পরিদর্শক (উপরোক্ত সাহেব) সি. টি. এ্যাম্বলার সাহেবের নামে একখানি আবেদন পত্র প্রদান করিয়া মৌখিক কহিলাম,—আমি বিশেষ দরকারে কলিকাতায় যাইতেছি; যখন এই ডাক্তারি পদ মঞ্জুর হইবে তখন আমাকে কেশবপুরের ঠিকানায় সংবাদ দিলেই আমি যথা সময়ে উপস্থিত হইব। সাহেব তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। সাহেবটি অতি ভদ্র এবং অতি উচ্চ বংশীয়; এই কোম্পানীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং অংশীদার; মাসিক বেতন এক হাজার পাঁচ শত টাকা।

আমার প্ল্যাঞ্চেট-কাহিনী আমার পত্নীর প্রমুখাৎ শ্বশুরালয়স্থ সকলেই জ্ঞাত হইয়া তাহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য আমার শ্বশ্রু মাতাঠাকুরাণী কহিলেন,—"অনেক দিন শ্রীমতি অন্নপূর্ণা (আমার মধ্যমা শ্যালির) পত্র না পাইয়া সকলেই ব্যতিব্যস্ত আছি। পত্র না পাইবার কারণ কি? এবং সে কেমন আছে? তোমার ভৌতিক-যন্ত্রের সাহায্যে বল। দ্বিতীয়তঃ—রসুনের মাতা যে পরিচারিকা আমার স্ত্রীকে বাল্য-কালে লালনপালন করেন তাঁহার রসুন নামক পুত্রের সংবাদ অনেক দিবস না পাইয়া মনদুঃখে বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল; তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া,—সে কেমন আছে বল। আমি তৎপর দিন মধ্যাহ্নে

দরজা বন্ধ করিয়া বসিলাম এবং শ্রীমতি অন্নপূর্ণার বিষয়ে জ্ঞাত হইলাম। যে,—"তাহার ভয়ানক শরীর অসুস্থ ছিল তজ্জন্য পত্র লিখিতে পারে নাই; চার দিনের দিন পত্র আসিবে এবং তাহাতে উল্লিখিত শরীর অসুখের বিষয় লিখিত থাকিবে।" রসুনের মাতার প্রশ্নের এই উত্তর হইল যে,—"সে একটী বড় সদাগরী অফিসে চাকুরী পাইয়াছে এবং ভাল আছে। অসুখ করে তাহার পত্র আসিবে।" এই দুইটী প্রশ্নের উত্তর আশ্চর্য্যরূপে মিলিল। ঠিক নির্দ্ধারিত দিবসে দুই স্থান হইতে পত্র পাওয়া গেল। রসুনের পত্রে এরূপ লিখিত ছিল যে,—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর অধীনে বরাকর ষ্টেশনে চাকুরী পাইয়াছে।"

এই কথা ক্রমে ক্রমে প্রচার হইয়া পড়িল এবং কেশবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (লোকোমটিব অফিসের একজন কেরাণী) এই যন্ত্রের বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এবং বারম্বার তাহা ধরিতে বলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে আমার শ্বশুর মহাশয়ের বাটীর সন্নিকটস্থ একটী বাসায় বসিয়া প্লাঞ্চেট ধরি; তিনি মনের মধ্যে প্রশ্ন করিয়া আমাকে বলিলেন যে, আন্তরিক প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন। আমি প্লাঞ্চেট ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। কি আশ্চর্য্য! প্লাঞ্চেট উক্ত বাবুর আন্তরিক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিল; তাহাতে তিনি এতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হন যে, আনন্দে আমাকে ধরিয়া পড়িয়া যান। তৎপরে তাঁহার ৺মাতাঠাকুরাণীর আত্মাকে আনাইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সপিণ্ডকরণ কার্য্য শ্যামাপ্রসাদ বাবু করেন নাই, তজ্জন্য তাঁহার মাতাঠাকুরাণী শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিলে উক্ত বাবু রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর আদেশ মত অমাবস্যা তিথিতে মুঙ্গেরের কষ্টহারিনার ঘাটে শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কেশবপুরস্থ বহু ব্রাহ্মণকে জলপান করাইলেন। এই

কাহিনী মুঙ্গের ও জামালপুরে প্রচার হইয়া পড়িল। আমার নিকট বহু ভদ্রলোক আসিয়া প্রশ্নের উত্তর লইতে লাগিলেন।

এ্যাম্বলার সাহেবের নিকট হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া চার পাঁচ দিবসের মধ্যেই কলিকাতায় গমন করিলাম; কারণ আমার বাল্য বন্ধু নলডাঙ্গার জমিদার বাবু কেশবচন্দ্র দেবরায় সাংঘাতিক ব্যাধি হৃৎ-রোগের চিকিৎসার জন্য কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে কলিকাতায় ছিলেন। ডাক্তারগণ তাঁহার এই ব্যাধি হইতে অব্যাহতি নাই বলায় তিনি আমাকে সংবাদ প্রেরণ করেন যে,—তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি যেন একবার শেষ সাক্ষাৎ করি। তজ্জন্য আর অধিক বিলম্ব না করিয়া এ্যাম্বলার সাহেবের সহিত কথোপকথন বিষয় শ্বশুর মহাশয়কে কহিয়া কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলাম। প্রাতঃকালে হাওড়ায় অবতরণ করিয়া শিয়ালদহ হিন্দু-আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। আহারান্তে কাঁশারিপাড়ার পল্লীতে কেশববাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। হায়! হায়! পৌঁছিয়া শুনিলাম,—"তিনি গতকল্য রাত্রি আট ঘটিকার সময় পুত্র পরিবারদিগকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া অকালে হঠাৎ শ্বাসরোধে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।" ইহাতে হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইলাম কারণ তিনি আমার সহিত শেষ দেখা করিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়াছিলেন। আমি এমনি পাষণ্ড যে, তাঁহার শেষ অনুরোধ টুকু রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমি বাসায় উপস্থিত হইলে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর এবং স্ত্রীর শোকাগ্নি যেন পূর্ব্ব হইতে অধিকতর প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার দুইটী পুত্র—নগেন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্র রোদন করিতে লাগিল। নলডাঙ্গার রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ঐ বাসায় ছিলেন; তাঁহার নিকট সকল বিবরণ অবগত হইয়া চক্ষের জল সম্বরণ করিতে অপারগ হইলাম। যদি এক দিবস পূর্ব্বে কলিকাতায় পৌঁছিতে পারিতাম; তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমার শেষ দেখা হইত;

যাহা হউক, পরে শোকাবেগ প্রসমিত হইলে আমাকে জ্যেষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্র চন্দ্রকে লইয়া তাহারা সকলে নলডাঙ্গায় রাজাবাহাদুরের নিকট লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি কলিকাতায় হিন্দু আশ্রমেই অবস্থিতি করিতেছিলাম; তবে সময় মত কেশব বাবুর বাসায় প্রতি দিনই গমন করিতাম। একদিন একখানি ষ্টেটস্‌ম্যান সংবাদ-পত্র পাঠ করিয়া অবগত হইলাম, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের জন্য তিন জন ডাক্তার প্রয়োজন। ঐ কার্য্যের বেতন ৭৫৲ টাকা, পাথেয় পৃথক পাওয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ গৌহাটীর বড় ডাক্তার সাহেবকে প্রশংসা-পত্রের অনুলিপিসহ আবেদন করিলাম। প্রতি উত্তরের ঠিকানা জামালপুরে শ্বশুর মহাশয়ের বরাবর দিয়া ডাকঘরে পত্র দিলাম।

ইহার দুই দিবস পরে আমি এবং নগেন্দ্র রাত্রের গাড়ীতে একটী পরিচারক সহ রওনা হইয়া পর দিবস প্রাতঃকালে নলডাঙ্গায় উপস্থিত হই। কেশব বাবুর সকল আত্মীয়-বন্ধুগণকে শোক প্রদান করিয়া সন্ধ্যার সময়ে নগেন্দ্র বাবুকে লইয়া রাজাবাহাদুরের সহিত রাজপ্রাসাদে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মৃত্যুকালীন উইল হইয়াছে?" আমি বলিলাম,—'সম্ভবতঃ হইয়াছে'। তিনি আমাকে কহিলেন,—"৺কেশব বাবুর স্ত্রীর কর্ত্তব্য এই যে, তিনি যেন তাঁহার শ্বাশুড়ীর বিনা অনুমতিতে কোন কার্য্য না করেন।" তিন চার দিবস তথায় থাকিয়া কেশব বাবুর প্রধান কার্য্যকারক হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মাতুল মহাশয়সহ আমি এবং নগেন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম। শ্রাদ্ধ দিবসে স্বল্পব্যয়ে কার্য্য সমাধা করান হয়। শ্রাদ্ধের পর দিবস জামালপুরের একখানি পত্রে জ্ঞাত হইমাম আমার স্ত্রী তথায় ভয়ানক পীড়িতা এবং অন্য পত্র মধ্যে একখানি তারের সংবাদ রহিয়াছে দৃষ্টি গোচর হইল। ঐ তারের সংবাদে জ্ঞাত হইলাম গৌহাটীর বড় ডাক্তার সাহেব আমাকে নিযুক্ত করিয়া এই সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন এবং

উহার সহিত শ্বশুর মহাশয়ের পত্রে জ্ঞাত হইলাম যে, তিনি এই চাকুরীতে অনুমোদন করিতেছেন। কলিকাতার বন্ধু বান্ধবগণের মতলব অনুসারে ঐ কার্য্য গ্রহণ করিতে ইতঃস্তত করিলাম না। ঐ দিবসই লুপ ডাক-গাড়ীতে জামালপুর রওনা হইয়া রাত্রি আড়াই ঘটিকার সময়ে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলাম।

আসামের চাকুরী সম্বন্ধে অনেক কথা শ্বশুর মহাশয়ের সহিত হইয়া পরে তিনি কহিলেন,—গতকল্য এ্যাম্বলার সাহেব তোমাকে চাকুরী দিবার জন্য ডাকিয়া ছিলেন; তুমি প্রাতে তাঁহার অফিসে যাইয়া সাক্ষাৎ কর। "তদনুসারে আমি প্রাতে আট ঘটিকায় এ্যাম্বলার সাহেবের অফিসে যাইয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ এ্যাম্বলার সাহেব অফিসে নাই; তিনি লঙ্কায় জলবায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গিয়াছেন। ছোট নাগপুরের ম্যানেজার মিষ্টার টি, সি, এ্যাম্বলার (বৃদ্ধ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র) তাঁহার কার্য্য করিতেছেন। ঐ সাহেব আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের ছোট নাগপুরের জঙ্গল বিভাগে চল্লিশ টাকা বেতনে কার্য্য করিবার নিয়োগ-পত্র দিতে উদ্যত হইলেন এবং বলিলেন, তথায় তিনি প্রত্যাগমন করিলে কোম্পানীর অধীনস্থ ঠিকাদার, পাট্টাদারগণের নিকট হইতে মাসিক চাঁদা আদায় করিয়া যাহাতে মাসিক একশত টাকা তক হয় এই মত চেষ্টা করিবেন। আমি তাঁহাকে গৌহাটী ডাক্তার সাহেবের তারের সংবাদ প্রদর্শন করাইলে তিনি কহিলেন, "কোম্পানী এখন চল্লিশ টাকার উর্দ্ধ দিতে অক্ষম; তবে আমি চেষ্টা করিয়া মাসিক কিছু কিছু যাহাতে পাও, তাহার উপায় করিয়া দিব। আমি এই চাকুরীটিই মনোনীত করিলাম কারণ আসাম অনেক দূর দেশ; জলবায়ু তত ভাল নহে উপরন্তু জিনিষ-পত্র মহার্ঘ। আর ছোটনাগপুর-রেলের রাস্তার কিনারায়, অধিক দূর দেশ নহে, উপরন্তু জলবায়ুও তত মন্দ নহে; এই সকল বিবেচনা করিয়া এই চাকরীর নিয়োগ-পত্র গ্রহণ

করিলাম। এই সাহেবটিও তাঁহার খুল্লতাতের ন্যায় অতি ভদ্রলোক। তিনি কহিলেন,—"আমি মনোহরপুরের ম্যানেজার। তোমাকে সেখানেই থাকতে হইবে। খুল্লতাত মহাশয় সিংহল হইতে প্রত্যাগমন করিলেই আমি তথায় যাইব। আমার বড় কেরাণী বজরঙ্গী বাবু বেতীয়া গমন করিয়াছেন। তিনি প্রত্যাগমন করিলে তৎসহ আপনাকে আপাততঃ পুরুলিয়া পাঠাইব। তাঁহার সহিত গমন করিলে আপনার কোনরূপ অসুবিধা হইবে না।" উক্ত কথানুসারে আমি কয়েক দিবস জামালপুরে তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

পুরুলিয়াতে

পূজা গত হইল, বজরঙ্গী বাবু প্রত্যাগমন করিলেন না। আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই শ্রীমান গোপালচন্দ্রের জন্ম হয়। এই সময়ে স্ত্রী বড়ই কষ্ট পান। বজরঙ্গী বাবুর আসিতে বিলম্ব হওয়ায় আমি পুরুলিয়া যাইবার জন্য কুড়ি টাকা অগ্রিম গ্রহণ করিয়া পুরুলিয়া রওনা হইলাম। বেলা চার ঘটিকার সময়ে আমাদের গাড়ীখানি পুরুলিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। আমি ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম,—অনেকগুলি কাল, লাল ও শ্বেত বর্ণের অশ্ব-শকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কিন্তু ঘোড়া নাই। পরে জানিতে পারিলাম, ঐ সকল গাড়ী গুলি মনুষ্যে বহন করিয়া লইয়া যায়। এই সকল দেখিয়া ভাবিলাম, এ আবার কোন দেশে আসিলাম; মানুষে ঘোড়ার কার্য্য করে?

৩০শে অক্টোবর সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময়ে বজরঙ্গী বাবুর বাসায় পৌঁছিলাম। টি, সি, এ্যাম্বলার সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হ্যারি এ্যাম্বলার সাহেব পুরুলিয়ার বাঙ্গালায় ছিলেন, তজ্জন্য সেদিন আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল নাই। বাবুদিগের বাসা বাটিতে তৎকালিন হিন্দুস্থানী কায়স্থ বংশীয় পরছন লাল মুন্সি ছিলেন; তিনি আমাকে আদর

অভ্যর্থনা করিলেন। ঐ দিবস দিবাভাগে অদৃষ্টে অন্ন আহার ঘটে নাই, অন্নই বাঙ্গালীর জীবন বলিলেই হয়, সুতরাং তাহার জন্য রাত্রে লালায়িত হওয়ায় অনেক অনুসন্ধানে পুরুলিয়ার একটী ব্রাহ্মণের হোটেলে উপস্থিত হইলাম। হোটেলের ঠাকুর বাঁকা বাঁকা স্বরে আপ্যায়িত করিয়া শাল পাত্রে মোটা চাউলের অন্ন পরিবেশন করিয়া গেলেন এবং ঐ পাতার ঠোঙ্গায় ডাইল তরকারি দিলেন; মনে ভাবিয়াছিলাম পরিতোষের সহিত আহার করিব কিন্তু মুখের মধ্যে অন্ন প্রবেশ মাত্রেই অপ্রবৃত্তির জন্য অন্ন আর উদরস্থ না হওয়াতে অতি কষ্টে দুই একবার বল প্রয়োগ করিয়া হস্ত দ্বারা মা-লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইলাম কিন্তু পরিতোষ না হওয়ায় গণ্ডুষ করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলাম। ঠাকুর মহাশয়কে যথারীতি দক্ষিণা প্রদান করিয়া বাসায় আসিয়া নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিলাম।

৩১শে অক্টোবর প্রাতঃকালে হ্যারি এ্যাম্বলার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারিলাম আমার জন্য একটী বাসাবাটী স্থিরীকৃত হইয়াছে। এক দিবস পরে একজন পরিচারক এবং ব্রাহ্মণ বন্দোবস্ত করিয়া নূতন বাসায় গমন করিলাম। আমি প্রতি দিন প্রাতে ও অপরাহ্নে মুন্সিদিগের সহিত ডিয়ার কোম্পানীর অফিসে যাইতাম। কাজ কর্ম্ম বিশেষ কিছুই ছিল না সুতরাং ইংরাজি সংবাদ-পত্র পাঠ করিয়াই সময় অতিবাহিত করিতাম। ডিয়ার কোম্পানীর প্রধান একাউণ্টেণ্ট বাবু বজরঙ্গী সাহা অতি ভদ্র কায়স্থ বংশীয় সন্তান। তিনি আমার সহিত প্রথম হইতেই মাখামাখিভাবে আলাপ পরিচয় করিয়া বন্ধুত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আমি যদিও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ তথাপি তিনি আমাকে তাহার স্বদেশীয় ব্রাহ্মণোচিত ভাবে সম্মান করিতেন। ইনি অফিসের বড় বাবু; ইহার অধিনে পনর ষোল জন মুন্সি হিন্দি সেরেস্তায় কার্য্য করেন।

কয়েক দিবস পরে বড় সাহেব আমাকে কহিলেন—"তুমি একদিন মনোহরপুরে যাইয়া কোন স্থানে তোমার বাসা প্রস্তুত করিলে সুবিধা হইবে সেই স্থান মনোনীত করিয়া তথাকার মুন্সিকে বলিয়া এস"। তাঁহার অনুমত্যানুসারে তৎপর দিবস মোর সাহেবসহ মনোহর পুরে রওনা হই। সময় সঙ্কীর্ণতা বশতঃ টিকিট কাটিতে না পারায় গার্ড সাহেবের আদেশ মত মধ্যম শ্রেণীতে উঠিলাম। দুই ধারে পাহাড় ও জঙ্গল রাখিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। রাত্রি আনুমানিক সাড়ে সাত ঘটিকার সময়ে চক্রধরপুর পৌছিল। তথায় গাড়ী অর্দ্ধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে, আমি ইত্যবসরে গার্ড সাহেবের দ্বারা টিকিট করিয়া লইলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাড়ী পুনরায় ছাড়িয়া দিল। চক্রধরপুর হইতে দশ বার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া টানেলের মধ্যে গাড়ী প্রবেশ করিল। এই টানেলটী অতি বিস্তৃত; ইহা জামালপুরের টানেলের চার গুণ। তথা হইতে বার তের মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গাড়ীখানি মনোহরপুর ষ্টেশনে দণ্ডায়মান হইল। এই ষ্টেশনটী পাহাড়ের ক্রোড়ে অবস্থিত; অতি জঙ্গল-ময় স্থান। উক্ত দিবসে কোম্পানীর হস্তি ও কুলি উপস্থিত ছিল। ষ্টেশন হইতে বহির্গত হইয়া আমি ও মোর সাহেব হস্তিতে আরোহন পূর্ব্বক মনোহরপুরের বাজারের মধ্যদিয়া নদীধারে উপস্থিত হইলাম। কোম্পানীর অপ্রশস্ত একখানি নৌকায় আমরা নদী পার হইয়া অপর পারে উপস্থিত হই। মুন্সিদিগের বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইলে মুন্সি দর্পনারায়ণ আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। পরদিন প্রাতে কারখানা ও সাহেবদিগের বাঙ্গালা দর্শন করিয়া নদীর অপর পারে আমার বাসাবাটীর স্থান মনোনীত করিয়া বেলা দশ ঘটিকার যাত্রী গাড়ীতে পুরুলিয়া অভিমুখে রওনা হই।

পুরুলিয়ার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া কর্ত্তব্য। এস্থানের জল

বায়ু স্বাস্থ্যকর, অনেকগুলি বাঙ্গালী বাবু এদেশে কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া নিজ নিজ বাটী নির্ম্মাণ করতঃ সপরিবারে বাস করিতেছেন। পুরুলিয়ার রাজপথগুলি অতি পরিষ্কার; দুই ধারে অট্টালিকা এবং বিপনি শ্রেণীতে শোভা বিস্তার করিয়াছে। বাজারে সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। ইংরাজ টোলাটী অতি সুন্দর. অনেকগুলি সাহেবের কুলির অফিস। ইঁহারা কুলি সংগ্রহ করিয়া আসামে চালান দিয়া থাকেন; তাহাতে সাহেবেরা ধনী হইয়াছেন। সাহেব বাঁদ একটী মনোরম দৃশ্য; ইহার চতুর্দ্দিক পরিষ্কার পাকা রাস্তা দ্বারা বেষ্টিত। বাঁদ শব্দে হ্রদ বা জলাশয়কে বুঝায়। এই সাহেব বাঁদের জল অতি স্বাস্থ্যকর এবং ইহাতে গভীর জল সকল সময়ে এক ভাবে অবস্থিত। সহরের যাবতীয় লোক এই জলাশয়ের জল পানীয় রূপে ব্যবহার করেন। এই সহরে মনুষ্যের ও মাংস বিক্রয়ের ছড়া ছড়ি। কি ভদ্র কি অভদ্র সকলেই কুলি খরিদ ও বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রতিদিন কত নীচ জাতিয়া স্ত্রীলোকের যে সতীত্ব নষ্ট হইয়া থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। এদেশে স্ত্রী স্বাধীনতার প্রচার দেখা যায়। নীচ জাতিয়া স্ত্রীলোকের মধ্যে সতী স্ত্রী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই জেলায় আমাদের দেশীয় অনেক কুলিন ব্রাহ্মণের বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

এদেশের ভদ্র সমাজের স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ঊর্দ্ধ খোঁপা করিয়া কেশ বাঁধেন, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা এইরূপ রীতি অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। বাউরী জাতির স্ত্রীলোক মাত্রেই প্রায় বেশ্যা বৃত্তি দ্বারা সুকুমার মতি বালক ও যুবকগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। এই সকল নীচ জাতিয়া স্ত্রীলোকগণ উপদংশ ব্যাধিতে অধিকাংশই আক্রান্ত।

ম্যানেজার সাহেব কৃপা করিয়া আমার বাসা ষ্টেশন ও বাজারের নিকট প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। আমার উদ্দেশ্য সপরিবারে বাস করিব কিন্তু নদীর অপর পারে কোন ব্যক্তিই সপরিবারে থাকেন

না। সুতরাং বাজার ও ডাক ঘরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাসাবাটী স্থির করিলাম।

কিছু দিন পরে পুরুলিয়া হইতে আমরা রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার ডাক গাড়ীতে মনোহরপুর যাত্রা করিলাম। যথা সময়ে মনোহরপুরে পৌছিলাম। ভীম ঠাকুর আমার পাচক্ ছিল। ম্যানেজার সাহেবের আদেশে এই ভীম ঠাকুরকে ডাক্তারখানার চাপরাসির কার্য্য করিয়া দেওয়া হয়; তাহাতে আমার বিশেষ সুবিধা হইল। কারণ কোম্পানী হইতে বেতন পাইত কিন্তু সাহেবের জানিত ভাবে আমার বাসায় রন্ধন কার্য্য করিত। মনোহরপুরের পোষ্ট মাষ্টার অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতি সদাশয় ভদ্রলোক; তিনি সপরিবারে তথায় বাস করিতেন। তাঁহার দেশীয় একজন ক্যাম্বেল স্কুলের অনুত্তীর্ণ কম্পাউণ্ডার বাবু রঙ্গলাল কর মহাশয়কে পনর টাকা বেতনে মনোহরপুরে কম্পাউণ্ডার পদে গ্রহণ করা হয়। যদিও তিনি কম্পাউণ্ডার হইয়া আইসেন কিন্তু তাঁহার চিকিৎসা কার্য্যে ভালরূপ অধিকার ছিল। তাঁহাকে কম্পাউণ্ডার না করিয়া সাহেবের অনুমত্যানুসারে আমার সহকারিরূপে নিযুক্ত করিলাম। কোম্পানীর অধীনস্থ ঠিকাদার সাট্টাদারগণের নিকট হইতে আমার জন্য যে চাঁদা আদায় হইত তাহাতে মাসিক পঞ্চাশ টাকা উঠিত। ঐ চাঁদার টাকা হইতে সাড়ে বাইশ টাকা রঙ্গলাল বাবুকে দেওয়া হইত। এদিকে মনোহরপুরের বাজারে রোগী দেখিতে যাইতাম, তাহাতেও আট দশ টাকা আয় হইত। আমার মাসিক আয় মোট প্রায় আশি টাকা হইত।

দুই এক মাস পরে সাত দিবসের বিদায় গ্রহণ করিয়া জামালপুর হইতে পরিবার আনয়ন করি। এই সময় মনোহরপুরে জ্বর ব্যাধির প্রকোপ হওয়াতে কোম্পানীর লোক দৈনিক পঁয়ত্রিশ চল্লিশ জন জ্বরাক্রান্ত হইয়া ডাক্তারখানায় আসিতে লাগিল, কিন্তু সুখের বিষয় পত্নী ও

পুত্রদ্বয় সুস্থ শরীরে ছিল। মনোহরপুরে প্রতি রবিবারে হাট বসিয়া থাকে। বালীর কাগজ প্রস্তুতের জন্য মহাজনেরা এদেশ হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাবই ঘাস সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই ঘাস এদেশে যেখানে সেখানে পাওয়া যায়।

যে জঙ্গলে এই কোম্পানীর কাষ্ঠের শ্লীপার প্রস্তুত হয়, সেই জঙ্গলের মালিক আনন্দপুরের ঠাকুর নামে অভিহিত। ইহারা জমিদার, উড়িয়া ক্ষত্রিয়। অনেক সময়ে আমাকে আনন্দপুরের ঠাকুরের বাটীতে রোগী দেখিতে যাইতে হইত। ইহারা পাল্কী অথবা হস্তী পাঠাইতেন. কারণ মনোহরপুর হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া আনন্দপুর যাইতে হয়। মনোহরপুর ষ্টেশনের দক্ষিণে জরাই কেলা ষ্টেশন। উহার পূর্ব্বদিকে ইংরেজ রাজের বন বিভাগের সামঠারেঞ্জ; তথায় মেন্তিস নামক একজন এই দেশজাত ইংরেজ কার্য্য করিতেন। ঐ সাহেবের একবার ভয়ানক পীড়া হয়; তথায় তাহাকে দেখিতে যাইতে হইয়াছিল। ঐ স্থানটী যমের দক্ষিণ দুয়ার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে যাইতে হয়। ঐরূপ নিবিড় জঙ্গল আসাম ভিন্ন কুত্রাপি দৃষ্টিপথে পতিত হয় না।

এক সময়ে জরাই কেলা ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া কালিয়া পোশ নামক জঙ্গলে আমাদিগের একজন মুন্সীর পীড়া দেখিতে গমন করি; ঐ স্থানটী ঠিক সামঠার তুল্য। দোলযাত্রা পর্ব্ব উপলক্ষে এই কোম্পানী এক হাজার টাকা আমোদ আহ্লাদের জন্য দিয়া থাকেন। দোলযাত্রা পর্ব্বে বাইনাচ ওয়ালিগণ সুরায় উন্মত্ত থাকেন। হিন্দুস্থানীদিগের এই নিয়মেই এই উৎসব সুসম্পন্ন হয়। দোলের দিন রাত্রে সাহেব মেম সকলে বাবুদিগের বাসায় নিমন্ত্রিত হয়েন। সকলেই একত্রিত হইয়া সুরাপান ও বাইনাচ দেখিতেন এবং পরস্পরে আবির নিয়া খেলা করিতেন। কিন্তু যাহার উপলক্ষে এই উৎসব, তাঁহার সহিত দেখা

সাক্ষাৎ নাই—পূজা নাই; মদ্য, মাংস, নাচ তামাসাদি কি দোলের উদ্দেশ্য? তাহাই যদি হয়, তবে এইরূপ উৎসব উৎসন্ন যাউক! ভগবান, সৎশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য আবির্ভূত হইতেন; এই কি সৎশিক্ষা? যাঁহার নামে উৎসব—তিনি মহাযোগী, সাক্ষাৎ নারায়ণ। তাঁহার উদ্দেশ্যে এই কি বীভৎস ব্যাপার? হিন্দু জাতি অধঃপতনের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে।

ম্যানেজার সাহেব ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ পূর্ব্বক শিশু কন্যাকে একজন মেমের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া সপরিবারে লণ্ডন গমন করেন। পাঠক! ইহাদিগের মায়ার জোর কত অধিক বুঝিয়া লউন। সাহেব বিলাত গমনের পর দিবস বজরঙ্গী বাবু টম্‌টম্ গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া শয্যাগত হইয়া পড়েন। এই সংবাদ পাইবা মাত্র আমিও সপরিবারে, পুরুলিয়া গমন করিয়া ডি, ডি, বসু সিভিল সার্জ্জেনসহ তাঁহাকে চিকিৎসা করি। বজরঙ্গী বাবুর দক্ষিণ জানুসন্ধি ভগ্ন হয়; সুখের বিষয় তাঁর অঙ্গচ্ছেদের আবশ্যক হইল না। ঈশ্বরেচ্ছায় দুই মাস পরে আরোগ্য হয়েন কিন্তু আক্রান্ত পদটি দুর্ব্বল রহিল; চলিবার সময়ে বিনা যষ্টিতে চলিতে পারিতেন না। আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান গোপালচন্দ্রের অন্নপ্রাশন কার্য্য পুরুলিয়ায় সম্পন্ন হয়। পুরুলিয়ার হিন্দু চূড়ামণি শ্রীযুক্ত রূপচাঁদ পণ্ডিত মহাশয় পৌরহিত্যের কার্য্য করেন। এই কার্য্য উপলক্ষে সরকারি হাঁসপাতালের ডাক্তার ভোলানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমার যথেষ্ট উপকার করেন।

গোপালচন্দ্রের অন্নপ্রাশনের তিন চার মাস পরে আমার স্ত্রীর সম্বন্ধীয় মাতুল মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। ইনি অনেক দিবসাবধি পূর্ত্ত বিভাগে ঠিকাদারি কার্য্য করিতেছিলেন কিন্তু এখন ঐ কার্য্য নাই। তাঁহার নাম শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি নিলুকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তিনি কুলি চালানি কার্য্য করিতে মনস্থ করায়

বজরঙ্গী বাবুর নিকট হইতে একশত পঞ্চাশ টাকা কর্জ্জ করিয়া একটী ছোট ডিপো খুলেন; তাহাতে সম্পূর্ণ ক্ষতি হওয়ায় ঋণগ্রস্ত হয়েন। পরিশেষে আমাকেই বজরঙ্গী বাবুর টাকা শোধ করিতে হইল। তখনও আমার প্লাঞ্চেট ধরা বন্ধ ছিল না এবং সন্তোষ জনক উত্তর পাইয়া তাহাতেই মত্ত থাকিতাম। পুরুলিয়ার ফরবস্ সাহেব আমাদের বড় সাহেবের খাতক। তাঁহার ফুস্ফুস প্রদাহের ব্যাধি হওয়ায় হ্যারি সাহেব তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন, কারণ যদি ঐ সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে বড় সাহেবের ষোল হাজার টাকা আদায় হইবে না। আমি এবং ডাক্তার ডি, ডি বসু উভয়ে রোগী দেখিতাম কিন্তু দুঃখের বিষয় ছয় সাত দিবসের মধ্যে ঐ সাহেব মানব লীলা সম্বরণ করেন। আমার পঞ্চাশ ষাট টাকা দর্শনী পাওনা হইয়াছিল কিন্তু কিছুই আদায় হইল না। আশ্বিন মাসে বিদায় হইয়া বজরঙ্গী বাবু সহ কলিকাতায় গমন করি এবং প্রতাপ মামা আমার স্ত্রী পুত্র জামালপুরে রাখিতে গমন করেন।

সন্ধ্যার সময়ে আমি বজরঙ্গী বাবু সহ হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হই। বজরঙ্গী বাবুর পরিচিত হরিচাঁদ নামক একজন মাড়োয়ারি আমাদিগকে ষ্টেশন হইতে তাঁহার বড় বাজারস্থ বাসায় আমাদিগকে অবস্থিতির জন্য লইয়া চলিলেন। বজরঙ্গী বাবু ইহার পূর্ব্বে কখনও কলিকাতা মহানগরী দর্শন করেন নাই, তজ্জন্য তাঁহাকে লইয়া চার পাঁচ দিবস কলিকাতার প্রসিদ্ধ স্থান সকল দেখান হইল। তৎকালিন কলিকাতায় তিনটী থিয়েটার ছিল; প্রতি থিয়েটারে বজরঙ্গী বাবুকে লইয়া অভিনয় দেখিতে গমন করি। বজরঙ্গী বাবু কলিকাতায় পাঁচ ছয় দিবস অবস্থিতি করিয়া তাঁহার বাটী মুঙ্গের গমন করেন। আমিও নলডাঙ্গায় পূজা দেখিবার জন্য যশোরাভিমুখে রওনা হই।

নলডাঙ্গায় আসিয়া বাল্য বন্ধু লালমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

বাটীতে অবস্থিতি করি। প্লাঞ্চেট সম্বন্ধে দুই তিন দিবস গ্রামস্থ ভদ্র মণ্ডলীর ভিতর অনেক কথোপকথন হয়, তাহাতে কেহ বিশ্বাস করিলেন আবার কেহবা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। তথায় আমার যৎকিঞ্চিৎ খাজানা আদায় করিয়া জামালপুরাভিমুখে গমন করি। জামালপুরে পৌছিবার কয়েক দিবস পরে জ্বরে আক্রান্ত হই। বজরঙ্গী বাবুকে আমার জ্বরের সংবাদ প্রদান করিলে তিনি পাল্কী যানে তাঁহার বাটী হইতে আমাকে জামালপুরে দেখিতে আসেন এবং মিষ্টান্নের পরিবর্ত্তে টাকা প্রদান করেন। আমিও আরোগ্যান্তে তাহার বাটীতে গমন করিয়া সকল বালক বালিকাগণকে মিষ্টান্নের জন্য প্রত্যেককে টাকা প্রদান করি। বজরঙ্গী বাবুর ভ্রাতাদ্বয় বাবু শিবসাহা এবং বাবু শীতল প্রসাদ অতি পবিত্র হৃদয়ের লোক; তাহারা আমাকে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। তথায় জলপানান্তে পাল্কীযোগে জামাল-পুরে প্রত্যাগমন করি। জামালপুরে অবস্থিতির পরে পরিবার লইয়া পুরুলিয়া আগমন করি।

অক্টোবর মাসে আমাদিগের বড় সাহেব টি, সি, এ্যাম্বলার সাহেব সপরিবারে বিলাত হইতে পুরুলিয়া আসিয়া ডিয়ার কোম্পানীর প্রত্যেক কর্ম্মচারীদিগকে ঘড়ি ও চেন উপহার দেন। কম্পাউণ্ডার রঙ্গলাল বাবু একটী অঙ্গুরীয়ক উপহার পাইলেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আমরা সকলে পুরুলিয়া হইতে মনোহরপুরে আগমন করি। মনোহর-পুরে আসিয়া শুনিলাম যে—ষ্টেশন মাষ্টার বাবু দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ডাক বাবু অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে একঘরে করিয়াছেন। শুনিয়াই অবাক হইলাম; কেন না এই বিজন জঙ্গলে বাঙ্গালী বিহীন স্থানে পরস্পর দ্বেষাদ্বেষীর হস্ত হইতে নিবৃত্ত নহেন। আমি ষ্টেশন মাষ্টার বাবুকে কত প্রকার কাকুতী মিনতি পূর্ব্বক দলাদলি মিটাইবার কথা বলিলাম কিন্তু তাঁহার আর কৃপা হইল না। ইনি মনোহরপুরে

সকল বাঙ্গালী বাবুদিগকে কুহক বলেই হউক বা মন্ত্র বলেই হউক নিজের বশে রাখিয়াছিলেন সুতরাং সকলেরই মুখে একই কথা। কয়েক মাস পরে সিংভূমের ইনেস্পেক্টার বাবু মনোহরপুরে আগমন করেন; ঐ সময়ে দলাদলির তিরোভাব হয়।

সদ্গুরু সন্ধান

এই সময়ে আমার জীবনে এক নূতন ভাগ্য চক্রের উদয় হয়। আমি নলডাঙ্গায় গমন করি বিজয়া দশমীর দিবসের পর দিবস অর্থাৎ একাদশী তিথিতে। ঐ সময়ে আমি একাদশীর উপবাস করিতাম। শুনিলাম বড় সরকার রাজা কমলেশচন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু বরদা কান্ত মজুমদার মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, তাঁহার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন।

তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব ছিল সুতরাং তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া সাক্ষাৎ অভিলাষে উক্ত ভবনে গমন করি, ইনিও পূর্ব্বে প্রাক্টেট ধরিতেন, আমি তথায় যাইয়া নানারূপ আলাপ পরিচয়ের পর প্রাক্টেট সম্বন্ধে কতদূর উন্নতি করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি তাহার উত্তরে বলিলেন—যাহা পাইয়াছি তাহার সার প্লাঞ্চেট কিছুই নহে এই বলিয়া যোগাসনে বসিয়া চক্ষু স্থির করিয়া কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর

করিলেন এবং বলিলেন যখন এইরূপ চক্ষুস্থির হয় তৎকালিন নাসিকার নিকট হস্ত প্রদান করিলে বায়ু যাতায়াতের ছন্দাংশ অনুভব হইবে না। বাস্তবিক তাহাই আমি পরীক্ষা করিলাম। তাঁহার সহিত নানা প্রকার আলাপ করিয়া এই ধারণা হইল যে ইহাই তাঁহার জীবনের সার বস্তু। আমি, উহা কি জানিতে উৎসুক হওয়ায় সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময়ে একটী বড় রাজার পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে তাঁহার সহিত যাইতে ইঙ্গিত করিলেন; আমি তদনুসারে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বসিয়া রহিলাম।

নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিলাম। যাইতে যাইতে কহিলেন বলুন দেখি আপনি কোথায় যাইতেছেন? আমি কহিলাম—পুষ্করিণীর ঘাটে। তিনি তদুত্তরে কহিলেন—তাহা নহে, শূন্য জানিবেন। আমি তাহার ভাব কিছুই পরিগ্রহ করিতে পারিলাম না। তৎপরে নির্দ্ধারিত স্থানে উভয়ে উপবেশন করিলে তিনি কহিলেন—"আপনি সত্য কথা কহিবেন কি না"? আমি অম্লান বদনে হাঁ উত্তর করিলাম। তিনি কিছু দিবস পূর্ব্বের একটী অতি গোপনীয় কথা কহিলেন, যে কথা আমার স্ত্রী ভিন্ন এ জগতে আর কাহারও জানিবার উপায় নাই; ইহা শুনিয়া আমি অবাক হইলাম। তিনি কহিলেন—গুরুদেব আমার শরীরে সদা সর্ব্বদা বাস করেন তিনি অন্তর্যামি এ কথা তাঁহারই, তিনি আমাকে আর কিছুই না বলিয়া এবং আমাকে আর কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া কহিলেন—"আপনার শুভ সময় আগত; গুরুদেবের আজ্ঞাক্রমে আপনার নিকট এই নলডাঙ্গায় সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আপনি কলিকাতার হোগল কুড়ার ভবনে প্রাতে আট নয় ঘটিকার সময়ে গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি প্রথমে কোন কথাই শুনিবেন না, এইরূপ বলিবেন—"আমি কিছুই জানি না, আপনি ভুল করিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন।" তৎকালিন

আমার পরিচয় প্রদান করিবেন। তাহাতেও যদি কোন কার্য্য না হয় প্রহার করিতে পারেন। তিনি রাগ করিবেন না কারণ সকল রিপুকেই জয় করিয়াছেন এবং ভগবান হরির ভাবাপন্ন হইয়াছেন।"

এই কয়েকটী কথা শ্রবণে মন ঐ মহাপুরুষের চরণাশ্রয় জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিল, আমরা ঘাট হইতে আপন আপন বাসস্থানে গমন করিলাম। মনের যে কিরূপ অবস্থা হইল তাহা বর্ণনাতীত। দুই চার দিবস তথায় অবস্থিতি করিয়া রাজস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক কৈলাস বাবুসহ কলিকাতায় রওনা হইলাম। প্রাতের গাড়িতে অবতরণ করিয়া ৮৩নং আনির রাজার বাসায় পৌঁছিলাম। তথায় প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ দ্বারিকা নাথ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে আমার এক চর্ম্মব্যাধির ঔষধ লইয়া কৈলাস বাবুসহ নির্দ্ধারিত হোগল কুড়ায় মহাপুরুষের বাস ভবনে উপস্থিত হইলাম। তথায় যাইয়া শুনিলাম ঐ সিদ্ধপুরুষ তাঁহার স্কুলে গমন করিয়াছেন, এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রত্যাগমন করিবেন সুতরাং আমরা উভয়ে বহির্দ্দেশের একটী অপ্রশস্ত খোলার ঘরে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর অশ্ব শকট ঐ বাটীর দ্বারে আসিয়া পৌছিল এবং ঐ গাড়ী হইতে মধ্যম আকারের শুভ্রবর্ণ মুখে দাড়ি দিব্য কান্তিযুক্ত পুরুষ কটকের একজোড়া বিনামা পায়ে অবতরণ করিলেন, গাত্রে একটী সেকেলে মির্জ্জাই; গাত্রবস্ত্র হইতে সুগন্ধ বহির্গত হইতেছে।

কৈলাস বাবু তাঁহাকে প্রথমেই প্রণাম করিলেন তৎপরেই আমি প্রণাম করিলাম। আমাদিগকে দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা কে এবং কি জন্য এখানে আসিয়াছি তাহার উত্তরে কৈলাস বাবু আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন ইহার কয়েকটী বিষয় আপনার নিকট জিজ্ঞাস্য আছে, তদুত্তরে গম্ভীর স্বরে কহিলেন আমি

কিছুই জানি না এবং তাহার উত্তর করিবার আমার সামর্থ হইবে না। কৈলাস বাবু আরও কহিলেন ইনি নলডাঙ্গার বরদা বাবুর প্রেরিত। তাহার উত্তরে তিনি কহিলেন—কে বরদা বাবু জানি না। একটু ভাবিয়া কহিলেন—আচ্ছা, উহার কি প্রশ্ন আছে জিজ্ঞাসা করুন। আমি কহিলাম ঠাকুর এ সম্পূর্ণ অসময়, আপনি একটু বিশ্রাম করুন তৎপরে জিজ্ঞাসা করিব। তাহার উত্তরে তিনি কহিলেন—"তবে আর্য্য মিশন ইনষ্টিটিউসন স্কুলে তিনটা হইতে পাঁচটার মধ্যে যাইয়া যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে জিজ্ঞাসা করিবেন নমস্কার।" এই বলিয়া দ্রুত গতিতে অন্দর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বহির্বাটীতে একজন দ্বারোয়ান ছিল ঐ ব্যক্তি বাহিরের দিকে একটা তালা বন্ধ করিয়া দিল।

আমি তো অবাক! ইনি কে? ইনি কি একজন ফৌজদারির আসামী অথবা দস্যু? কুলুপ বন্ধ করিবার কারণ কি? এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তিন আনির রাজা মহাশয়ের বাসায় পৌছিলাম।

আহারান্তে বেলা তিন ঘটিকার সময়ে আমি কৈলাস বাবু এবং তিন আনির রাজা মহাশয়ের শ্যালক বরদা বাবু সকলে একত্রিত হইয়া আর্য্য মিশনে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম বাবা তাঁহার অফিসে আছেন সুতরাং আমরা তিন জনে অফিসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি গুরুদেব একখানি টেবিলের ধারে একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার চতুস্পার্শে সাধকগণ পৃথক পৃথক কাষ্ঠাসনে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

আমরা যাইবা মাত্রই গুরুদেব নমস্কার করিলে আমরা অবাক আর কি! আমরা তিনখানি আসনে উপবেশন করিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার প্রশ্ন কি বলুন।" আমি একটু ইতস্ততঃ করায় কহিলেন—"এই সকল ভদ্রমণ্ডলি সকলেই সাধক, আপনি অনায়াসে ইহাদিগের সমক্ষে আপনার অন্তরের ভাব অকপটে প্রকাশ করিতে

পারেন। তবে যদি আপনার সঙ্গীদিগকে গোপন করিতে চাহেন চলুন পৃথক ঘরে যাইয়া আমাকে গোপনে বলুন।”

আমি কহিলাম; গুরুদেব! বড়ই অশান্তিতে কষ্ট পাইতেছি তাহা উদ্ধারের উপায় বলুন। আর প্লাঞ্চেট ধরিয়া অনেক সত্য ঘটনা হস্ত হইতে প্রকাশ হয় তাহার কারণ কি? আর ধরিব কি না ইত্যাদি অনেক কথা তাঁহাকে কহিলাম, তিনি আমার সকল বিবরণ জ্ঞাত হইয়া কহিলেন প্লাঞ্চেট ত্যাগ করুণ, সর্দ্দি লাগিলে থোড়ের রস মস্তকে লাগাইবেন, সুগন্ধি পুষ্পের ঘ্রাণ লইবেন, আর একখানি গীতা দিতেছি লইয়া যান প্রত্যহ পাঠ করিবেন, আপনি সংস্কৃত না জানিলেও পড়িতে পড়িতে এই গীতার প্রসাদেই দখল হইলে বুঝিতে পারিবেন, মনে নির্ম্মল আনন্দ ক্রমে ক্রমে পাইবেন, যেরূপ পূজা করিয়া থাকেন তদ্রূপ করিবেন। আপনি যে স্থানে আসিয়া পড়িয়াছেন মঙ্গলময় আপনার মঙ্গল করিবেন, সময়ে আত্ম কর্ম্মের উপদেশ পাইয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিবেন। ব্যস্ত হইলে কি হইবে, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। যতই গীতা পাঠ করিবেন ততই আপনার ভক্তি ও বিশ্বাস মনে দৃঢ় হইবে। সুবিধামত সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। প্লাঞ্চেটের সকল উত্তর সত্য হয় না, বরং ইহার ভাবি কুফলে মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে কারণ এই যন্ত্র ধরিলে মস্তিষ্ক ও হৃদয় দুর্ব্বল হয়। অতএব এই যন্ত্র একেবারে পরিত্যাগ করিবেন মনেতেও স্থান দিবেন না। এইরূপ কহিয়া আমাদিগকে বিদায় দিলেন আমরা বাসায় আসিয়া অন্যান্য কার্য্য সমাধা করিয়া লইলাম।

পরদিবস অপরাহ্ণে ২॥০ ঘটিকার গাড়ীতে জামালপুর রওনা হইলাম। তথায় যাইয়া কতক কতক আভাষে শ্বশুর মহাশয়কে কহিলাম; তাঁহার সংকীর্ণ মনে এবিষয় প্রত্যয় মানিল না। যাহা হউক মহাপুরুষের আদেশ মত প্রত্যহ গীতা পাঠ করিতে লাগিলাম এবং অল্প সময়

মধ্যে তাঁহার আশীর্ব্বাদে এবং কৃপায় গীতা হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। জামালপুর হইতে পুরুলিয়া যাইয়া কৈলাস বাবুকে দেখিলাম।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম, কলিকাতায় ঔষধ খরিদ করিতে যাইয়া গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তৎকালিনও আমার প্রতি কৃপা হইল না; কহিলেন সময় হয় নাই। "ধর্ম্ম পূজাদি মীমাংসা" নামক ধর্ম্মপুস্তক আমাকে প্রদান করিয়া কহিলেন, ইহা পাঠ করিলে মনের যাহা কিছু ময়লা নষ্ট হইবে; এখন উপদেশ পাইবেন না। সুতরাং হতাশ হইয়া পুরুলিয়ায় প্রত্যাগমন করিলাম এবং এক সপ্তাহের মধ্যে মনোহরপুর সপরিবারে যাইয়া দলাদলির ঘটনা দেখিয়া পথভ্রষ্ট হইলাম এই বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই সময়ে মনোহরপুরের বাসা বাটীতে ভয়ানক সর্পের ভয় হয় এবং দুই একটী সর্প মারাও হয়।

ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বড় সাহেবের মেম আমাকে পুরুলিয়া যাইবার জন্য তারে সংবাদ করেন। তথায় গমন করিয়া মেম সাহেবের একটী বন্ধু কুমারি মেমের ভয়ানক পীড়া হওয়ায় আমার দ্বারায় চিকিৎসা করেন, অনেক কষ্টে স্বল্পবিরামিত জ্বর আরোগ্য হয়। ঐ সময়ে আমি অন্নদা প্রতাপ মামার বাসায় আহারাদি করিতাম।

ঐ সময়ে পুরুলিয়াতে আমার স্ত্রীর মাসির পুত্র শ্রীমান প্রিয় নাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া আমার নিকট পুরুলিয়ায় আগমন করেন তাঁহাকে মনোহরপুরে পাঠাইয়া দিলাম। কয়েক দিবস পরে আমি মনোহরপুরে প্রত্যাগমন করিলাম। প্রিয়নাথের বাটীর আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়, পিতৃহীন, বয়ঃক্রম সতের আঠার বৎসর; যৎসামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া করিয়াছে, কিন্তু অতি ঠাণ্ডা প্রকৃতির, যুবক। তাহার কার্য্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলাম, ইংরাজি না জানায় চাকরী হওয়া বড়ই সুকঠিন হইল।

এই সময়ে আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান গোপালচন্দ্র ও আমার সহধর্ম্মিনী বড়ই পীড়িত হন ; দয়াময়ের কৃপায় অল্প দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। আমার সহকারি রঙ্গলাল বাবু কোলঙ্গা নামক নূতন ডিপোতে প্রেরিত হন সুতরাং আমাকেই মনোহরপুরের ডাক্তার খানার সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত।

কোলঙ্গা ষ্টেশনে কোম্পানীর কারখানা উঠাইয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাবনা অনেক পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত ছিল এবং তথায় সাহেবদিগের বসোপযোগী বাঙ্গালা এবং অফিস হইতেছিল। আমাদিগের বাসা বাটীর স্থান মনোনীত করিবার জন্য সাহেবের আদেশ অনুসারে একদিন অপরাহ্নের গাড়ীতে আমি বজরঙ্গী বাবু এবং সিদ্ধেশ্বর বাবু একত্র হইয়া তথায় গমন করি। ঐ স্থানটী মনোহরপুর অপেক্ষা অনেক অংশে উত্তম। কারণ জঙ্গল তত নিকটে নাই নদী পারাপারের অসুবিধা নাই। আমাদিগের বাসার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া পরদিবস প্রাতের গাড়ীতে মনোহরপুরে প্রত্যাগমন করিলাম।

এপ্রিল মাসের সপ্তম দিবসে আমরা সর্ব্বারম্ভে সপরিবারে কোলঙ্গার নূতন বাসা বাটীতে গমন করি। এই ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী রাউর কেনা নামক ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত বাবু বামদেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রেলওয়ের রাস্তার সহকারি ইন্সপেক্টর রূপে কার্য্য করিতেন, তাঁহার সহিত আলাপ হওয়ায় জ্ঞাত হইলাম তিনি একজন ধর্ম্মপ্রাণ লোক। এই বাবুটির সহিত বিশেষ সৌহৃদ্যতা হইয়াছিল সময়ে সময়ে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আমাকে বড়ই আনন্দ প্রদান করিতেন।

কোলঙ্গা ষ্টেশনে ডাকগাড়ী ধরিত না এবং সরকারি ডাকঘরও না থাকায় আমাদিগের পত্রাদি এক ষ্টেশন দক্ষিণে কুমার ফেলায় প্রতিদিন পাঠাইতে হইত। কোলঙ্গার উত্তরে দুই ক্রোশ ব্যবধানে

ব্রাহ্মণী নদী। তাহার উপর দিয়া রেল কোম্পানী অতি অপূর্ব্ব সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেতুও সুবৃহৎ। ঐ ব্রাহ্মণীর তটদেশে একটী অল্প উর্দ্ধ পাহাড়ের উপরিভাগ "ব্যাস আশ্রম" নামে কথিত হয়। জুন মাসে নাগরা টিম্বার কোম্পানীর একটী বাবুর পুত্রের পীড়া হওয়ায় তাহার চিকিৎসার জন্য তথায় গমন করি, পথিপার্শ্বে উক্ত "ব্যাস আশ্রম" দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া স্থানের কিঞ্চিৎ আভাস হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলাম। একদিক দিয়া কোল নদ আসিয়াছে এবং অপর দিক হইতে শংখ্য নদ আসিয়া দুইটী নদের সংমিলন হইয়া ব্রাহ্মণী হইয়াছে সে অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য। ইহারই তীর দেশে ব্যাস আশ্রম। কিম্বদন্তি আছে প্রতিদিন প্রাতে এস্থানে কুয়াসা হইয়া থাকে। তাহা কিন্তু আমার ভাগ্যে দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

যদিচ বাসা বাটীর নিকটে সেরূপ জঙ্গল ছিল না কিন্তু একদিবস রাত্রি আনুমানিক আট ঘটিকার সময়ে আমাদিগের বাসার সংলগ্ন ঘেরা বেড়ার অতি নিকটে ভয়ানক চীৎকার করিয়া ভল্লুক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, সে ভয়ানক দৃশ্য: যাহা হউক নানারূপ শব্দ করায় তাহারা পলায়ন করিল। বাসার অতি নিকটে একটী পার্ব্বতীয় অপ্রশস্ত নদী ছিল, বর্ষাকালে জলপ্লাবনে ভীম মূর্ত্তি ধারণ করিত; এমন কি তাহার তরঙ্গ দেখিলে হৃদয় কম্পিত হইত। কোলঙ্গার সন্নিকটস্থ কয়েকখানি গ্রাম দেখিতে আমরা কয়েক জন একত্র হইয়া গমন করি। দেখিলাম আমাদের দেশীয় পল্লীগ্রামের তুল্য। পাহাড়ের পাদদেশে গ্রামগুলি প্রতিষ্ঠিত। জুন মাসে তারে সংবাদ করাইয়া বাবু ও মুন্সিদিগকে পুরুলিয়া লইয়া যান। কেবল আমি সপরিবারে কোলঙ্গায় অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। আমার সহকারী রঙ্গলাল বাবু বিদায় গ্রহণ করিয়া তাঁহার দেশে গমন করিয়াছেন।

কয়েক দিবস পরে বড় সাহেব আমাকে পুরুলিয়ায় সপরিবারে

যাইতে আদেশ করায় গমন করিয়া প্রথমে প্রতাপ মামার বাসায় দুই এক দিবস থাকিয়া নাজির বাঁধের নিকটে আমার বাসা ঠিক করিয়া তথায় গমন করিলাম। সুপ্রসিদ্ধ ৺গঙ্গানন্দ বাবু ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেটের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের বাটির নিকটেই আমার বাসা হইল। সুতরাং তাঁহার স্ত্রী প্রথম দিবস হইতেই আমার স্ত্রীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিলেন উক্ত ডেপুটী বাবুর কোন সন্তানাদি হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। আমার পুত্রদ্বয়কে তাঁহারা স্বামী স্ত্রীতে বড়ই ভাল বাসিতে লাগিলেন এবং অনেক সময়ে গোপাল ডেপুটী বাবুর অঙ্কে থাকিত। বাবুটির পরিচয় একটু দেওয়া আবশ্যক বিবেচনায় কয়েকটী বিষয় লিখিয়া ক্ষান্ত হইব।

ইনি ভবানিপুর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ উকীল ৺জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুস্পুত্র; সাহেবদিগের মনরঞ্জন করিতে ইহাদিগের বংশীয় লোক খুব পটু।

পুরুলিয়ার নাজিরবাঁধের বাসায় গমন করিবার তিন চার দিবস পরে একদিন অপরাহ্নে আমি ইঞ্জিনিয়ার বাবুর বাটীর নিকটে একটি মধ্য বয়স্ক গৌরবর্ণ আকৃতির বাঙ্গালী বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি ডিয়ার কোম্পানীর ডাক্তার কি না। আমি কহিলাম আপনার অনুমান সত্য বটে কিন্তু আমি কখনতো আপনাকে দেখি নাই, আপনি আমাকে কি করিয়া জানিলেন? তিনি কহিলেন সত্য বটে আমিও কখনও আপনাকে দেখি নাই তবে অন্তরের কথা অন্তর্যামিই জানেন। আমার নাম জিজ্ঞাসা করায় নাম বলিয়া তাঁহার নাম জানিবার জন্য উৎসুক হইলে তিনি কহিলেন আমার নাম শ্রীবৈকণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায়, নিবাস জাহানাবাদ মহকুমার নিকট ভুরশোভাগ্রামে। আমিও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম কারণ কোলঙ্গা অবস্থান কালিন সিদ্ধেশ্বর বাবু একদিন কোম্পানীর

কার্য্য উপলক্ষে চক্রধরপুরে গমন করিয়া তাঁহার নাম শ্রুত হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন। আমি কহিলাম, আপনার নাম শুনিয়াছিলাম সত্য। এবং ইহাও শুনিয়াছিলাম আপনি কলিকাতার ঠাকুরের আশ্রিত শিষ্য। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে ছিলাম দয়াময় মিলাইয়া দিলেন। প্রকৃতপক্ষে তৎসদৃশ্য ধার্ম্মিক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে কলুষিত মনে ধর্ম্ম ভাবের উদয় হয়। আমি তাঁহাকে কহিলাম যদি আপনার কোন কষ্ট না হয় এবং অসুবিধা বোধ না করেন তবে সাহেবের বাঙ্গালা পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিবেন। তিনি আনন্দ চিত্তে সম্মত হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সাহেবের বাঙ্গালায় আমার কার্য্য শেষ করিয়া আমরা উভয়ে আপন বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার সহিত বড়ই যেন ভালবাসা হইল। ইহার বয়ঃক্রম তৎকালিন চল্লিশ বৎসর হইবে। ইনি একজন উচ্চ বংশীয় কুলিন সন্তান প্রায় দুই বৎসর ইষ্টদেবের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়াছেন, এই সামান্য সময়ের মধ্যে গুরু কৃপায় যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহার বাসার বিষয় জিজ্ঞাসু হওয়ায় তিনি কহিলেন,—কয়েকটী চরিত্র হীন বাঙ্গালীর সহিত অতি কষ্টে থাকিতে হইতেছে। উত্তম সৎসঙ্গ অনুসন্ধান করিতেছি ঐরূপ ভদ্রলোক যুক্ত বাসা প্রাপ্ত হইলে এই অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত আছি। আমি তাঁহাকে বারম্বার অনুরোধ করিয়া কহিলাম আমার বাসায় বৈঠকখানার ঘরে আসিয়া থাকুন এবং আমাকে কনিষ্ঠ সহোদর জ্ঞান করিয়া দাদা হইয়া এইখানে বাস করুন। তিনি স্বীকৃত হইয়া জিনিষ পত্র প্রভৃতি আনয়ন করিয়া আমার সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন।

আমার বিশেষ লাভ এই হইল যে তাঁহাকে পাইয়া মনের মলিনতা ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইতে লাগিল। এই ঘটনা তাঁহার কৃপা

ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। যে সময়ে তিনি অবসর পাইতেন ঐ সময়ে গুরুদত্ত গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া আমাকে শ্রবণ করাইতেন। ইহাতে আমার অসীম সুখ। এদিকে তাঁহার নিকট হইতে যত সদুপদেশ পাইতে লাগিলাম তাহাতে ততই ক্রিয়া পাইবার জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইতে লাগিল।

ঐ সময়ে পরাৎপর ইষ্টদেব মহাশয়কে একখানি পত্র লিখিলাম যে, সাত আট দিবসের জন্য বিদায় লইয়া কলিকাতায় যাইব কৃপা করিয়া এ অধমকে উপদেশ প্রদান করিলে বড় ভাল হয়। তাঁহার উত্তরে এইরূপ লিখিলেন,—এ সময়ে উপদেশ লইবার কাল নহে, ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই; আশ্বিন মাসে আসিয়া কার্য্য লইয়া যাইবেন। ইহাতে মনে প্রবোধ না মানায় গুরুদেবকে কত কটু ভাষা সন্নিবেশিত করিয়া আর একখানি পত্র লিখিলাম তাহাতে এই মনে করিয়াছিলাম দয়াময় বুঝি রাগ করিয়া উত্তর দিবেন না। কিন্তু ও হরি! তিনি যে রাগকে খাইয়া ফেলিয়াছেন বরং অতি উদার ভাবের উত্তর পাইলাম, তাহাতে কতকগুলি উপদেশ পূর্ণ বাক্য ছিল। ঐ পত্র পাইয়া কথঞ্চিৎ নিরস্ত হইলাম এবং তাঁহার আদেশ মত নিত্য গীতাপাঠ করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে জামালপুরে আমার শ্বশুর মহাশয়কে এই বিষয়ে আভাষ প্রদান করি, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অমত, এই ভাবে উত্তর পাইলাম। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রীতিমত বুঝাইয়া পত্র লিখিলাম. তাহাতে তিনি অনিচ্ছা স্বত্বেই সম্মত হইলেন।

কি আশ্চর্য্য! মায়িক জীব বুঝিতে অক্ষম, এই সাত্ত্বিক কার্য্য পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ভিন্ন মনুষ্য ইহজন্মে প্রাপ্ত হইতে পারে না। যাহা হউক আশ্বিন মাসের পূজার পূর্ব্বে ষষ্ঠী তিথিতে সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রাতের গাড়ীতে সিদ্ধেশ্বর বাবুসহ কলিকাতায় রওনা হইলাম।

ঐ দিবস সন্ধ্যার সময়ে আমরা সিদ্ধেশ্বর বাবুর কাশীপুরস্থিত শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলাম। জলযোগান্তে বিশ্রাম করিয়া অমূল্যনিধি পাইবার জন্য বড়ই উৎসুক চিত্তে রাত্রি যাপন করিলাম।

আত্মদর্শন

পর দিবস সপ্তমী পূজার প্রাতে সিদ্ধেশ্বর বাবুসহ শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শনার্থ চোরবাগানে আর্য্যমিশন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলাম, আমার ভাগ্য প্রসন্ন; বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম। তিনি আমাকে তাঁহার বসিবার গৃহে কিয়ৎকালের জন্য অপেক্ষা করিতে আদেশ প্রদান করিয়া বহির্দ্দেশে গরীবদিগের ঔষধ বিতরণ জন্য বসিলেন। আমি তাঁহার অফিসে বসিয়া খুব আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলাম! সিদ্ধেশ্বর বাবু তাঁহার নিজের কার্য্যে স্থানান্তরে গমন করিলেন। আমার নিকট নিদর্শন-পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন—"বাবা কাশীধামে পীড়িত, কখন আমাকে তথায় যাইতে হয় নিশ্চয়তা নাই। অনবরত সংবাদ পাইতেছি, অতএব আপনি অদ্য উপদেশ লউন।" আমি কহিলাম আপনার যাহা আদেশ তাহাই শিরোধার্য্য। তাহার পর মুহূর্ত্তে তিনি কমণ্ডলু হস্তে লইয়া আমাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া দ্বিতলে উঠিতে আরম্ভ করিলেন, আমি মহা আনন্দে তাঁহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি সত্য, কিন্তু মনে মনে এইটি আন্দোলন করিতে ছিলাম যে, মহাষ্টমী তিথিতে যোগ কার্য্যের উপদেশ লওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু বাবা অদ্যই উপদেশ দিবেন!

এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে চলিতেছি, ক্রমে দ্বিতল অতিক্রম করিয়া ত্রিতলস্থ একটী তালা বন্ধ প্রকোষ্ঠের নিকট পৌঁছিয়া যেমন চাবি খুলিবেন, অমনিই বলিয়া উঠিলেন,—আপনার কল্য মহা অষ্টমীতে উপদেশ লইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা রহিয়াছে তবে আমাকে পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া বলিলেন না কেন? আচ্ছা, যখন আপনার ঐরূপ মন হইয়াছে তবে কল্য প্রাতে কার্য্য লইবেন। এই কথা তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইবামাত্রই আমার মনে যেন একটা বিদ্যুৎ চমকাইল। অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার গম্ভীর মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রহিলাম। বাবা এই কথা বলিয়াই নিম্নতলাভি-মুখে অগ্রসর হইলে আমি হতভম্ব হইয়া তৎপশ্চাৎ নামিতে লাগিলাম এবং বলিলাম—"বাবা ইহা আমার অন্তরের ইচ্ছা, আপনি অন্তর্যামী সকলই জানেন, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। তাঁহাকে যথাবিহিত প্রণাম করিয়া কাশীপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

অদ্য মহামায়ার পূজা, লোকের মনে বড়ই আনন্দ। আমার প্রতি যে মহামায়ার কৃপাদৃষ্টি হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছি। পথিপার্শ্বে কত বাটীতে পূজা হইতেছে, সেদিকে আমার দৃষ্টি নাই, ঐ পূজার প্রতিমূর্ত্তি দেখিবার জন্য মনে আগ্রহ নাই আমি যে মহামায়ার আদি মূর্ত্তি হৃদিপটে গুরুকৃপায় পরদিবস দেখিতে পাইয়া পবিত্র হইব তাহাতেই বিহ্বল হইয়া চলিয়াছি, এই পার্থিব রং-চং তখন মনে ছিল না। ঐ দিবস অপরাহ্নে পুনরায় গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিলাম, এবং কিছু সময় তথায় অবস্থিতি করিয়া কাশীপুর প্রত্যাগমন করিলাম।

পর দিবস আমার জীবনের মহাদিন। ঐ মহাদিনের প্রভাত আগমন প্রত্যাশায় অধৈর্য্য হইতে লাগিলাম। নানাপ্রকার সুখ দুঃখের চিন্তায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, অতি আগ্রহ সহকারে পদব্রজে চোরবাগান অভিমুখে ছুটিলাম, মনেতে কি উৎসাহ; যিনি ভুক্তভোগী তিনিই উপলব্ধি করিতে পারেন। যথা সময়ে শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন করিলাম। আরও একটী অল্প বয়স্ক কায়স্থ বংশীয় যুবক ঐ কার্য্য পাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বাবার অফিসে বসিয়াছিলেন। বাবা আমাদিগের উভয়কে ত্রিতলস্থ প্রকোষ্ঠে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাদিগের পাপ কলুষিত শরীর প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জগতের সার জিনিষ প্রদান করিলেন। কি আশ্চর্য্য..................এইরূপ আর নাই। আর বলা যায় না নিষেধ, সুতরাং জীবনীতে আর লিখিতে পারিলাম না! কার্য্য গ্রহণ করিয়া নিম্নতলে আসিয়া বিতরণের পুস্তক লইলাম এবং অন্যান্য দুই একখানি গ্রন্থ খরিদ করিয়া লইলাম। আমাদিগকে দেখিয়া অন্যান্য সাধকগণ কতই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমাদিগের প্রতি দয়া করিয়া একজন অধিক বয়স্ক সাধক আমাদিগকে কোন স্থানে কোন জিনিষ দর্শন করাইতে লইয়া গেলেন। আমরা তাহা দেখিয়া এবং অনুধাবন করিলে তিনি তাঁহার বাটীতে আমাদিগকে লইয়া গেলেন। অতি প্রকাণ্ড তাঁহার বসত বাটী কিন্তু লোকটীকে দেখিলে একজন অতি গরীব বলিয়া অনুমিত হইবে। ইঁহার বাটীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ক্রিয়ান্বিত এবং বাবার ভক্ত। সন্ধ্যার সময়ে আমাদিগকে পুনরায় তাঁহার বাটীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমরা যথা সময়ে তাঁহার বাটীতে যাইয়া কার্য্য দেখাইয়া লইলাম। শুনিলাম বাবা তাঁহার ইষ্টদেব দর্শনে ৺কাশীধাম গমন করিয়াছেন।

পর দিবস নবমী, পুনরায় আর্য্য মিশনে আসিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বিজয়া দশমীর দিবস প্রাতে আর্য্য মিশনে আসিয়া শুনিলাম, বাবা আসিয়াছেন, স্কুলের একটী শ্রেণীতে নিম্নতলে বসিয়া আছেন। পাদুকা শূন্য পদ, শোক-বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিয়া আছেন। যেন তাঁহাকে অর্থাৎ ভাবময় পুরুষকে সংসারী ভাবে দৃষ্টি করিয়া মনে হইল কথঞ্চিৎ ম্রিয়মান। আমাদিগের সমক্ষে চক্ষু হইতে অশ্রুপাত করিয়া কহিলেন—"বাবা মহা অষ্টমীতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এতাবৎ কাল পাহাড়ের অন্তরালে ছিলাম। আমার যথেষ্ঠ অনিষ্ট হইল।" তাঁহার পদ প্রান্তে বিদায় গ্রহণ করিয়া অবিনাশ বাবুর বাটী গমন করিয়া অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলাম।

যথা সময়ে আমার অবস্থিতির স্থান কাশীপুরে পৌছিলাম। অপরাহ্নে বিজয়া দেখিতে অশ্বশকটে সকলের সহিত গমন করিলাম সত্য; কিন্তু মনে মনে ধারণা করিলাম বিজয়া এক ভাবে আমার হইল। এক বৎসর এই রত্ন পাইবার আশায় কত ক্রন্দন করিয়াছি তাঁহার কৃপায় ঐ রত্ন উদ্ধার করিয়া যাইতেছি, ইহাও এক প্রকার বিজয়। ইন্দ্রিয়গণ কত প্রকার লালসা দেখাইয়া এই জিনিষ লইতে বারম্বার নিষেধ করা স্বত্বেও গুরু কৃপায় পাইলাম। এখন তাঁহার চরণ রেণুর বলে যদি ইহার সংব্যবহার করিতে পারি তবেই মঙ্গল, নচেৎ যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিতে হইবে, সকলই গুরু কৃপা।

একাদশীর দিবস অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া পুরুলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সিদ্ধেশ্বর বাবু কিঞ্চিৎ জলযোগ অন্তে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমার তামসিক একাদশী, পুরুলিয়ায় গমন করিয়া জলযোগ করিব সুতরাং নিশ্চিন্ত। যাহা হউক আমরা অশ্ব-শকটে রওনা হইয়া যথা সময়ে প্রাতের আট ঘটিকার গাড়ীতে হাওড়া পরিত্যাগ করিলাম। মনের খুব আনন্দেই কলিকাতা হইতে পুরুলিয়া

যাইতেছি, কারণ জীবনের মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাকে ধরিয়া থাকিতে পারিলে মায়িক জীব যে "শিব" স্বরূপ হইতে পারে।

হুগলি ষ্টেশনে গৈরিক বসন পরিধৃত একজন সাধু পুরুষ আমাদিগের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিলেন। আমাদিগের কামরার সংলগ্ন কামরায় উঠিয়া একখানি কম্বল বিছাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার নিকট তিনখানি পুস্তক ছিল, ঐ পুস্তকের উপলক্ষে তাহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হওয়ায় কোন স্থানে গমন করিতেছেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী উপাধিধারী জ্ঞানী লোক; সংসার ধর্ম্মে থাকিয়া না থাকার তুল্য। এখন তিনি তাঁহার গুরু দর্শনে রাউলপিণ্ডি যাইতেছেন। ঐ তিনখানি পুস্তক পাঠ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় তাঁহার নিকট ক্ষণকালের জন্য ঐ পুস্তক কয়খানি প্রার্থনা করায় হাস্য বদনে ঐ পুস্তক আমাকে প্রদান করিলেন এবং পুস্তক প্রণেতা যে তিনি এবং দিনাজপুর জেলার অধীনস্থ কোন ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতা করিতেন জ্ঞাত হইলাম।

আমি যোগ শিক্ষা নামক পুস্তকখানির অনেকাংশ পাঠ করিয়া পরম পুলকিত হইলাম। ইহার পূর্ব্ব নাম শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৎপরে তাঁহাকে আর্য্য মিশন হইতে প্রকাশিত "ধর্ম্ম পূজাদি মীমাংসা" নামক পুস্তকের বিষয় তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, ঐ পুস্তক তিনি পাঠ করিয়াছেন এবং উহা যে অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন হইয়াছে শত মুখে স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ পুস্তকের সমাজে অভাব ছিল গ্রন্থকর্ত্তা সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। তৎপরে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার সহিত নানা প্রকার আলাপ চলিতে লাগিল তাহাতে গাড়ীর কষ্ট আর অনুভূত হইল না।

আমরা বেলা সাড়ে চার ঘটিকা অপরাহ্ণে পুরুলিয়া ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া আপন আপন বাস ভবনে গমন করিলাম। ঐ দিবস আমার

একাদশী ছিল সুতরাং পুরুলিয়া পৌঁছিয়া জলপান করিয়া সুস্থ হইলাম বাসার সকলেই সুস্থ আছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। আমার পত্নীকে সকল কথা বলায় তিনি আনন্দিতা হইলেন। দাদা মহাশয় এই পূজার সময়ে বাটী গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং আমি একাকী সন্ধ্যার সময়ে আত্ম কার্য্য করিতে বসিতাম। ক্রমে পূজার ছুটী ফুরাইল, দাদা মহাশয় বাটী হইতে পুরুলিয়ায় প্রত্যাগমন করিলেন। তখন আমার আনন্দ দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি হইল। আমরা দুইজন ভ্রাতায় একঘরে বসিয়া বাবার কার্য্য করিয়া আনন্দ পাইতে লাগিলাম। প্রত্যূষেও আমি বাটীর মধ্য হইতে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন অন্তে বহির্বাটীতে দাদা মহাশয়ের নিকট মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলাম। যেন এক নব জীবন প্রাপ্ত হইয়া দিন দিন স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে লাগিলাম।

১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে আমার পত্নী সন্তান সম্ভাবিতা বিধায় এক মাসের বিদায় গ্রহণ করিয়া জামালপুর গমন করিলাম। প্রিয়নাথ এবং দাদা মহাশয় পুরুলিয়ার বাসায় রহিলেন। জামালপুর পৌঁছিয়া এবং গুরুদেবের তিন চারটি আশ্রিত শিষ্যের দর্শন লাভ করিয়া পরম সুখী হইলাম, এবং আত্ম কার্য্যের সংশোধন করিয়া লইলাম। কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া নলডাঙ্গায় রওনা হইলাম। কলিকাতায় পরাৎপর ইষ্টদেবের শ্রীচরণ দর্শন না করিয়াই প্রাতের গাড়ীতে শিয়ালদহ রওনা হইলাম এবং বনগ্রাম ষ্টেশনে নলডাঙ্গার কয়েকটী ভদ্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বড়ই সুখী হইলাম। সাড়ে তিনটা অপরাহ্নে যশোহরে অবতরণ করিয়া আমরা সকলেই অশ্বশকটে নলডাঙ্গা রওনা হইলাম।

অধিক রাত্রি হওয়ায় আর কোন স্থানে না যাইয়া নলডাঙ্গা গ্রামের একজন তালুকদার বন্ধু গিরিজাভূষণ দেবরায় মহাশয়ের

বাটীতেই আহারাদি নির্ব্বাহ করিয়া বিশ্রাম করিয়া শারীরিক ক্লেশের অবসান করিলাম। পরদিবস প্রাতে আমার বাল্য বন্ধু শ্রীযুক্ত লাল-মোহন চট্টোপাধ্যায় মাতুল মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অশেষ আনন্দিত হইলেন যে কয় দিবস নলডাঙ্গায় ছিলাম, তাঁহার বাটীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যাকালে নিজের কার্য্য করিতে তাঁহার বহির্ব্বাটীর গৃহে আসন করিয়া ঘর অন্ধকার করতঃ বসিতাম। কিন্তু আমার বন্ধুটী আমার কার্য্যটী দেখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা সত্বেও তিনি সফল মনোরথ হইতে পারিলেন না।

এই আত্ম কার্য্য সম্বন্ধে গ্রামস্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তিবর্গকে আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম সত্য, যাহা বলিলাম, তাঁহাদিগের মঙ্গলের জন্য বটে, তাহাতে হাস্যাস্পদ হইলাম; ইহা স্বভাবসিদ্ধ মানবের ধর্ম্ম। মানব মায়াতে এত মুগ্ধ এবং অন্ধ যাহা তাঁহার পূর্ব্ব হইতে সংস্কার গত হইয়াছে, তাঁহাই ভাল ভাবিয়া পক্ষীর ন্যায় আওড়াইয়া থাকেন, তাহাতে যে বিশেষ কিছু ফল উপলব্ধি করেন তাহা নহে, তবে কোট বজায় রাখিতে মন্দকেই ভাল বলিয়া হৃদয়ে ধারণা করিয়া বাক যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন, এখানে তাহাই হইল। আমি যে ঠকিয়াছি এবং অন্যান্য সকলকে ঠকিবার কৌশল বলিয়া দিতেছি এইরূপই তাহাদের ধারণা হইল। গুরু কৃপায় ইহাতে আমার মনোমালিন্য ঘটে নাই। যাঁহার মন ঐ কালিন সত্ত্ব গুণে ছিল, তাঁহারা হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে ইহা সার বলিয়া ধারণা করিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে মন অন্য গুণাবলম্বি হইয়া পূর্ব্ব গুণকৃত ধারণাকে নষ্ট করিয়া দিল। এইরূপ দেবাসুরের যুদ্ধ অনবরত আপন আপন শরীরে চলিতেছে, কয়টী জীব সে দিকে লক্ষ্য করিতে পারেন। সময় না হইলে কিছুই হয় না, তথায় আট দশ দিন অতিবাহিত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ খাজনা আদায় অন্তে কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলাম।

গুপ্তনগরের মুন্সি ৺অভয়চরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত

সরোজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর অসুস্থ বিধায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য নলডাঙ্গায় আমাকে সংবাদ দেন সুতরাং যাইবার সময় পথিমধ্যে গোশকট রক্ষা করিয়া তাঁহার বাটী গমন করি। ইনি আমার একজন বাল্য সহচর; শয্যাগত দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। নানা প্রকার কথোপকথনে পরে জানিতে পারিলাম তিনিও আমার ইষ্টদেবের নিকট আত্ম কার্য্যের উপদেশ প্রায় তিন চার বৎসর পূর্ব্বে পাইয়াছেন। ইহাতে বড়ই আহ্লাদ হইল। তথায় কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিয়া কালিগঞ্জে গোশকটে রওনা হইলাম। কালিগঞ্জ হইতে অশ্বশকটে যশোহর রওনা হইলাম।

পর দিবস প্রত্যুষে শিয়ালদহ ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া শিয়ালদহ হিন্দু আশ্রমে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লুপ ডাক গাড়ীতে জামালপুর গমন করিলাম। জামালপুরে তিন চার দিবস পরে আত্ম কার্য্যে অতি অভাবনীয় দর্শন লাভ হইল, এত আনন্দ ইহার পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। পূর্ব্ব জন্মের ভাগ্যবলে হৃদয় গহ্বরে নিধির বাজার বসাইলাম, সকলই গুরু কৃপা। কয়েক দিবস দাঁতের পীড়ায় কষ্ট পাইয়া আরোগ্য লাভ করিলাম। পরে একাকী পুরুলিয়া গমন করিয়া দাদা মহাশয়ের চরণ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলাম। আমার পুরুলিয়া-গমনের সাত আট দিবস পরে আমাদিগের অফিস কোলঙ্গায় উঠিয়া যাইল। সুতরাং আমি ও প্রিয়নাথ ভায়া অন্যান্য বাবুদিগের কোলঙ্গা যাইবার তিন চার দিবস পূর্ব্বেই পৌছিলাম। যাইয়া শুনিলাম আমার সহকারী রঙ্গলাল বাবু ছোট সাহেবের সহিত কলহ করিয়া কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে বেঙ্গল নাগপুরের প্রধান ডাক্তার এ্যাণ্ডারসন সাহেবকে একখানি পত্র প্রদান করি এবং রঙ্গলাল বাবুকে একখানি উত্তম প্রশংসা পত্র দিয়াছিলাম। তাঁহার অতি সত্বর বেঙ্গল নাগপুর লাইনের গিডনি নূতন লাইনে চল্লিশ টাকা বেতনে ডাক্তারের পদে কার্য্য হয়। কিছু

দিবস পরে আরও দুইটী বাঙ্গালী বাবু এই কোম্পানীর অফিসে নিযুক্ত হন। আমরা সকলেই একত্রে থাকিতাম। প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে তাঁহার কার্য্য করিয়া পরিতৃপ্ত হইতাম। ধারণা হইতে লাগিল যেন গুরুদেব এ অধমাধম শিষ্যের প্রতি কৃপা পরতন্ত্র হইয়া সমস্ত বিষয় আমাকে দেখাইয়া দিয়া তাঁহার প্রদত্ত কার্য্যের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন।

সন ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কোলঙ্গা হইতে পুরুলিয়া যাইবার আদেশ পাইয়া ঐ মাসের শেষ ভাগে পুরুলিয়া যাইয়া পূজনীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায় দাদা মহাশয়ের বাসায় আহারাদি করিতে লাগিলাম। ঐ সময়ে তিনি পুরুলিয়াতে পরিবার আনিলেন এবং দুই ভ্রাতায় একাসনে বসিয়া মনের আনন্দে আত্ম কার্য্য করিতাম। আমি আহারান্তে রাত্রে বজরঙ্গী বাবুর বাসায় শয়ন করিয়া থাকিতাম। একটী বাসা স্থির করিয়া এবং আট দিবসের বিদায় লইয়া জামালপুর হইতে পরিবার আনিলাম। জামালপুরে যাইয়া শুনিলাম আমার শ্যালক বাবু রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক ক্রিয়া পাইয়াছেন, তাহা ভিন্ন ঐ কেশবপুর পাড়ার আরও ছয় সাত জন ভদ্র লোক বাবার আশ্রয় পাইয়া আনন্দে তাঁহার কার্য্য করিতেছেন। ইহার পাঁচ মাস পূর্ব্বে আমার একটী পুত্র সন্তান শ্রীমান রাধাগোবিন্দ বাবাজীবনের জন্ম হয়। আমি আগষ্ট মাসে পরিবার আনিবার জন্য সব ঠিক করিয়াছি ঐ দিবসই গাংপুর হইতে আমাদের ম্যানেজার সাহেবের নিকট হইতে একটী তারের সংবাদ পাই যে আমি যেন কালবিলম্ব না করিয়া রাজ কন্যার পীড়ার চিকিৎসার জন্য চলিয়া আসি। ঐ দিবস অপরাহ্নের গাড়ীতে পুরুলিয়া রওনা হইলাম; যথা সময়ে আসানসোল পৌছিয়া প্রত্যুষের গাড়ীতে পুরুলিয়া গমন করি। প্রাতে নয় ঘটিকার সময়ে পুরুলিয়া ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পাল্কী ও গাড়ী যোগে আমার মামা শ্বশুর

প্রতাপ বাবুর বাসায় সপরিবারে উপস্থিত হইলাম আমার মামা শ্বশুর পাল্কী লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

ঐ দিবস অপরাহ্নের ডাক গাড়ীতে গাংপুর রওনা হইলাম; উপস্থিত পরিবারবর্গ প্রতাপ মামার বাসায় থাকিল। আমি কোলঙ্গায় আমার সহকারিকে তারে সংবাদ করি যে ভীমঠাকুরকে যেন কুমার ফেলার ষ্টেশনে গাংপুর যাইবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে আমার সহকারী, আমার শ্যালক প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় দশ টাকা বেতনে কম্পাউণ্ডারের কার্য্য করিতেছিল। তাঁহাকে এক বৎসর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে "ভৈষজ্য রত্নাবলী" পুস্তক পড়ান হয় এবং যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া কম্পাউণ্ডারের উপযোগী করান হয়, সুতরাং এতদিন পরে দয়াময় এই গরীব ব্রাহ্মণ কুমারকে অন্ন সংস্থান করিয়া দিলেন। যাহা হউক আমি কুমার ফেলা ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই প্রিয়নাথ এবং ভীম ঠাকুরকে পাইলাম এবং ভীম ঠাকুরকে লইয়া ঝাড়সোগড়া ষ্টেশনে রওনা হইলাম, এবং রাত্রি দশ ঘটিকার সময়ে ঝাড়সোগড়া ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম।

শ্রাবণ মাস বৃষ্টি পড়িতেছে আমি ও ভীম ঠাকুর টিকিট দিয়া ভিজিতে ভিজিতে বাহির হইলাম। মনে এই ধারণা করিলাম, ঝাড় সোগড়ার প্রসিদ্ধ ধনী বাবু ভোলানাথ বড়ুয়া কাষ্ঠের কারবারী। তাঁহার বাসায় যাইব এইটী স্থির করিয়া অজানিত স্থানে পথ বহিয়া যাইতেছি, এমন সময় মধ্য পথে ভোলানাথ বাবুর একজন পরিচারকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, ঐ লোক আমাদিগকে লইয়া চলিল। তথায় রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। ঐ বাসায় যাইয়া দেখি গাংপুর রাজার বড় রাজকুমারের একজন শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গাংপুর যাইবার জন্য ঐ বাসায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহারও যে গতি আমারও তাহাই হইবে কিন্তু তিনি ঘোটক আরোহণে যাইতে সক্ষম আমি কিন্তু অনভ্যস্ত। আমি পরদিবস আমাদিগের সাহেবকে গাংপুরে সংবাদ পাঠাইলাম।

ইহার তিন চারি দিবস পরে তথা হইতে ডুলি আসিল, সুতরাং অতি দুর্গম পথে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ডুলি যোগে বেলা আন্দাজ এক ঘটিকার সময় ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। কয়েক মাস পূর্ব্বে একদিন কুমার ফেলা ষ্টেশনে গাংপুরের বড় রাজকুমার ঐ ষ্টেটের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, ঘোড়া আনয়ন করাইয়া প্রবোধ বাবুসহ ঐ দিবস রওনা হইলেন। আমিও বাঁশের দোলায় চড়িয়া জঙ্গলে মাথা দিলাম, মাথা লইয়া ফিরিব কিনা জানি না। পথিমধ্যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবল নদী পার হইতে হইল। অর্দ্ধমৃত অবস্থা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এইরূপ কষ্ট ভোগ করিয়া তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলাম। এই তিন ক্রোশ সম্বলপুর জেলার অন্তঃর্গত তৎপরে একটী নদী, ঐ নদী বহু কষ্টে পার হইয়া গাংপুর মিত্র রাজের রাজ্য মধ্য দিয়া চলিলাম। রাজার কৃত একটী রাস্তা গাংপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে, বৃষ্টিতে ঐ রাস্তার অনেক অংশ ভগ্নাবস্থায় পরিণত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে গ্রাম দৃষ্টিগোচর হইল, অতি সামান্য সামান্য কুটির সংযুক্ত। গ্রামে গ্রামে কোতোয়াল এবং পঞ্চায়েৎ আছে, কাহার কিছু আবশ্যক হইলে এবং গাংপুর যাইতে যদি কোন গ্রামে আশ্রয় লইতে হয়, রাজার আদেশ মত ঐ কোতোয়াল এবং পঞ্চায়েৎকে আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে এইরূপ নিয়ম। পঞ্চায়েতের উপাধি এখানে গঞ্জু বলিয়া অভিহিত। সন্ধ্যা হইলে আমরা একখানি গ্রামে আশ্রয় লইলাম এবং গঞ্জুকে ডাকাইয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। এই গঞ্জুকে জোর করিয়া ধরিলে দুগ্ধ মৎস্য সকলই পাওয়া যাইতে পারে।

যাহা হউক রাজার একখানি দুচালা ঘরে আশ্রয় পাইলাম এবং ভীমঠাকুর আহারাদির আয়োজন করিয়া দিল। আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়া অতি প্রত্যুষে গাংপুর রাজ বাটীতে রওনা হইলাম। এই

গ্রাম হইতে গাংপুর অধিক দূর ছিল না। সুতরাং প্রাতে নয় ঘটিকার মধ্যেই রাজবাটী পৌঁছিলাম। রাজবাটী দ্বিতল অট্টালিকা, জেলখানাও ইষ্টক নির্ম্মিত দেখিলাম। রাজার জঙ্গল বিভাগের বাবুর বাসায় অবতরণ করিয়া রাজ বাটীতে আমার আগমন বার্ত্তা প্রেরণ করিলাম। রাজ কন্যাকে দেখিবার জন্য সেই মুহূর্ত্তেই রাজবাটী হইতে লোক আসিয়া আমাকে লইয়া চলিল। রাজ কন্যাকে দেখিলাম, রাজা কুসংস্কারের বশতাপন্ন, ইনি উড়িষ্যা দেশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, কত লোক রাজ কন্যাকে চিকিৎসা করিতে আসিয়াছে তাহার শেষ নাই, সে যেন চিকিৎসকের মেলা বলিলেই হয়। চিকিৎসক নামে,—কার্য্যে কয়জন জানি না। কেহ ঝাড়িতেছে, কেহ ফুঁকিতেছে, কেহ মন্ত্র পাঠ করিতেছে, একদিকে রামায়ন এবং অন্য দিকে চণ্ডী পাঠ হইতেছে, সকলেই ব্যস্ত। কোন প্রকারে রাজ কন্যাকে আরোগ্য করিয়া পারিতোষিক লইবে। আমি তো অবাক্!

যাহা হউক আমার প্রদত্ত ঔষধিতে রোগীর ব্যাধির কথঞ্চিৎ উপশম হওয়ায় অন্যান্য অসভ্য চিকিৎসকগণ নানা প্রকার অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল। আমি আট নয় দিবস পরেই সাহেবের অনুমতি লইয়া এবং রাজ প্রদত্ত উপহার ও পঁচিশ টাকা গ্রহণ করিয়া পাল্কিযোগে পুরুলিয়া যাইবার জন্য রওনা হইলাম। রাজবাটির পাল্কি ও অধিক বেহারা ছিল বলিয়া সত্বর ঝাড়সোগডা পৌঁছিলাম। সন্ধ্যার সময়ে ভোলানাথ বাবুর বাসায় আহারাদি নির্ব্বাহ করিয়া ডাক গাড়ীতে পুরুলিয়া যাত্রা করিলাম। প্রাতে কোলঙ্গায় অবতরণ করিয়া তথাকার কার্য্য শেষ করিয়া পুনরায়, রাত্রের ডাক গাড়ীতে পুরুলিয়া রওনা হইলাম। পুরুলিয়ায় পৌঁছিয়া দেখিলাম আমলা পাড়া রাস্তার ধারে আমার বাসা বাটী হইয়াছে, প্রতাপ বাবু আমার পরিবারবর্গকে তাঁহার বাসায় একদিন মাত্র রাখিয়া এই বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছেন,

নূতন স্থানে নূতন বাসায় ইহাদিগকে কি করিয়া রাখিলেন জানি না। ক্রমে কোলঙ্গার সমস্ত আমলাবর্গ এবং সিদ্ধেশ্বর বাবুও পুরুলিয়ায় সপরিবারে আগমন করিলেন। আমি প্রায় প্রতিদিন বৈকুণ্ঠনাথ দাদা মহাশয়ের বাটীতে সন্ধ্যার সময়ে আত্মকার্য্য করিতে যাইতাম এবং উভয়ে অতুল আনন্দ অনুভব করিতাম। মধ্যে মধ্যে কোলঙ্গায় রোগী পরিদর্শন করিতে আসিতে হইত এবং সময়ে সময়ে প্রিয়নাথ ভায়ার পত্রানুসারে কঠিন রোগী হইলে দেখিতে যাইতে হইত। সুতরাং বামদেব ও মতিবাবুর সহিত দেখা সাক্ষাৎ প্রায়ই হইত এবং রাউকেলায় অবতরণ করিয়া একত্রে কার্য্য পরিদর্শন করিয়া যাইতাম। সাহেব বাহাদুর কৃপা করিয়া আমাকে বৎসর বৎসর অন্যান্য কোম্পানীর আমলাদিগের ন্যায় একশত পঞ্চাশ—দুইশত টাকা দস্তুরি দিতে লাগিলেন।

সাধন ও আত্ম-বিভূতি দর্শন

গুরুদেবের আদেশ মত দ্বিতীয় ক্রিয়া প্রাপ্তির পরে রাত্রে আট ঘণ্টা ক্রিয়া করি। ছোট নাগপুরে গ্রীষ্ম কালে 'লু' অর্থাৎ গরম হাওয়া বহে। তাহা তাচ্ছিল্য করিয়া দোতালায় শয়ন ঘরের পার্শ্বের কামরায় যে ঘরে জানালা ছিল না, দুয়ার বন্ধ করিয়া, কম্বলের উপরে মৃগ চর্ম্ম পাতিয়া সাধন কার্য্যাদি করিতাম। ডাক্তারি কার্য্য সমাপনান্তে শুদ্ধাচারে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় সাধন করিতে বসিতাম। আমার মধ্যমা ধর্ম্ম পত্নী, যিনি পুরুলিয়া অবস্থিতি কালিন গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে আমার দ্বারা আত্ম কর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হয়েন, তিনি পৃথক আসনে মৃগচর্ম্মের উপর সাধন করিতে বসিতেন, তৎকালিন তিনি প্রথম সোপানে ক্রিয়া করিতেন।

তিনি যোগ শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, দ্বিতীয় ক্রিয়া দেখিতে অনধিকারিনী বিধায় এবং ঐ ঘরের মধ্যে আলো থাকা নিসিদ্ধ বিধায়, ঘরের বারান্দায় আলো রাখা হইত। তাঁহার কার্য্য শেষ হইলে তাঁহার শয়ন কক্ষে গমন করিতেন এবং আমার আদেশ মত আহারাদি শেষ করিয়া, পুত্রদ্বয় (গোপাল, গোবিন্দ) সহ শয্যায় বিশ্রাম করিতেন। আমি রাত্রি এগার ঘটিকার সময়ে কার্য্য শেষ করিয়া শয়ন কক্ষে আসিয়া কম্বলে উপবেশন করিয়া ধুমপান অন্তে দুইটী যোগ সঙ্গীতের গান একতারা সাহায্যে গাহিতাম পরে যৎকিঞ্চিৎ রুটি আহার করিয়া ধুমপান অন্তে শয়ন করিতাম। ঐ সময়ে আমার মস্তকের কেশ অধিক ছিল এবং দাড়ি ছিল। তৎপরে রাত্রি আড়াই ঘটিকায় শয্যা হইতে উঠিয়া ধুমপান অন্তে মলত্যাগ করিয়া এবং হস্ত মুখ ধৌত করিয়া বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ব মত নির্দ্দিষ্ট ঘরে সাধনায় বসিতাম। আমার স্ত্রীও হাতমুখ প্রক্ষালন

অন্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে সাধনে বসিতেন। আমি ভোর রাত্রে উভয় ক্রিয়া সমাপন অন্তে, প্রাতে ছয় ঘটিকার সময়ে ডাক্তারি কার্য্যে সং সাজিয়া বাহির হইয়া যাইতাম আমার পত্নীও আসন হইতে উঠিয়া সংসারের কার্য্যে ব্রতী হইতেন। ঐ সময়ে পাচক ব্রাহ্মণ ও চাকরাণী ছিল। আমার রাত্রে আট ঘণ্টা সাধন হইত। এইরূপ আট ঘণ্টা সাধন আট নয় বৎসর চলিয়া ছিল।

ঝিকে প্রথম প্রথম আন্দাজ আড়াই ঘটিকা রাত্রে আমাকে উঠাইয়া দিতে বলা হয়। একদিন উঠাইতে পারে নাই সত্য; কিন্তু ঠিক আড়াই ঘটিকার সময়ে গুরুদেবের সুরে কে আমাকে উঠাইয়া দেন, গাত্র রোমাঞ্চিত হইল। এক রাত্রে সাধন কালিন, কূটস্থের মধ্যে আমার অবয়ব দর্শন হয়, সম্মুখে গুরুদেব সিংহাসনে উপবেশনে রহিয়াছেন দৃষ্টিগোচর হয়, ক্ষণিক পরে ঐ মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন হইয়া, পরম গুরুদেব হইলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরে, পূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন হইয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধৃত জটাধারী এবং মস্তকে সর্প ফণা বিস্তার করিয়া দুলিতেছে, অর্দ্ধনেত্র বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ শিব মূর্ত্তি, তাঁহার ভ্রুদ্বয়ের মধ্যস্থলে প্রজ্জ্বলিত তৃতীয় চক্ষু বিরাজিত। ক্ষণিক পরে চক্ষুদ্বয় বিস্তার করিয়া পলক পতিত অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়। গুরুদেব হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন "গুরু বিশ্বেশ্বর সাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম।" যিনি দেখিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন। অপরের অবিশ্বাস। মন প্রাণ যুক্ত করিয়া সাধনে সকলই হয়।

জিহ্বা গ্রন্থি ছিন্নভিন্ন হইলে কিয়ৎ পরিমাণে কামনার দর্পহীনতা হয়, সেই সময়ে দেহ রাজ্য ধ্বংস আশঙ্কায় ইন্দ্রিয়গণ ভয়প্রদর্শন করাইয়া সাধন বন্ধ উদ্দেশ্যে নানারূপ ভীতিপ্রদ দৃশ্য সাধক হৃদয়ে আবির্ভাব করে। যাহাতে সাধক নিষ্কাম কর্ম্ম স্বরূপ সাধন বন্ধ করে। তাহার বিবরণ,— সাধন অবস্থায় এক রাত্রে ঘর জোড়া প্রকাণ্ড মুখ, চক্ষু দু'টী ইঁদারার তুল্য, মুখ প্রসারিত, যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে দৃষ্টি গোচর হয়। তাহা

দর্শন করিলে ভয়ানক আশঙ্কা হয়। কূটস্থে লক্ষ্য রাখিলে তাহা অনেকক্ষণ পরে অন্তর্হিত হয়।

একরাত্রে আমাদের সম্মুখে কতকগুলি কদাকার রূপ বিশিষ্ট প্রেতের নৃত্য দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা গুরু স্মরণে অন্তর্দ্ধ্যান হয়। প্রকাণ্ড সর্প ফণা বিস্তার করিয়া আমাদের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান দৃষ্টিগোচর হয়, গুরু স্মরণে অন্তর্দ্ধ্যান হয়। একরাত্রে সাধন কালিন মনে হইল, আমি যেন একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতের গুহায় কোন যোগী পুরুষের সম্মুখে বসিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেছি। কোলঙ্গায় প্রত্যাগমন কালিন গুহা হইতে আসিবার জন্য যেমন উঠিলাম, তৎক্ষণাৎ গুহার ঊর্দ্ধে প্রস্তরে মস্তকে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায়, চীৎকার করিয়া আর্ত্তনাদ করায় আমার পত্নী নিকটে আসনে বসিয়া ক্রিয়া করিতেছিলেন, তিনি কি হইল, কি হইল, বলিয়া জিজ্ঞাসু হইলেন। আমি বলিলাম,—বাহির হইতে আলো আনিয়া দেখ আমার মস্তকের তালুতে রক্ত পড়িতেছে কি না? তিনি ছুটিয়া আলো আনিয়া মস্তক দেখিয়া বলিলেন,—রক্ত দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত মস্তকের তালুতে ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করায় সমস্ত বিবরণ বলিলাম, তাহার পরে ক্রমে ক্রমে যন্ত্রণা তিরোহিত হইল।

একরাত্রে সাধন অবস্থায় দেখি, আমি যেন একটা বেড়ার পশ্চাতে বসিয়া সাধন করিতেছি। সম্মুখে জঙ্গল, ঐ জঙ্গল হইতে একটী প্রশস্ত রাস্তা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ঐ রাস্তা উচ্চ হইতে নিম্নগামী হইয়াছে। তথায় একটী প্রকাণ্ড নদী, নদীর অপর পার দৃষ্টিগোচর হইতেছে, নদীর অপর পারে ময়দান, রাত্রিকাল চন্দ্র ও নক্ষত্র সকল স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সাধনও চলিতেছে, এমন সময় দেখিলাম, নদীর নিম্নদিক হইতে একটী প্রকাণ্ড জন্তু আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, আমি বেড়ার অপর দিকে আসন করিয়া ক্রিয়া করিতেছি, সেই প্রকাণ্ড জন্তুটি ধীর পদসঞ্চারে

বেড়ার বিপরীত দিকে আমার সম্মুখে উপবেশন করিল। কিন্তু সামান্য বেড়া, ব্যবধান অতি নিকট। আমি উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, উহা একটী প্রকাণ্ড কেশর-সংযুক্ত সিংহ; মূর্ত্তি ভয়ানক প্রকাণ্ড, আমার সম্মুখে বসিয়া পুচ্ছ আন্দোলন করিতে লাগিল। কট্‌মট্‌ চাহনি, জিহ্বা মুখগহ্বর হইতে বহির্গত, দেখিয়াই একটু বিচলিত হইলাম বটে, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে গুরুদেবকে স্মরণ করায় সিংহটি উঠিয়া নদীর দিকে রাস্তা ধরিয়া চলিয়া গেল। কি ভীষণ মূর্ত্তি!

একরাত্রে কদম্ব বৃক্ষতলে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি, চতুর্দ্দিকে গোপগণ দণ্ডায়মান দৃষ্টিগোচর হইল। একদিন সরস্বতী মূর্ত্তি দর্শন ইত্যাদি অনেক মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ইতিপূর্ব্বে দেওঘরে যাইয়া তৃতীয় ক্রিয়া লইয়া আসি। দুই শত দিবসে এই ক্রিয়া সমাধা হইবার কথা, এই ক্রিয়াই সমুদ্র মন্থন। একশত দশ দিবসে আসনে বসিয়া যখন এই ক্রিয়া করি, আমার পত্নীও ঐ অন্ধকার ঘরে বসিয়া ক্রিয়া করিতেছিলেন। তিনি আমার অস্ফুট কাতর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় অর্থাৎ আমি যেন সেই দিনেই মৃত্যুমুখে পতিত হইব, হৃদয় বিদারক দৃশ্য তাঁহাকে দেখিতে হইবে ভাবিয়া, মোহ বশতঃ নিজ শয্যায় শয়ন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে কালাতিপাত করেন।

আমি আমার সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া যখন শয়ন কক্ষে গমন করি, আমার স্ত্রী তাবৎ কালতক নিদ্রা না যাইয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন, আমি ঐ গৃহে প্রবেশমাত্র আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠেন, "তুমি যদি ঐরূপ কাতরতার সহিত ঐ কার্য্য কর কল্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, আমাকে অকালে বিধবা করিও না, সন্তানগুলির দিকে লক্ষ্য কর। কল্য তোমাকে ঐ কার্য্য করিতে দিব না। আর না হয় গুরুদেবকে এই কষ্টের কাহিনী লিখ, তাঁহার উত্তর পাইলে তদনুসারে কার্য্য করিবে। তোমার চরণ ধরিয়া বলিতেছি আর সংখ্যা বাড়াইও না,

গুরুদেবের পত্র পাইলে আদেশমত কার্য্য করিও।” আমি তাঁহার আর্ত্তনাদে মোহিত হইয়া ভীত হইয়া এই ক্রিয়ার কাহিনী লিখিলাম এবং পত্রোত্তর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত একশত দশ সংখ্যাই কার্য্য করিতে লাগিলাম। গুরুদেব উত্তর দিলেন, যদি একশত দশ সংখ্যার ঊর্দ্ধ সংখ্যা করিতে অপারক হয়েন, একশত সংখ্যায় নামিয়া আবার প্রতিদিন একটি করিয়া বাড়াইয়া দুইশত সমাধা করিবেন।

এই উত্তর প্রাপ্ত হইয়া ভাবিলাম, ইহা প্রবৃত্তি-পক্ষের সেনাপতি ভীষ্মের, অর্থাৎ ভয়ের ছলনামাত্র। যখন অন্তর্যামি ভগবান গুরুদেব প্রতিদিন একটি করিয়া বাড়াইয়া দুইশত দিনে এই ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে আদেশ দিয়াছেন, তবে কেন মৃত্যুভয়ের বশতাপন্ন হইয়া অবিধি কার্য্য করিব। ইহা চিন্তা করিয়া আমার পত্নীকে কহিলাম,—তুমি পত্নী হইয়া আমার ধর্ম্মের বাধা দিওনা। গুরুদেব সিদ্ধ মুক্ত পুরুষ ত্রিকালজ্ঞ, যাহা আমার দ্বারা সমাধা হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া এই কঠিন হৃদয় গ্রন্থি ভেদের কার্য্য দয়া করিয়া আমার মঙ্গলের জন্য দান করিয়াছেন; তাহা তোমার ন্যায় ধর্ম্মপত্নী হইয়া উৎসাহ সাহস না দিয়া আমাকে মায়ার বশে আমার জীবন ভয়ে বিঘ্ন প্রদান করা কি ভাল?

আমি গুরুদেবের পূর্ব্ব আদেশ মত অদ্য হইতে একশত এগারটি জপ সুরু করিয়া ক্রমে ক্রমে দুইশত দিনে সমাধা করিব। তুমি ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় ভীত না হইয়া আমাকে অনুমোদন কর। একদিন তো মরিতেই হইবে তবে অগ্র পশ্চাৎ। যদি গুরুদেবের সম্মুখে আসনে মৃত্যুই সংঘটন হয় তাহা তোমার বংশের গৌরব। এই সকল দলিল পত্র লও। মৃত্যু হইবে না জানি, যদি হয়, তোমার মাসিপুত্র আমার বাসায় রহিয়াছেন টাকাও রহিয়াছে তোমার পিতাকে তারে সংবাদ দিলে তোমাদিগকে জামালপুরে লইয়া যাইবেন। যে সম্পত্তি আছে এবং দুই তিন হাজার টাকা পোষ্টাফিসে আছে তাহাতে সংসার দুঃখে কষ্টে চলিয়া

যাইবে, ভগবান গুরুদেব সহায় থাকিবেন। এই কথা বলায় তিনি আনন্দচিত্তে ঐ কার্য্য করিতে উৎসাহ দান করিলেন এবং বলিলেন আমার বিশ্বাস আমি বিধবা হইব না। সুতরাং ভীষ্মের আক্রমণকে তুচ্ছ করিয়া সেই দিন রাত্রি হইতে গুরুদেবের পূর্ব্ব আদেশ মত কার্য্য বাড়াইতে লাগিলাম।

ও, হরি! কিছুই হইল না, ক্রমে ক্রমে দুইশত দিনে কার্য্য শেষ করিয়া গুরুদেবকে জ্ঞাপন করায় তিনি আমাকে উৎসাহযুক্ত পত্র লিখিলেন। একদিন বেলা বারোটার সময়ে সাধন করিতেছি, রান্নাঘরে আমার পত্নী রান্না করিতেছিলেন, হঠাৎ বলিলাম,—দেখ আমার রাউরকেলা ষ্টেশনে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। এই কথা শুনিয়া আমার পত্নী বলিলেন,—পাগলের মত কি বলিতেছ, তুমিত তিন চার মাস ঐ দিকের ষ্টেশনে যাও নাই, তবে বিনা কারণে এইরূপ ইচ্ছা হয় কেন? আমি বলিলাম, বলিতে পারি না কেন আমার মনে এই কল্পা উদয় হইল। স্নানান্তে গীতা পাঠ করিয়া গুরুদেবকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতেছি, এমত সময়ে সিদ্ধেশ্বর বাবুর চাকর আমার বাসায় আসিয়া বলিল—কুমারফেলা ষ্টেশন হইতে বামদেব বাবু রেলওয়ের সহকারী ইনেস্পেক্টার বাবু, বাবুর বাসায় আসিয়া ধুমপান উদ্দেশ্যে আপনার হুকা চাহিতেছেন। আমি বলিলাম—তামাকু সাজিয়া হুকাটি লইয়া যাও, আহারান্তে আমি তথায় যাইতেছি।

বামদেব বাবু আমার বন্ধু ক্রিয়ান্বিত, তিনি আমার হুকা ব্যতিত অন্য কোন ব্রাহ্মণের হুকায় তামাক খাইতেন না, আমিও তাঁহার হুকা ব্যতীত অন্য কাহারও হুকায় ধুমপান করিতাম না। যাহা হউক আহারান্তে সিদ্ধেশ্বর বাবুর বাসায় যাইলাম, বামদেব বাবু আমাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—নগেন্দ্র বাবু রেলওয়ে ইন্স্পেক্টার (বামদেব বাবুর উচ্চতম কর্ম্মচারি) যিনি ইহার পরের ষ্টেশন রাউরকেলায় থাকেন, তিনি এক-

খানি পত্র আপনাকে শুনাইবার জন্য লিখিয়াছেন, আপনি শ্রবণ করুন। এই বলিয়া পত্রখানি পাঠ করিলেন।

তিনি লিখিয়াছেন বামদেব, এই পত্র শ্রীশ বাবুকে পড়িয়া শুনাইবে আমি চক্ষু প্রদাহে কষ্ট পাইতেছি, রেলওয়ে ডাক্তার বাবুর ঔষধিতে কোন উপকার হইল না। তিনি এই সংবাদ শ্রবণ করিলে আমাকে দেখিতে আসিতে চাহিবেন, তুমি ঠেলাগাড়ী যোগে শ্রীশ বাবুকে রাউরকেলায় লইয়া আসিবে। আমি অতিশয় চক্ষের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তিনি দেখিয়া ঔষধি ব্যবস্থা না করিলে আমার চক্ষু দুইটি নষ্ট হইবে। আমি পত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলাম। বামদেব বাবু কহিলেন,—নগেন বাবু কাতর হইয়া আপনাকে মিনতিসহ তাঁহাকে দেখিবার জন্য লিখিয়াছেন, আপনি দাদা মহাশয় হাসিতেছেন। আমি কহিলাম—বেলা বারোটার সময়ে আমার পত্নীকে রাউরকেলা ষ্টেশনে যাইবার জন্য বলিয়াছিলাম, তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন তজ্জন্যই হাসিতেছি। তিনি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

আমি বাসায় আসিয়া আমার পত্নীকে এই সংবাদ বলায় তিনিও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তবে বলিলেন,—ম্যানেজার সাহেবের আদেশ ব্যতীত তুমি কি করিয়া যাইবে। আমি বলিলাম,—যখন আমি যাইব বলিয়াছি ম্যানেজার সাহেব নিশ্চয় আদেশ দিবেন। আমি সেই মুহূর্ত্তে সাহেবকে নগেন্দ্র বাবুর চক্ষের পীড়ার কথা বলায় আমাকে ট্রলিতে যাইতে আদেশ দিয়া বলিলেন,—কখন কোলঙ্গায় প্রত্যাগমন করিবেন। আমি কহিলাম—সন্ধ্যার গাড়ীতে ফিরিয়া আসিব।

আমরা উভয়ে ট্রলিতে রাউরকেলা যাত্রা করিলাম। দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, মনে মনে ধুমপান করিবার বড়ই ইচ্ছা হইল। আশ্চর্য্য! সেই মুহূর্ত্তে বামদেব বলিলেন,—দাদা মহাশয় আপনার ধুমপান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে না। আমি হাসিয়া বলিলাম নিশ্চয়ই।

তখনই একটী কটক হইতে অগ্নি আনাইয়া তামাক সাজাইয়া দিলেন।

কোন সময়েই বিনা জলপাত্রে পায়খানায় যাই নাই, কিন্তু একদিন বেলা দুইটার সময়ে বিনা জলপাত্রে পায়খানায় যাই, মলত্যাগ অন্তে গাড়ু না দেখিয়া অবাক, এই সময় আমার পেটের অসুখ হয় নাই। শয়ন ঘরের পার্শ্বেই পায়খানা, কি করি, আমার স্ত্রীকে ডাকিতে লাগিলাম, তিনি বলিলেন—পায়খানা হইতে ডাকিতেছ কেন? আমি কারণ বলায় তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পায়খানার পার্শ্বদিকে জল সমেত গাড়ু দিয়া লজ্জা নিবারণ করিলেন সত্য, কিন্তু আমার এই ভুলের জন্য গুরুদেবকে পত্র লিখি। তাহাতে ইহাও উল্লেখ করি, বাবা আমি ডাক্তারি কার্য্য করি, কত প্রকার বিষাক্ত ঔষধির ব্যবস্থা করিতে হয়; ভুলক্রমে যদি মাত্রাধিক্য হয় তবেইত রোগীর প্রাণ বিনাশ হইবে, তাহার ফলে হয়তো জেলে যাইতে হইবে।

বাবা ঐ পত্রের উত্তরে আমাকে লিখেন, শ্রীশ বাবু, এই সামান্য ভুল বশতঃ গাড়ু না লইয়া পায়খানায় যাওয়ায় ভীত হইতেছেন। আমার সাধনার সময়ে একদিন প্রাতে মলত্যাগ করিতে পায়খানায় যাই, জলশৌচ না করিয়া হাতে মৃত্তিকা না করিয়া অবলীলাক্রমে বিছানায় বসিয়া এবং কাষ্ঠাসনে বসিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য করি; বারোটার পূর্ব্বে স্নান করিবার সময়ে তৈল মর্দ্দন কালিন জানিতে পারিলাম অর্থাৎ গুহ্যদ্বারে চট্‌চট্‌ করায় এবং হস্তে মল সংলগ্ন হওয়ায় গন্ধে জানিতে পারিলাম প্রাতে পায়খানায় জলশৌচ করা হয় নাই। সাধন কালিন ভগবানে তন্ময় হইলে ঐরূপ ভুল হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মনে রাখিবেন, যাহাতে জীবনের অনিষ্ট হয় এমত ভুল কখন হইবে না, গুরুদেব রক্ষা করিয়া যাইবেন।

কোলগরায় এই সময়ে যাহা মনে করিতাম, আশ্চর্য্য রূপে সংঘটন

হইত। কোন দিন প্রাতে মনে হইত মুগের ডাউল ভাতে দেয় না কেন? আহার কালিন দেখিলাম মুগের ডাউল ভাতে দিয়াছেন। ঘরে অনেক গুলি মহারাষ্ট্র দেশীয় লম্বা ধূপ ছিল কিন্তু আমার পত্নী ক্রিয়া কালিন সন্ধ্যার সময়ে ঐ ধূপ জ্বালিয়া দিতে প্রায়ই ভুলিয়া যাইতেন, যে দিন মনে করিতাম দেখি আসনের সম্মুখে ধূপ জ্বলিতেছে। কোলঙ্গায় অনেক দিন ছিলাম, বিড়াল কখনও দেখিতে পাই নাই। এমন কি কোলঙ্গা গ্রামে বেড়াইতে গিয়াও কোন দিন আমার চক্ষে বিড়াল পড়ে নাই। আমরা যে ঘরে সাধনায় বসিতাম, ঐ ঘরে ভাঁড়ারের সকল জিনিষ পত্র থাকিত, ঐ দেশে ভুঁষ নামক প্রকাণ্ড আকারের ইন্দুর সচরাচর দেখা যাইত, ইন্দুর অপেক্ষা চার ছয় গুণ বড় দেখিতে। আমাদের সাধন কালিন ঘর অন্ধকার থাকায় ঐ ইন্দুর গুলি আসনের উপর বেড়াইত, খড়মড় করায় মন সংযোগের বিঘ্ন করিত।

একদিন সন্ধ্যা রাত্রে সাধন কালিন বড়ই বিরক্ত হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম এমন দেশে আসিয়াছি যে একটা বিড়াল খুজিয়া পাওয়া যায় না। যদি একটা বিড়াল পাইতাম, সাধন কালিন এই ঘরে বিড়ালটি থাকিলে, বিড়ালের ভয়ে ইন্দুর আসনের দিকে আসিতে পারিত না, সাধনবিঘ্ন হইত না। নিজ মনে সন্ধ্যা রাত্রে এই বিষয় চিন্তা করি, একথা আমার পত্নীকে বলি নাই। কিন্তু রাত্রি তিনটার সময়ে যখন আমরা পৃথক আসনে বসিয়া ক্রিয়া করিয়া নিমগ্ন হইয়াছি, তখন মনে হইল আমার আসনের উপরে আমার গা ঘেঁসিয়া একটা লোমজ জন্তু বসিয়া আছে, আমি প্রথমে ভাবিয়া ছিলাম ভুঁষ, ইহারাও লোমজ। কিন্তু তাহা নহে হাত বুলাইয়া অনুভব করিলাম ইহা বিড়াল। আমার পত্নীকে ডাকিয়া কহিলাম বাহির হইতে আলো আনিয়া দেখ আমার আসনে এটি কি? তিনি তাড়াতাড়ি আলো আনিলে দেখিলাম একটী কৃষ্ণ বর্ণের বিড়াল। কি আশ্চর্য্য! যেন আমাদের অনেক দিনের পোষা।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এদেশে এতদিন আসিয়াছি একটীও বিড়াল দেখিতে পাই নাই. তবে ইহা কোথা হইতে আসিল। তখন প্রথম রাত্রের কথা স্মরণ পথে উদিত হইল, আমি ভূঁষের অত্যাচারে সাধন বিঘ্ন হওয়ায় বাবার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এদেশে বিড়াল নাই সত্ত্ব যদি একটা বিড়াল পাইতাম সাধন কালিন এই ঘরে রাখিয়া সাধন করিলে, বিড়ালের গন্ধে ইন্দুর আমাদের সাধন বিঘ্ন করিতে পারিত না। ভগবান্, গুরুদেব আমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এই বিড়ালটি পাঠাইয়াছেন। আমার পত্নীকে প্রথম রাত্রের সাধন বিঘ্নের কথা এবং একটী বিড়াল পাইবার কথা গুরুদেবকে জানাইয়াছিলাম এ কথা বলি নাই, তিনি ভক্ত-কল্পতরু আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। আমার স্ত্রী এইকথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, ইহার মস্তকে সিন্দুর দাও এবং যত্ন করিয়া দুগ্ধ ভাত খাওয়াইবে। মৎস্য এস্থানে কালে ভদ্রে পাওয়া যায় কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ঐদিন প্রাতঃকালে ছোট ছোট মৎস্য বিক্রয় করিতে আসায় খরিদ করিয়া ঐ বিড়ালটিকে দেওয়া হয় কিন্তু বেলা বারোটার পরে ঐ বিড়াল অদৃশ্য হইল। তাহাত হইবার কথা, সাধকের ইচ্ছা পূর্ণ মানসে বিড়াল প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে আমি যাহা ইচ্ছা করিতাম তাহাই প্রাপ্ত হইতাম। সকলই গুরুদেবের অনিচ্ছার ইচ্ছায় সম্পাদন হইত।

কোলঙ্গায় অবস্থিতি কালিন, কোলঙ্গা ও রাউরকেলার মধ্যবর্ত্তী লাইনের কিনারায় একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। প্রবাদ আছে, ঐ স্থানে ভগবান ব্যাসদেব একটী শিব স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ পর্ব্বতের উপর ব্যাসদেবের আসন আছে, তাহার উপর উপবেশন করিয়া সাধনা করিতেন। এক বৎসর শিবরাত্রের দিবাভাগে আমি ও বামদেব বাবু উপবাস করিয়া তথায় ট্রলি যোগে একখানি গীতাসহ গমন করি এবং পর্ব্বতের উপরে আসন বিছাইয়া আঠারো অধ্যায় গীতাপাঠ করি।

ঐ পর্ব্ব দিবসে ঐ ব্যাস আশ্রমে পর্ব্বতের তলদেশে একটী ক্ষুদ্র মেলা হয়, অনেক জিনিষপত্র আমদানি হয়। ঐ পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে দুইটী নদী দুইদিক হইতে প্রবাহিত হইয়া একটী প্রকাণ্ড নদী হইয়াছে, উল্লিখিত দুইটী নদীর নাম শঙ্খ ও কয়েল। দুইটী মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণী নদী নাম ধারণ করিয়াছে। যাহার উপর বি, এন, রেল কোম্পানী প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মান করিয়াছেন। ঐ তিনটী নদীর সংযোগস্থানে ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও ব্যাস আশ্রম। আমরা দুইটী ভ্রাতায় গীতাপাঠ শেষ করিয়া সমতল ভূমিতে নামিবামাত্র একটী মধ্য বয়স্কা পট্টবস্ত্র পরিধৃতা গীতা হস্তে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাই। তাঁহাকে দেখিলেই ধর্ম্মপ্রাণা মনে হয়। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, তিনি মৎস্যগন্ধার মাতৃবংশীয়া। শুনিলাম পরাশর মুনি উল্লিখিত শঙ্খ এবং কয়েল নদীর মিলিত স্থানে মৎস্যগন্ধার সহিত বিহার করেন। যে সময়ে উভয়ের মিলন হয় ঐ স্থানটী পরাশর মুনি কুয়াসা সৃজন করেন। কিম্বদন্তি আছে ঐ ব্যাস আশ্রম পর্ব্বতে বৎসরের প্রতি ঋতুতে প্রতিদিন কুয়াসা দৃষ্টিগোচর হয়, আমার ভাগ্যে কিন্তু দর্শন ঘটে নাই। তবে উল্লিখিত জেলের মেয়েটীর সহিত আলাপ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, তিনি গীতা পুস্তক প্রতিদিন পাঠ করেন এবং কথঞ্চিৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত মৎস্য-গন্ধার গর্ভে ব্যাসদেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য বহির্লক্ষ্যের অর্থ। কোলঙ্গায় অবস্থিতি কালিন চতুর্থ সোপানের কার্য্য পাইয়া যথা সময়ে তাহার উদ্‌যাপন হয়।

কোলঙ্গায় আট দশ বৎসর ভিয়ার কোম্পানীর ডাক্তার ছিলাম। ইহার মধ্যবর্ত্তী সময়ে একদিন উষাকালে সাধন সময়ে গুরুদেব আমাকে দেওঘর হইতে যোগবলে জানান, শ্রীশ বাবু! অদ্য প্রাতেই দেওঘরে রওনা হইবেন, বিশেষ দরকার। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইয়াই পত্নীকে বলি,—অদ্য প্রাতে সাড়ে

আট ঘটিকার গাড়ীতে দেওঘর রওনা হইতে হইবে, গুরুবাবা বিশেষ আবশ্যক জন্য আহ্বান করিয়াছেন, তুমি ঝোল ভাত শীঘ্র করিয়া দাও। তিনি বলিলেন,—তুমি একজনের চাকরি কর তাঁহার নিকট বিদায় পাও কি না দেখ। আমি বলিলাম, যখন বাবা ডাকিয়াছেন তখন সাহেব বিদায় দিতে বাধ্য হইবেন। যাহা হউক অতি প্রত্যুষে সাহেবের কুঠিতে যাইবামাত্র সাক্ষাৎ হইল, ম্যানেজার সাহেব এত উষাকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, আমি বলিলাম—এই প্রাতের গাড়ীতে দেওঘর যাওয়া একান্ত দরকার, গুরুবাবার নিকট যাইব।

এই ম্যানেজার সাহেব এবং তাঁহার মেমসাহেব বাবার ঔষধিতে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তদ্ধেতু তাঁহাকে বড়ই ভক্তি করিতেন। আমি দুই তিন দিনের বিদায় প্রার্থনা করিলে আনন্দচিত্তে অনুমোদন করিলেন। আমি বাসায় আসিয়া স্নান আহারান্তে দেওঘর রওনা হইলাম।

তৎকালিন বার্ণ কোম্পানীর ছোট গাড়ী বৈদ্যনাথ জংশন হইতে দেওঘর ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। শীতকাল, আমিও সার্জ্জের কোট, শাল, মোজা ব্যবহার করিয়া যাইতেছি। দেওঘর ষ্টেশনে যখন গাড়ী পৌছিল তখন রাত্রি চারটা হইবে, আমি নামিয়া বাহান্ন নিঘা গুরুদেবের বাগান বাড়ীতে পৌছিয়া শুনিলাম বাবা ফুল বাগানে বেড়াইতেছেন। কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীচরণ দর্শনার্থ বাগানে যাইয়া প্রণাম করিলাম। বাবা লংক্লথের বেনিয়ান ও বিদ্যাসাগরি সাদা চাদর, পদে কটকি চটী পরিধান করিয়া বেড়াইতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, শ্রীশ বাবু! "যার যত তার তত" নয় কি? দেখুন, শ্রীশ বাবু! এই মাঘ মাস, আমার গাত্রে কি আছে, আর আপনি কত প্রকার গরম বস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন। আমি বলিলাম—বাবা আপনার সহিত এই অধমের তুলনা করিতেছেন কেন? তিনি বলিলেন,

আপনাকে আমার বিশেষ দরকার তজ্জন্য আহ্বান করিয়াছি, ইহার পরে সমস্ত বলিব; আপনি বৈঠকখানায় যাইয়া কাপড় ত্যাগ করিয়া শৌচ কার্য্য সমাধা করিয়া লউন। আমি একটু পরে যাইতেছি।

আমি বৈঠকখানায় আসিলে কয়েকজন ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তি কহিলেন,—বাবা একগ্রাস কিছুই খান নাই, কেবল সন্ধ্যাকালে একটু গঙ্গা জল পান করেন, বাবার মাথার চুল দেখিয়াছেন? লম্বা চুল দাড়ি গোঁপ রাখিয়াছেন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে দেহ ত্যাগ করিবেন। আমিত শুনিয়া হতভম্ব হইলাম। তিনি দেহত্যাগ করিলে আমাদের ভাই কি হইবে, আমরা কাহার নিকট দাঁড়াইব?

ক্ষণিক পরে বাবা ফুল বাগান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার শয়ন কক্ষে গমন করিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ ঘরের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী আমার বৌমা, বাবার সংস্পৃষ্ট বিছানায় মুখ আবরণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। বাবা দেওয়ালের ধারে বসিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন, আমি ভাদ্রবধুর সংস্পৃষ্ট বিছানার উপর দিয়া কিরূপে গমন করি, আশু ভায়া বলিলেন, দাদা, আপনার একি ব্যবহার! আমরা সকলেই বাবার সন্তান এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নিজের নিজের বাড়ীতে কি ভাদ্রবধু থাকেন না, ঘটনাক্রমে ভাসুর কি ভাদ্রবধুর মুখ দেখেন না, তাহাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়? আপনি বয়ক্রমে এবং আত্মকর্ম্মে উন্নতি লাভ করিয়াও কুসংস্কারের হস্ত হইতে এখনও অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। যান, যান, বাবা ডাকিতেছেন, চলিয়া যান কোন দোষ হইবে না। আমি বাবার সন্মুখে উপবেশন করিয়া প্রণাম করিলাম।

সেই সময়ে বাবা উক্ত বৌমা ও আশু বাবু এবং আরও দুই একজন যাঁহারা ঐ ঘরে ছিলেন, ঘর হইতে যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন।

আমাকে বাবা বলিলেন, আপনাকে ডাকিবার উদ্দেশ্য, আমার দেহত্যাগের পূর্ব্বে আপনাকে পঞ্চম ক্রিয়াটি দিয়া যাইব। আপনার হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইতে একটু অবশিষ্ট আছে, এই ক্রিয়াতে সামান্য দিনে হৃদয় গ্রন্থিভেদ হইবে এবং এই ক্রিয়াতে মূলাধার গ্রন্থিতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কুণ্ডলিনী চৈতন্যের প্রথম সোপান প্রাপ্ত হইবেন। এই বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দর্শনের দুইশত সংখ্যা শেষ হইয়াছে ত? আমি বলিলাম,—এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে। তিনি বলিলেন, উহা যতশীঘ্র পারেন শেষ করিবেন এই বলিয়াই পঞ্চম ক্রিয়ার প্রকরণ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, শ্রীশবাবু! আপনি এই সম্প্রদায়ের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেন। আপনাকে এই ক্রিয়াটী না দিয়া যাইলে অসম্পন্ন রহিয়া যাইত, তজ্জন্য আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। আমি ক্রন্দন করিয়া কহিলাম, বাবা! আপনি কোথায় যাইবেন? তদুত্তরে বাবা বলিলেন,—চির কাল কি আমি থাকিব, আমার সময় হইয়াছে. আমাকে দেহত্যাগ করিতে হইবে; তজ্জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াছি।

আমি পাঁচ বৎসরের বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম এবং বলিলাম আমাদিগকে নাবালক অবস্থায় রাখিয়া যাইতে পারিবেন না, আমরা কোথায় দাঁড়াব, বিপদে পড়িলে কে শান্তনা প্রদান করিবে? এই বলিয়া যখন ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলাম, বাবা আমাকে কোলে লইয়া তাঁহার কোঁচার কাপড় দ্বারা আমার চক্ষের জল অপসারিত করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন. এমন প্যানপেনে ছেলে জানিলে দেহত্যাগের কথা বলিতাম না। আমি বলিলাম,—বাবা! ফিরিবার সময়ে কত ভ্রাতা ভগ্নী আপনার কুশল জিজ্ঞাসিলে ও আমার স্ত্রীকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব, অতএব আপনি আমার নিকটে বলুন 'আপনি যাইবেন না।' তদুত্তরে বাবা বলিলেন,—তোমাদের জন্য কি চিরকাল এই সংসারে

থাকিব। আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাইবে, বাবা যাহা করান করিব। এই বলিয়া কোল হইতে বিছানায় নামাইয়া দিলেন। আমি কথঞ্চিত ঠাণ্ডা হইলাম। দয়াময় আমাদের ন্যায় নাবালক পুত্র কন্যার জন্য সে যাত্রা দেহত্যাগ করেন নাই।

এই ঘটনার দুই, তিন বৎসর পরে মাননীয় হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালিন আর্য্যমিশন স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন বাবা তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। তবে বাবার প্রথমা স্ত্রী তখন বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার গর্ভে কোন সন্তানাদি হয় নাই।

কোলঙ্গায় অবস্থিতি কালিন এবং দ্বিতীয় তৃতীয় ক্রিয়া প্রাপ্তির পরে যে সকল লোক ঐ দেশ হইতে আত্মকর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া গুরু-বাবাকে কলিকাতায় বা দেওঘরে পত্র লিখিতেন, ঐ সকল পত্রের উত্তরে বাবা লিখিতেন, আমার প্রতিনিধি শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কোলঙ্গার ডাক্তার। তাঁহার নিকট আমার লিখিত আদেশযুক্ত এই পত্রগুলি দেখাইলে তিনি যদি উপযুক্ত মনে করেন ক্রিয়া দিবেন। এইরূপ বিস্তর পত্র লইয়া বাবুগণ আমার নিকট যাওয়ায় প্রথম প্রথম বাবাকে লিখিয়া অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া আত্মকর্ম্মের উপদেশ দিতাম। এইরূপ অনেকে কোলঙ্গায় যাইয়া ক্রিয়া লইয়া যাইতেন।

ভাগলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, বি, এন, রেলওয়ের রাস্তার ওভারসিয়ার, গোঁড়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বি। পরিশেষে এই ক্রিয়াই সার ভাবিয়া গুরুবাবার আদেশ মত দেওঘর হইতে ক্রিয়া লইয়া যাইলেন। তিনি প্রায়ই রাউরকেলা ষ্টেশনে আসিতেন। বাবার আদেশ মত মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া বামদেব বাবু এবং মতি বাবুকে ক্রিয়া দেখাইতে কোলঙ্গা হইতে যাইতে হইত। মতি বাবুর ভগবৎ দর্শন প্রতিদিন সুন্দর হইত, তজ্জন্য তাঁহার দুর্ম্মতি হওয়ায় আমাকে প্রায়ই বলিতেন, দর্শনত সহজ সাধ্য। আমি বলিতাম—মতি বাবু! সর্ব্বনাশ করিবেন

না, অহঙ্কার করিবেন না। অহঙ্কারই রজগুণজাত রাবণ, ঐ অহঙ্কাররূপী রাবণ দ্বারা সীতা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্যোতির্ম্ময় পরা-প্রকৃতির হরণ হইবে। আর সীতা উদ্ধার হয়ত করিতে পারিবেন না। তখন আপনার ভয়ানক পরিতাপ আসিবে অর্থাৎ আর দর্শন হইবে না। তাহাই হইল, তাঁহার কুটস্থ দর্শন বন্ধ হইয়া গেল, কত চেষ্টা করিয়াও আর দর্শন হইল না। অবশেষে সীতা উদ্ধার না করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শুনিয়াছিলাম বাবার ঔষধিতে সাহেব মেমদিগের অসাধ্য অসাধ্য রোগ আরাম হয়। যে ব্যাধি ইংলণ্ডেও আরোগ্য হয় নাই এবং ভারতবর্ষের বোম্বে ও কলিকাতায় বিস্তর টাকা খরচ করিয়া বড় বড় সুবিখ্যাত ইংরেজ সিভিলসার্জ্জনগণ হার মানিয়াছিলেন, অবশেষে গুরুবাবার ব্যবস্থা মত গুরুবাবার কৃত দেশীয় ঔষধিতে নির্ম্মল হইয়াছিল; তজ্জন্য কোলঙ্গার সাহেবগণ বাবাকে পরম ভক্তি করিতেন। আমাকে কয়েকবার বড় সাহেব বলিয়াছিলেন, গুরুবাবাকে কোলঙ্গায় আনয়ন কর, আমরা সমস্ত খরচ বহন করিব এবং যাহাতে তাঁহার কোন বিষয়ে এখানে অসুবিধা না হয় তাহার ব্যবস্থা করিব। কিন্তু বাবা কোলঙ্গায় কখনও নামিতে পারেন নাই।

এইরূপে দশ বৎসর কোলঙ্গায় কাটিল। হঠাৎ মনে জাগরূক হইল, স্বাধীন ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এই জঙ্গলময় স্থানে আমি কি চির-কাল অতিবাহিত করিব। গুরুবাবার দেশীয় আশ্চর্য্যজনক ঔষধিতে কত প্রকার অসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য হইতেছে, তবে কেন আমি পরাধীন চাকরী করিয়া সাহেবদিগের আজ্ঞাধীন থাকিয়া জীবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করিব। বরং এই চাকরি ত্যাগ করিয়া জামালপুরে ইতিপূর্ব্বে বাটী খরিদ করা হইয়াছে, তথায় বাবার ঔষধি লইয়া স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসা করিলে সাধনের কোনরূপ বিঘ্ন হইবে না।

তথাকার গুরু ভ্রাতাগণের সহিত সংমিলিত হইয়া বাবার ক্রিয়ার প্রচার এবং তৎসহ বাবার আশ্চর্য্যজনক ঔষধির প্রচার করি না কেন? এইটি মনে ধারণা করিয়া, গুরুবাবাকে আমার মত উল্লেখ করিয়া লিখিলাম। তিনি উত্তর দেন, শ্রীশ বাবু! আপানার কয়েকটী পুত্র হইয়াছে তাহাদের লেখা পড়ার খরচ আছে, আপনি উপস্থিত গড়ে একশত পঁচিশ টাকা বেতন পাইতেছেন; উপস্থিত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যৎ আশায় জামালপুর যাইয়া চিকিৎসা ব্যবসা করা কি যুক্তি সঙ্গত? অতএব আমার মতে এই চাকরিটী পরিত্যাগ করিবেন না।

ঐ পত্র পাইয়া ম্যানেজার সাহেবের নিকট দুই দিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় গুরুবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি বলিলেন,—ছেলেদের খরচ ও বিদ্যাদানের ব্যয় সংকুলান যদি না হয়, তবে আপনি ভবিষ্যতে বিব্রত হইয়া পড়িবেন। আমি বলিলাম,—আমার অদৃষ্টে কি ছেলেদের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, তাহারা কি আপন আপন কর্ম্মসূত্র ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই? তাহা যদি না হয় এবং আমার উপরেই তাহাদের জীবন নির্ভর করে, তাহা হইলে আমার চাকরী ত্যাগ করা কর্ত্তব্য কি না; আপনি আমাকে তাহা বলুন। তিনি নির্ব্বাক হইলেন এবং বলিলেন,—প্রত্যেক জীবই কর্ম্মসূত্র ধারণ করিয়া জগতে জন্ম গ্রহণ করে। তখন আমি বলিলাম,—তাহাদের জন্য কর্ত্তা সাজিয়া আমার এই সুখময় জীবন কেন নষ্ট করিব। আমাকে আদেশ দেন, আমি জামালপুর যাইয়া নিজের বাটীতে ঔষধালয় খুলি এবং আর্য্যমিশনের ঔষধি এবং কিছু ডাক্তারি ঔষধি, আলমারী, চেয়ার, টেবিল খরিদ করিয়া বসি। বাবা! আমাকে মাসে ত্রিশ টাকা দিবেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব, মাসিক অধিক আর চাহিতেছি না।

বাবা তাহাতে সম্মতি দান করায়, কোলঙ্গায় প্রত্যাগমন করিয়া দুই

মাসের বিনা বেতনে বিদায় লইয়া একজন সাব এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনকে ডিসপেন্সারির ভার দিয়া কলিকাতা হইতে ছত্রিশ টাকার আর্য্যমিশনের ঔষধি আর কিছু ডাক্তারি ঔষধি ও যন্ত্র খরিদ করিয়া এবং আলমারী ইত্যাদি খরিদ করিয়া বাবার আদেশ গ্রহণ করিয়া জামালপুরে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিলাম। তাহাতে দিন দিন উপার্জ্জন হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে গুরুদেবের কৃপায় জামালপুর, মুঙ্গের, সুলতানগঞ্জ, ধারাবা, বহি, দ্বারবঙ্গ পর্য্যন্ত অধিক দর্শনী লইয়া রোগী দেখিতে যাইতে হইত। তাহার ফলে দুইশত আড়াই শত টাকা পর্য্যন্ত মাসিক আয় হইতে লাগিল।

আয় বৃদ্ধি দেখিয়া টাকার মোহে, ক্রিয়ার যদি ব্যাঘাত হয়, তজ্জন্য বাবাকে জানাইয়া বলিলাম, টাকার প্রলোভনে যেন আত্মকার্য্যের ব্যাঘাত না হয়। বিসূচিকা ব্যাধির প্রকোপের সময়ে বাবার সঞ্জীবনী ঔষধিতে ডাক্তারগণের পরিত্যক্ত জীবন-সংশয়-গ্রস্ত রোগী আরাম হইতে লাগিল।

মুঙ্গেরের সরকারি হাঁসপাতালের এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার বাবু, বাবার দেশীয় ঔসধির নানারূপ কুৎসা করিলেও বাবার ঔষধি প্রচারের কোনরূপ বাধা হইল না। ঐ সময়ে কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মুঙ্গেরে ছিলেন। তিনি ক্রিয়ান্বিত, মুঙ্গেরের কেল্লার ভিতর তাঁহার বাসা ছিল, বাবার আদেশানুসারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়েন।

আশুবাবুর বাস ভবনে কয়েকটি ক্রিয়ান্বিত সংমিলিত হইয়া একটী গীতা সভা প্রতিষ্ঠা হয়, ঐ সভায় ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বিশ্বাস গীতার ব্যাখ্যা করিতেন। তৎকালিন ভূপালচন্দ্র মজুমদার, উকীল হরিপদ ঘোষ, মুঙ্গের আদালতের ও সহরের আরও দুই একটী বাঙ্গালী

ক্রিয়ান্বিত রবিবারে সমবেত হইতেন। আমি তৎকালিন আমার জামালপুরের বাটীতে থাকিতাম। আমিও রবিবারে তথায় একত্রিত হইতাম। মধ্যে মধ্যে আমাদের প্রার্থনায় গুরুদেব ডেপুটি বাবুর বাস ভবনে দেওঘর হইতে আগমন করিতেন এবং গীতার ব্যাখ্যা করিতেন।

তৎকালিন একদিন বাবা কহিলেন, আমি সকলকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকি। আমি কহিলাম, কখনই নহে, যে সাধক আপনাতে তন্ময়, প্রতিদিন আপনার আদেশ মত দুই সন্ধ্যায় বিধি পূর্ব্বক আত্মকার্য্য করেন তিনি আপনার প্রিয়। সুতরাং কি করিয়া আপনি সকলকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বাবা বলিলেন, তবে কি আমি পক্ষপাতী? আমি কহিলাম, আমার কথা অন্যথা নহে। কুরু-পাণ্ডবগণের গুরু ছিলেন দ্রোণাচার্য্য; দ্রোণাচার্য্য কি সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন? অর্জ্জুনকে তিনি অধিক স্নেহ করিতেন। আপনি গুরুরূপী আত্মানারায়ণ সকল ঘটেই বিরাজমান। যিনি ক্রিয়া করিয়া প্রাণমন আপনাতে অর্থাৎ কূটস্থে সংমিলিত করিতে পারেন তিনি তো আপনাকে তাঁহার হৃদয়পটে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন। কেবল গৌণ-ভক্তি অবলম্বন করিয়া আপনার ফটোতে ফুল চন্দন দিয়া পূজা করিলে আপনার কৃপা পাওয়া দুর্ল্লভ। এখানকার ভ্রাতাগণকে কহিতেছি, ফটো পূজা করুন আর নাই করুন বাবার ক্রিয়াই গুরু-অর্থাৎ তিনি। ঐ ক্রিয়া বাবার আদেশমত করুন, তাহা হইলে বাবাকে ভক্তিডোরে বাঁধিতে পারিবেন। তিনি একদণ্ড আপনাকে ছাড়িয়া কুত্রাপি যাইতে পারিবেন না। ইনি দেহ নহেন দেহীই তিনি। বাবা এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আশুবাবু ডেপুটি নোয়াখালি বদলি হইয়া যাওয়াতে, আমাদের গীতা সভা অন্তর্দ্ধ্যান হইল।

ইত্যাবসারে শ্রীযুক্ত তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, বাবার

নিকট আত্মকার্য্যের উপদেশ পান। তাঁহার পরে কেম্ কটেজে অর্থাৎ তারাভূষণ ভায়ার বাসায় গীতা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং গুরুদেব তারাভূষণ বাবুর প্রার্থনায় মুঙ্গেরে বৎসরে দুইবার তারাভূষণ বাবুর বাস ভবনে আসিতেন। একবার তারাভূষণ বাবুর বাসায় আসিয়া আদেশ দেন, যখনই আমি মুঙ্গেরে আসিব আপনি বেলা ১টার গাড়ীতে জামালপুর আপনার বাটীতে প্রত্যাগমন করিবেন ; ইহা তারাভূষণ বাবুর মাতার অনুরোধ। প্রতিদিন রাত্রে একত্রে আহারাদি করা যাইবে, আমার তাহাই ইচ্ছা। একবার বাবা তারাভূষণ ভায়ার বাসায় দেওঘর হইতে আসিয়া আমাদিগকে কহিলেন, "আমি বাবা, বাবা, বুলিতে সন্তুষ্ট নহি, যিনি প্রতিদিন দুই বেলা আদেশ মত সাধন করেন, তিনিই আমার প্রিয়। এইকথা শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র রোডসেস্ অফিসের বড় কেরাণী সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায় ভায়াকে কহিলাম কেল্লায় আশুবাবুর বাসায় বাবা যে বলিয়াছিলেন সকলকে সমান চক্ষে দেখি, অদ্য বাবার বাক্যে নিজের দর্প চূর্ণ করিলেন কিনা ? আমি বলিলাম, আপনি যদি বলেন বাবাকে বলি। তিনি আমাকে নিরস্ত করিলেন।

জামালপুরে বসবাস করিবার সময় পরাৎপর গুরুদেব আমাকে আদেশ করেন, সমস্ত দিন ডাক্তারি কার্য্যে আপনাকে ব্যস্ত থাকিতে হয়। শ্রীশ বাবু! আপনি রাত্রি আটটার সময়ে সাধন না করিয়া আহার করিয়া লইবেন, রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত অন্যান্য কার্য্য করিয়া অর্থাৎ শয্যায় না গিয়া জাগরণ করিয়া থাকিয়া ঐ এগারটার সময়ে আসনে যাইয়া সাধন করিবেন ; রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত অর্থাৎ তিন ঘণ্টা সাধন করিয়া উঠিবেন, তৎপরে নিদ্রা যাইবেন। প্রাতে ছয়টার সময়ে উঠিয়া ডাক্তারি কার্য্যে বা ক্রিয়া দান কার্য্যে ব্রতি হইবেন। সেই আদেশ অনুসারে কয়েক বৎসর এই নিয়মে সাধনা করিতাম। এক একদিন রাত্রে সাধন কালিন নিজেকে হারাইয়া যাইতাম, অথচ নিদ্রা নহে, নিদ্রা হইলে নাকের

আওয়াজ হয় অথবা শ্বাস প্রশ্বাসে বায়ুর শব্দ অনুমিত হয়, ইহা তাহা নহে। তৎকালীন রুদ্রাক্ষ মালা ব্যবহার করিতাম, মালায় একশত আটটি রুদ্রাক্ষ আছে, সাধনা করিতে করিতে হয়ত ত্রিশ সংখ্যা পর্য্যন্ত চৈতন্য ছিল তাহার অনেকক্ষণ পরে সুমেরু হইতে পাঁচ ছয় মালা নামিলে চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, মোটে পাঁচ ছয়টি কি জপ করিলাম? কিন্তু তাহা নহে, ৩০ সংখ্যার পর ৭৫ বার হাতের মালা ঘুরিয়াছে অথচ বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য অবস্থায় আনন্দে অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় জপ হইয়া তৎপরে মন ইন্দ্রিয়ে আসক্ত হওয়ায় চৈতন্য হইল। ইহাকে ক্ষুদ্র সমাধি কহে। এখনও মনে জাগরূক আছে, একদিন রাত্রি ১১টায় সাধনে বসিয়াছি, জামালপুরে কারখানায় কতকগুলি ফটক আছে প্রত্যেক ফটকে পেটা ঘড়ি ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাত্রে বাজিয়া থাকে। ঐ রাত্রে সাধনা করিতে করিতে গজলের শব্দে চৈতন্য হইল এবং মনে হইল আমার ধারণা হইতেছে, আমি অনেকক্ষণ সাধনায় বসিয়াছি, কিন্তু গজল যখন বাজিল তখনতো রাত্র বারটা কারণ বারটায় গজল বাজে, সাধনা কি একঘণ্টা করিলাম? কিন্তু মন বলিতেছে যেন অনেকক্ষণ বসিয়াছি। আচ্ছা অন্য ফটকের ঘড়ি বাজিলে বুঝিব আমার কাণের ভুল কিনা? একটু অপেক্ষা করায় ঘড়ি বাজার অল্পক্ষণ পরে গজল বাজিল। ফটকের ঘড়ি এক সময়ে বাজে না, এক ফটকের ঘড়ি বাজা শেষ হইলে অপর ফটকে বাজে, তজ্জন্য অপেক্ষা করিয়া শুনিলাম চারটা বাজার পরে গজল বাজিল, এগারটায় বসিয়া রাত্রি চারটা পর্য্যন্ত সমাধি অবস্থায় ছিলাম। সকলই গুরুদেবের অনুকম্পা ভিন্ন কিছুই নহে।

আমি নিত্য প্রাতের গাড়ীতে জামালপুর হইতে বাবার সিদ্ধাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়ে মুঙ্গেরে আসিয়া রোগী দেখিতাম এবং বেলা একটার গাড়ীতে বাবার আদেশ মত তারাভূষণ বাবুর বাস ভবনে আসিয়া রাত্রি এগারটার গাড়ীতে আহারান্তে জামালপুর নিজ বাড়ীতে প্রত্যা-

গমন করিতাম। একদিন বেলা দুইটার সময়ে বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, শ্রীশ বাবু! "যুক্তাহারবিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু" ষষ্ঠ অধ্যায়ের গীতার এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ জানেন ?• অর্থাৎ আমি নিজে খাই না ভগবানকে খাওয়াই মাত্র,ই হা আপনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন ত ? আমি কহিলাম, না বাবা আমি নিজেই খাই এই মনে হয়। ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে, বাবা ! সে সময় কি মনে ধারণা করিতে পারি আমি খাইতেছি না—অথচ আমার দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে গ্রাস তুলিয়া খাইতেছি, খাইয়া নিজেই তৃপ্ত হইতেছি। শরীরের মধ্যে ভগবান আছেন. তিনিই খান, একথা কি বাবা তখন মনে আইসে ? বাবা বলিলেন,—না শ্রীশ বাবু ইহা একদিন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমি বলিলাম, তাহা আপনার কৃপা ব্যতীত নহে। সেই দিন আর কোন কথা হইল না, রাত্রে আহারান্তে রাত্রের গাড়ীতে জামালপুর চলিয়া যাইলাম।

তৎপরদিবস প্রাতে যেরূপ সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া রোগী দেখি, ঔষধি বিতরণ অন্তে এবং নিজের রোগী দেখিয়া বাবাকে দর্শন করিয়া বেলা দশটার গাড়ীতে জামালপুরে যাইয়া, তথায় রোগী দেখিয়া স্নানান্তে আহারে বসিলাম। গণ্ডূষ অন্তে যেমন আমি পঞ্চ প্রাণকে অন্ন নিবেদন করিতেছি, হঠাৎ আমার কুটস্থে লক্ষ্য পড়িল, দেখিলাম আমার হস্তদ্বারা মুখের মধ্যে অন্ন প্রবেশ করিতেছে কিন্তু কুটস্থের মধ্যে গুরু বাবার দাড়ি সংযুক্ত মুখ হাঁ করিয়া ঐ অন্ন গলাধকরণ করিতেছেন। একবার দুইবার নহে, চার পাঁচ বারের কম হইবে না। তৎক্ষণাৎ বাবার 'যুক্তাহার' শ্লোকের ব্যাখ্যা মনে পড়িল। বাবা গত কল্য বৈকালে ঐ শ্লোকটি যেরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন। আমি ত ভোজন করি না, বাবাই ভগবান রূপে গ্রহণ করেন, ইহা দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম। আমার

২য়া পত্নী রান্নাঘরে কি করিতেছিলেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? আমি গতকল্যের যুক্তাহার সম্বন্ধে বাবা যাহা বলিয়াছিলেন এবং পরিশেষে আমাকে বলেন, আপনি ঠিক বুঝিতে, পারিবেন বাবা অদ্যই তাহা প্রত্যক্ষ করাইলেন। আমিত আনন্দে উৎফুল্ল।

একটার গাড়ীতে মুঙ্গের চলিলাম, তারাভূষণ বাবুর বৈঠকখানায় কয়েকজন ভ্রাতার সমাগম হইয়াছে। বাবা ঐ কক্ষে নিদ্রা যাইতেছেন। আমি ঐ কক্ষে প্রবেশান্তে বাবাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রণাম করিয়া, ভ্রাতাগণের সহিত উপবেশন করিলাম। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বাবার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় আমরা গাত্রোত্থান করিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করায়, বাবা বলিলেন, শ্রীশবাবু! যুক্তাহার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন ত? আমি স্তম্ভিত হইয়া কহিলাম,—এই সংবাদ আপনাকে বলিবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম, আপনি অন্তর্য্যামি, সকল ঘটনাই জানেন আমাকে বলিতে না দিয়া লীলাময় লীলার কথা বলিলেন। এই বাক্য নিসৃত হইয়া আমার চক্ষুদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। অপর ভ্রাতা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। গুরুদেব মনুষ্যাকারে—আমরা মায়িক জীব বিধায় ভুলাইয়া রাখিতেন। "তিনি নরাকার, ধর্ম্ম অবতার, করেন নির্ব্বিকার, যে জন লয় শরণ।" এইরূপ কত সময়ে কত আশ্চর্য্য ঘটনা দেখাইতেন।

মুঙ্গের অবস্থিতি কালিন একদিন প্রাতে রোগী দেখিয়া, তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, উকীলের বাস ভবনে গমন কালে দেখি পরাৎপর ইষ্টদেব আসিয়াছেন। তারাভূষণ বাবু প্রাতে কাছারি গিয়াছেন। বাবাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখিলাম বাবা বহির্বাটীর উঠানে আরাম চৌকিতে বসিয়া ধুম পান করিতেছেন, আমি প্রণাম করিলাম। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন অদ্য রোগী দেখিয়া কিছু পাইয়াছেন ত? আমি

কহিলাম আপনার কৃপায় কিছু পাইয়াছি। বাবা বলিলেন, রোগীর বুক দেখা সেই বাঁশীটি পকেটে আছে ত? আমি বলিলাম আছে। বাবা বলিলেন, আপনি ডাক্তার আমার হাত দেখুন ত। আমি হাতে নাড়ি পাইলাম না। বাবা কহিলেন, কাহারও কাহারও দক্ষিণ হস্তে নাড়ি পাওয়া যায় নাই, বাম হাত দেখুন ত। আমি অবাক্! বাম হস্তেও নাড়ী নাই, আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। বাবা বলিলেন,—পকেট হইতে বাঁশী বাহির করিয়া আমার হৃদপিণ্ড পরীক্ষা করুন। বাবা গালিগায়ে বসিয়া ছিলেন। হার্ট দেখিলাম, কোনরূপ স্পন্দন নাই। আমি হতভম্ব হইয়াছি। বাবা বলিলেন,—শ্রীশ বাবু! আমার নিদান অবস্থা, আপনি আমাকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন, মুঙ্গেরের গঙ্গা "কষ্ট হারিণী" নামে খ্যাত, আমাকে এই মুহূর্ত্তে তীরস্থ করুন, ঘরে মারিবেন না। আমি হতভম্ব হইয়া বাবাকে বলিলাম,—আপনি আমাকে ছলনা করিতেছেন। দয়া করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করিয়া আমার অস্থির মনকে শান্ত করুন। একটু পরে হাসিয়া বলিলেন, আমার দুইখানি হস্তের নাড়ি এবং বক্ষস্থলে বাঁশী দিয়া দেখুন এখন। আশ্চর্য্য! দেখিলাম দুই হস্তের ধমনী ঠিক চলিতেছে এবং অন্তঃকরণের অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাপুরুষ সম্ভবও অসম্ভব করিতে পারেন অসম্ভবও সম্ভব করিতে পারেন। মৃত্যু লক্ষণ ইচ্ছা মাত্রই দেখাইতে পারেন। বাবা এই লক্ষণ আমাকেই মাত্র দেখাইয়াছেন, লীলাময়ের লীলা কত লিখিব।

একদিন মুঙ্গেরে শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র মজুমদার বি, এল, আমাদের ভ্রাতা; ঐ সিদ্ধাশ্রমের অতি নিকটে তাঁহার বাস ভবন। অবসর পাইলেই তিনি প্রাতে ও বৈকালে আমার নিকট আশ্রমে আসিতেন। তৎকালিন আমি সপরিবারে মুঙ্গের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলাম। একদিন আমার মনে হইল ভূপাল বাবুকে কুটস্থে মনের স্থিতির বিষয়

বুঝাইয়া দিই। তিনি উপলব্ধি করিলেন, আমরা যে কোন কার্য্য করি না কেন এবং দেখি না কেন সকল সময়ে কুটস্থে মন লাগিয়া থাকে। তিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই কথা অন্য কাহাকে প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। তিনি পরম ভক্ত, জ্ঞানবান, বাবার শিষ্য ছিলেন। এই সময়ে মুঙ্গেরের বড় বড় শিক্ষিতগণকে বাবার ক্রিয়া দান করিয়াছিলাম।

মুঙ্গেরে গুরুদেব আমাকে ক্রিয়া দানের সম্পূর্ণ অধিকারি করেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভূপাল বাবু উকীল, আমাকে কহেন,—দাদা মহাশয়! বাবার দেহত্যাগ অন্তে আপনিই বাবার প্রতিনিধিরূপে স্থায়িভাবে সকল কার্য্যই করিবেন, কিন্তু আমার ইচ্ছা এখন কেহ ক্রিয়াপ্রার্থী হইলে বাবাকে জানাইয়া ক্রিয়া দান করিলে ভাল হয় না? আমি কহিলাম,—তাহাই কর্ত্তব্য, কিন্তু একবার কাহাকে ক্রিয়া দিবার জন্য বাবাকে দেওঘরে আদেশ প্রার্থনা করায়, তিনি ভয়ানক কুপিত হইয়া আমাকে লিখেন, শ্রীশ বাবু! ভুলক্রমে লিখিয়াছেন, ক্ষমা করিলাম। ভবিষ্যতে আপনি যাহাকেই উপযুক্ত মনে করিবেন, আমাকে তাহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র না জানাইয়া ক্রিয়া দিবেন বা না দিবেন আপনিই অনুধাবন করিবেন। ভূপাল বাবুর মনস্তুষ্টির জন্য মুঙ্গের জেলার একজন সাব ইন্‌স্পেক্টার বাবু ক্রিয়াপ্রার্থী বিধায় লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে বাবা আমাকে অনেক তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করেন। ঐ পত্র দেখাইলে ভূপাল বাবুর জ্ঞান জন্মিল।

এক সময়ে জামালপুর বাটীতে রাত্রি এগারিটার সময়ে সাধনে বসিয়াছি। শীতকাল মাঘ মাস, তজ্জন্য শীতাধিক্যে খাটের উপরে গদি তাহার উপরে মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া তাহাতে উপবেশন করিয়া নিষ্কাম কার্য্য করিতেছিলাম। গাত্রে কিছুই দিবার আবশ্যক হয় নাই, উষাকালে দেখি আমি আসন সমেত খাটের নিম্নে বসিয়া রহিয়াছি। আমার রাত্রি দুইটার

সময়ে উঠিবার কথা, একি ব্যাপার! অঙ্গ তখন শীতে কম্পিত হইতে লাগিল। কি উপায়ে আসনসহ খাটের নিম্নে কখন বসিয়াছি অথচ সটান বসিয়াছিলাম। ইহা ঘোরতর সমাধি অবস্থা, গুরুদেবের কৃপায় লীলার সংঘটন ভিন্ন অন্য কিছুই বোধগম্য হইল না। মন কুটস্থে বিলীন হওয়ায় ইন্দ্রিয়গণ যাহাদের ইন্দ্রিয় বিষয়ে মন সংযুক্ত হওয়ায় শীত উষ্ণ বোধ হয়। মন কুটস্থে মিলিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়গণ মনে সংলিপ্ত হওয়ায়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে মুক্ত থাকায়, সাধক শীত উষ্ণ বর্জ্জিত হইতে পারে। সম্ভবত তাহাই সংঘটন হওয়ায় দারুণ শীত কত সময় পর্য্যন্ত অনুভব হয় নাই, তাহা গুরুদেবই জানেন। উষাকালে যখন মন ইন্দ্রিয়গত হইল, তখনই শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। ইহা নিজ বোধরূপ—ঐ অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে অনুভব বা জ্ঞান হইবে না।

আমার মুঙ্গের অবস্থিতি কালিন, একবার বাবা তারাভূষণ বাবুর বাস ভবনে আসিয়াছেন। আমরা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জন ভ্রাতা ভাগলপুর, মুঙ্গের, জামালপুর ও বহি হইতে আসিয়া সমবেত হইয়াছি। সন্ধ্যার পরে আমরা সকলে একখানি প্রকাণ্ড সতরঞ্চিতে বসিয়া এবং বাবা আমাদের খুব নিকটে একখানি আরাম চৌকিতে বসিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেছিলেন। আমরা মনযোগসহ ভগবানের বাক্য সুধা পান করিতেছিলাম। বাবা হঠাৎ বলিলেন,—আপনাদের অন্তরের যদি একটি কথা প্রকাশ করি আপনারা যাঁহাকে বাবা, বাবা, বলিয়া ব্যাকুল হন, ঐ কথা বলিলে বার বৎসরের মধ্যে এই বাবার মুখ দর্শন করিবেন না। সকলেই নির্ব্বাক, কিন্তু আমি ছাড়িবার পাত্র নহি। বলিলাম, পিতা জন্ম প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত এবং মায়িক জীব কর্ম্মফলে আবদ্ধ হইয়া সুখ দুঃখ ভোগান্তে দেহান্তর গমন করে। আপনি সৎগুরু, বাবা! আপনি এমত কার্য্য বলিয়াছেন, যাহার সাধনে কর্ম্মফল কাটিয়া নিষ্কাম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত মৃত্যুর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় বারম্বার জঠর যন্ত্রণা

স্বরূপ বারম্বার জন্ম গ্রহণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। ইহাতে এই প্রমাণ হইল পিতা জন্ম দেন তাহার ফলে জগতে ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া কামনায় আক্রান্ত হইয়া কত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আপনিও পিতা দয়ার আধার মায়িক জীবের প্রতি কৃপা করিয়া নিষ্কাম কার্য্যের উপদেশ দান করেন—যাহার সাধনে জন্ম রহিতের উপায় বলিয়া দিয়া থাকেন। সুতরাং জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা জন্ম রহিত কর্ত্তা পিতা অনেক উচ্চ সম্মানের। আর আপনি যদি আমাদের কলুষিত অন্তরের কথা যোগবল প্রভাবে বলিয়া দেন তাহা হইলে কি আমরা আপনাকে ত্যাগ করিয়া বহুকাল আপনার মুখ দর্শন করিব না? ইহা কি আমাদের সাধনের এই ফল অর্জ্জন করিয়াছি। যাঁহার আদেশ মত এতদিন সাধন করিয়া কত আনন্দ উপলব্ধি করিয়া প্রায় প্রতিদিন বিভোর হইতেছি আর আপনার একটা কথায় আপনাকে ত্যাগ করিব। আচ্ছা বাবা! আমার ন্যায় মহা পাপীকে পরীক্ষা করুন দেখি, সেই কথা শ্রবণ করিয়া আপনাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই কি না এবং ইহাতে হৃদয়ঙ্গম হইবে এত বৎসর বাবার আদেশ মত খাটিয়া সৎগুরুর একটী সত্য অপ্রিয় কথা সহ্য করিতে পারি কি না? দয়াময়! বলুন, আমি সহ্য করিতে পারি কি না এবং যদি অপারক হই ধারণা করিব এই আত্ম-কার্য্য কিছুই নহে, ভুতের ব্যাগার খাটিয়াছি। বাবা আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সকল ভ্রাতাগণকে বলিলেন—দেখুন, শ্রীশ বাবু আমার সমক্ষে কত বড় অহঙ্কারের কথা ব্যক্ত করিলেন। ৺কাশীতে আমার গুরুবাবার সমক্ষে এইরূপ একটী দর্প সূচক কথা ব্যক্ত করায় আমার গুরুদেব আমাকে তিনদিন কাঁদাইয়া ছিলেন। এখনও বলিতেছি আপনারা উহার ভ্রাতা আপনারাও বলুন যেন শ্রীশ বাবু এই অহঙ্কারের কথাগুলি অন্যায় হইয়াছে বলিয়া উঠাইয়া লয়েন। এই কথা শ্রবণ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, উকীল বাবু ও অন্যান্য ভ্রাতাগণ

আমাকে অনুরোধ করেন, দাদা! বাবা যখন এই কথা অন্যায় হইয়াছে বলিতেছেন তখন উহা উঠাইয়া লউন। আমি কহিলাম—যদি অন্যায় বিবেচনা করিতাম—ভুলক্রমে মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে অনুধাবন করিতাম, নিশ্চয়ই এই বাক্যগুলি উঠাইয়া লইতাম। অতএব, আপনারা এবং পরাৎপর বাবা আমাকে ক্ষমা করুন। বাবা বলিলেন—"আর আমি এই স্থানে বসিব না" বলিয়া তারাভূষণ বাবুর একটী চাকরকে বলিলেন, আমার বসিবার আসন প্রাঙ্গনের পশ্চিমদিকে দিয়া আইস তথায়, আলোর প্রয়োজন নাই অন্ধকারেই বসিব। এই বলিয়া বাবা উঠিয়া যাইলেন।

আমরা চল্লিশ পঞ্চাশ জন ভ্রাতা নিস্তব্ধ অবস্থায় নিজ নিজ স্থানে বসিয়া রহিলাম, কোন কোন ভ্রাতা আমি প্রকৃত দোষী নির্দ্ধারণ করিলেন। তখনও আমি কহিলাম, আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই ঠিক। আমরা সকলে নিস্তব্ধে বসিয়া আছি। আন্দাজ পনের মিনিট পরে বাবা আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি ও ভ্রাতাগণ আশ্চর্য্যান্বিত! ভ্রাতাগণ আমাকে বাবার নিকট যাইতে অনুমোদন করিলেন। আমি যাইতে লাগিলাম। বাবা বলিতেছিলেন,—শ্রীশ বাবু যেন একাকী আইসেন। আমি যাইয়াই পরাৎপর বাবাকে প্রণাম করিলাম, বাবা আমার পৃষ্ঠদেশ চাপড়াইয়া কহিলেন—এ ক্ষ্যাপামি কেন করিলেন? আমি জানি আপনি আমাতে তন্ময় আমিও সদা আপনাতে আছি। তবে এই সকল প্রবর্ত্তক ক্রিয়ান্বিতগণ সমক্ষে এইরূপ দাম্ভিকতা যুক্ত বাক্য প্রয়োগ গুরুর সমক্ষে কহিতে নাই। অতএব এই জানিবেন আমি আপনি অভিন্ন তাহা হৃদয়ে থাকুক। বাহিরে অন্যভাব দেখাইতে হইবে এই বলিয়া আমার পৃষ্ঠদেশ চাপড়াইতে লাগিলেন এবং বলিলেন আপনি এখান হইতে যাইয়া ভ্রাতাগণের সহিত সংমিলিত হউন। আমিও যাইতেছি, যাইয়া যখন কহিব শ্রীশ বাবুকে উহার দোষ স্বীকার করিতে

বলুন, তখন আপনি নিজের দোষ স্বীকার করিবেন। বাবা যাইয়া সকলকে বলিলেন, শ্রীশ বাবুকে নিজের দোষ স্বীকার করিতে বলুন। তখন আমি তাহাই করিলাম ঐ দিনের পালা শেষ হইল।

গুরুপুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে গুরুদেব আমাকে কতকগুলি নিমন্ত্রণ পত্র মুঙ্গের সিদ্ধাশ্রমে পাঠাইয়া, আমাকে লিখেন "আপনি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, খোকার অন্নপ্রাশন কার্য্য শেষ হইয়াছে, তবে ব্রাহ্মণ ও ক্রিয়ান্বিতগণের ভোজন কার্য্য দেওঘরে সম্পন্ন হইবে। আপনি আমার প্রতিনিধি রূপে মুঙ্গের ও জামালপুরের ক্রিয়ান্বিতগণের বাটী যাইয়া নিমন্ত্রণ করিবেন, যাহাতে নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলের আগমন হয় তাহার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিবেন। আমি বাবার আদেশ মত প্রত্যেকের বাটী যাইয়া অর্থাৎ বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী ক্রিয়ান্বিতের বাটী যাইয়া মিনতিসহ দেওঘরে যাইতে অনুরোধ করি।

মুঙ্গের, জামালপুর ও ভাগলপুরের ক্রিয়ান্বিত সহ নির্দ্দিষ্ট দিনে বাহান্নবিঘা দেওঘরে গমন করিয়া শুভকার্য্যে যোগদান করি। অন্নপ্রাশন কার্য্য পরে বাবা আমাকে লিখেন এবং মুঙ্গেরের সমস্ত ক্রিয়ান্বিত গণকে জানাইতে কহেন "বাবাজী পাহাড়িয়া বাবা ওরফে রামানন্দ স্বামী মুঙ্গের আসিবেন তাঁহার বয়ক্রম সাতশত বৎসর হইবে প্রচ্ছন্নবেশে মুঙ্গেরের ক্রিয়ান্বিতগণের ক্রিয়া পরিদর্শন করিতে যাইবেন, আপনারা সকলে সাবধান হইয়া ক্রিয়া করিবেন। তিনি পাহাড় হইতে নামিয়া ভারতের তাঁহার সম্প্রদায়ের ক্রিয়া পরিদর্শন করিয়া বঙ্গদেশে আসিবেন।" আমি এই সংবাদ মুঙ্গেরের সকল ক্রিয়ান্বিতগণকে দিলাম।

গুরুদেবের পত্র পাইবার দুই তিন দিন পরে একদিন রাত্রি আট ঘটিকার সময়ে আহার করিয়া এগার ঘটিকার সময়ে সাধনে উপবেশন করিব এবং রাত্রি দুই ঘটিকার সময়ে ক্রিয়া সমাপনান্তে উঠিব ইহাই নিয়ম। আমি ঐ রাত্রে দশ ঘটিকার কিছু পূর্ব্বে সিদ্ধাশ্রমের নিম্নতলের

একটী কুঠরি আছে, তাহাতে একখানি সোফায় বসিয়া কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিতেছি। তাহার বাহিরে হলের উত্তরদিকে টেবিলে গুরুবাবা ও পরম গুরুদেবের ফটো ফুলের মালায় শোভিত করা হইয়াছে একটী ঝুলয়িমান আলো জ্বলিতেছে। তিনটী শার্শির দরজা বন্ধ, মধ্যের দরজাটি ভেজান রহিয়াছে, কয়েকখানি কাষ্ঠাসন এবং কয়েকটী আলমারি রহিয়াছে। আমি মনযোগ পূর্ব্বক বাবার ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেছি। দক্ষিণ দিকের ছোট ঘরে আমার পিয়ন আহারান্তে শয়ন করিয়া আছে। হঠাৎ রাস্তারদিকে মধ্যকার শার্শির দরজা খোলার শব্দ হইল এবং তৎসহ একখানি কাষ্ঠাসনের নড়িবার শব্দ হইল। ভাবিলাম এতরাত্রে কাহারতো আসিবার কথা নাই, মনে হইতেছে, কেহ যেন হল ঘরে প্রবেশ করিয়া চেয়ার টানিয়া বসিলেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম টেবিলের সম্মুখে একখানি কাষ্ঠাসনে একজন হিন্দুস্থানী কৌপীন পরিধৃত কোমরে সরু দড়ি লাগান মস্তকে চুল ঝাকড়া, সর্ব্ব অঙ্গে বিভুতি মাখা যোগী পুরুষ উত্তর মুখে টেবিলের উপরিস্থ ফটো দুইটির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া হাসিতেছেন, চেয়ারের পার্শ্বে লাউয়ের কমণ্ডলু। আমি বাহির হইয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা হইতে আপনার আগমন হইতেছে। তিনি একটী অঙ্গুলির সঙ্কেতে কহিলেন, উত্তরদিক হইতে। তিনি সাক্ষাৎ করিলেন সত্য কিন্তু মুখ ফিরাইয়া আমার প্রতি লক্ষ্য করিলেন না এবং কথা কহিলেন না। আমি কহিলাম—ঠাকুর ক্লান্ত হইয়া আসিয়া পদধুলি এই অধমের কুটীরে প্রদান করিয়াছেন; রামলাল হালুইকর আমার কুটীরের সন্নিকটে রাত্রে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছে অনুমতি হইলে আপনার সেবার জন্য কিছু আনিতে পারি। এই বাক্যগুলি হিন্দিভাষায় কহিলাম। তিনি একখানি হস্তদ্বারা সম্পূর্ণ আপত্তি জানাইলেন। কেবলই তিনি একদৃষ্টে

ফটো দুইখানিতে চক্ষু সংলগ্ন রাখিয়াছেন। তৎপরে আমার ক্ষুদ্র কুঠরিতে প্রবেশ করিয়া একটী টাকা বা আঁধুলি ঠিক স্মরণ নাই হস্তে করিয়া যেমন তাঁহার পদতলে দিতে যাইলাম তাঁহার সেবার জন্য, তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া দুইখানি হস্ত নাড়িয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া উঠাইয়া লইতে বলিলেন। তাহা উঠাইয়া কোমরে বা হাতে না রাখিয়া আমার ক্ষুদ্র কুঠরি মধ্যস্থ বাক্সে রাখিয়া অর্দ্ধ মিনিট মধ্যে সাধুর নিকটে আসিয়া দেখিলাম অন্তর্দ্ধ্যান হইয়াছেন, শার্শির দরজার শব্দও হইল না কমণ্ডলু নাই। জ্যোৎস্না রাত্রি আমার পিয়ন নাটুভকৎকে ডাকিয়া, হল হইতে বড় রাস্তার চারিদিকে আমি ও পিয়ন অনুসন্ধান করিলাম। সন্ধান করিলে কি হইবে তিনি অন্তর্দ্ধ্যান হইয়াছেন। তখন মনে ধিক্কার আসিল কেন আমি অর্দ্ধ মিনিটের জন্য তাঁহার নিকট না থাকিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। আমার সহিত একটী কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি যে সুক্ষ্ম শরীরে আসিয়াছিলেন, অনিচ্ছার ইচ্ছায় সকলই করিতে পারেন।

এই সংবাদ ভ্রাতাগণকে প্রদান করিতেই সকলেই আমার প্রতি বিরক্ত হইলেন। তাহাদিগকে আহ্বান করিতে কি সময় পাইলাম? গুরুবাবাকে বাবাজীর আগমন সংবাদ লিখিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন বাবাজী বিহারের ক্রিয়াবানদিগের ক্রিয়া দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, বাঙ্গালীদিগের প্রতি কুপিত হইয়া গিয়াছেন, বাবাজী দেওঘরে আসিয়া গুরুবাবাকে শাসন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, কেন ও বেটাদের জন্য কামনা কর? উহারা বাক্য বাগিস।

মুঙ্গের পরিত্যাগের দেড় বৎসর পূর্ব্বে মুঙ্গেরে প্লেগ ব্যাধির প্রকোপ হয়। যে পল্লীতে সিদ্ধাশ্রম বাটী তথায় ইন্দুর মরিতে শুনিতে পাই নাই। মুঙ্গেরের অন্যান্য পল্লীতে ইন্দুর মরিতে আরম্ভ হয় এবং প্লেগ ব্যাধি

আক্রান্ত হইয়া অনেক লোক কালগ্রাসে পতিত হইতে থাকে। মুঙ্গেরের এসিষ্ট্যান্টসার্জ্জন বাবু মন্মোহন গুপ্ত—ইনিই এই সহরে প্রধান খ্যাতনামা ডাক্তার। তিনি প্লেগ আরোগ্য করিতে অপারক হন, এমন কি তাঁহার পরিত্যক্ত দুই তিনটি রোগীর আত্মীয় হতাশ হইয়া আমার শরণাপন্ন হন। গুরুদেবের কৃপায়, গুরুদেবের দেশীয় ঔষধিতে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হওয়ায়, মুঙ্গেরের উকীল তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, এবং ভূপালচন্দ্র মজুমদার বি, এল, অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বাবার ঔষধি প্রচার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ে বলের সঞ্চার হওয়ায় প্রাণভয়ে সহর ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু কাল মহাকালে যখন সংমিলিত হয়, তাহা রোধ করে কাহার সাধ্য।

একদিন রাত্রে দোতলা ঘরে একটী হাঁড়ির মধ্যে অর্দ্ধমৃতবৎ একটি ইন্দুর আমার স্ত্রী স্পর্শ করেন এবং তদ্ধেতু ভীতা হন। আমি গুরুদেবকে জ্ঞাপন করায় বাবা প্রতিদিন রাত্রে গুল পোড়াইতে এবং বিসনাশক প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ দেওয়ায় প্রতিদিন বাটীর প্রত্যেক ঘর পিচকারী সহ ঔষধি প্রয়োগ করিতে লাগিলাম এবং প্রতিদিন প্রাতে চিরেতার জল প্রত্যেককে পান করাইতে লাগিলাম। মুখের কসের মধ্যে কর্পূর সকলকে রাখিতে বলায় অনেক দিন ঐরূপ ভাবে কার্য্য চলিতে লাগিল।

জামালপুরে প্লেগে অনেকের মৃত্যু হওয়ায় আমার শ্বশুর মহাশয় স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গকে দেশে বলাগড়ে পাঠান। এদিকে আমার ধর্ম্মপত্নীর বগলে কুঁচকিসহ জ্বরাক্রান্ত হওয়ায় ভীত হইয়া তিনটি পুত্র ও একবৎসরের শিশু কন্যা রাণীকে জামালপুরে তাঁহার খুল্লতাত পুত্র রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীর নিকট পাঠাইতে বারম্বার অনুরোধ করায় অনেকটে তথায় পাঠাইয়া দিলাম। আমার পত্নীর জ্বর বৃদ্ধি হইতে ও বিচি প্রতিমুহূর্ত্তে বেদনাসহ আয়তন বাড়িতে লাগিল।

মুঙ্গেরের কোন ক্রিয়ান্বিত বা ক্রিয়ান্বিতা প্রাণের ভয়ের জন্য কেহই আসিতেন না। ব্রাহ্মণ, চাকরাণী ও পিয়নটি পলায়ন করিল না। তাঁহারা রোগীর কি শুশ্রূষা করিবে। আমি উপর তলায় একটী নেয়ারের খাটে মশারি টাঙ্গাইয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম এবং ঐ খাটে বসিয়া সাধনাও করিতাম। দ্বিতীয় দিবস রাত্রে ঐ খাটে বসিয়া তন্ময় ভাবে সাধনা করিতেছি এবং মধ্যে মধ্যে গুরুদেবের ব্যবস্থা মত ঔষধি সেবন করাইতেছি। ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ঐ ঘরের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে গুরুদেব, পরম গুরুদেব এবং একটী দশ বৎসর বয়স্ক হিন্দুস্থানী বালক কাপড়ের টুপি মাথায় তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান দৃষ্টিগোচর হইল। উত্তর পূর্ব্ব কোণে মাথায় তাজ, শরীরে চাপকান গাল পাট্টা দাড়ি ও গোঁফ, পায়ে পায়জামা লাগান, কোমরবন্ধ আঁটা, হস্তে শানিত ছুরিকা, কট্মট্ করিয়া রোগীরদিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দৃষ্টিগোচর হইল। সেই মুহূর্ত্তে দুই গুরুদেব কি পরামর্শ করিয়া একখণ্ড কাগজে একটা গুড়া ঔষধি দিয়া বালকটিকে রোগীর মশারির নিকট পাঠাইলেন এবং ঐ বালক মশারি খুলিয়া ঐ কাগজের ঔষধি রোগীকে খাওয়াইল। স্বপ্ন নহে আমি জাগরিত হইয়া বসিয়া সাধনা করিতেছিলাম। আমি রোগীর খাটে রহিয়াছি সকলই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। যখন বালকটী ঔষধি সেবন করাইয়া গুরুদেবদ্বয়ের নিকটে যাইল প্রত্যক্ষ করিলাম। তাহার অল্পক্ষণ পরে, গুরুদেবদ্বয়ের ও হিন্দুস্থানী বালকের অবয়ব অদৃশ্য হইল। অন্য দিকে দৃষ্টিগোচর হইল যমদূত যে পূর্ব্ব উত্তর কোণে দণ্ডয়মান ছিল তাহার অবয়ব অদৃশ্য হইল। তখনই আমার পত্নীকে কহিলাম, ওগো! এইমাত্র কি কোন ঔষধি খাইলে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ কিছু যেন খাইলাম। আমি বলিলাম ভয় নাই, দুই বাবা পরামর্শ করিয়া তোমার জন্য ঔষধি দিয়াছেন আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে দৃশ্য উত্তর পূর্ব্ব কোণে দৃষ্টি-

গোচর হয় তাহা শমন ভিন্ন কেহ নহে। ভাবিলাম গুরুদেবের প্রত্যক্ষ লীলা দেখিলাম, দেখি ইহার ফল কি হয়। রাত্রি প্রভাত হইল, রোগী আমাকে বলিলেন গুরুবাবার পদরজ আমার বাক্সে আছে তাহা হইতে একটু লইয়া আমার কপালদেশে এবং একটু বেদনা স্থানে লাগাইয়া দাও; আমি তাহাই করিলাম। ঐ সময় পৌষ মাস, সম্পূর্ণ উত্তরায়ন বহিয়াছে। তিনি বলিতে লাগিলেন আমাকে খাট হইতে অবতরণ করাইয়া মেঝেতে শয়ন করাইয়া দাও।

গৌরাঙ্গ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এল,-এম,-এস, তিনি মুঙ্গেরে হোমিওপ্যাথি সুচিকিৎসক। তাঁহার বাটী হালিসহর, তাঁহার পিতা এবং আমার শ্বশুর মহাশয় জামালপুরে একই পল্লীতে বসবাস করিতেন। আমার শ্বশুর ও গৌরাঙ্গ বাবুর পিতা অকপট বন্ধু, আমার স্ত্রীর সমবয়স্ক, বাল্যকালে একত্রে খেলা করিতেন। প্লেগ ব্যাধি আক্রান্ত হওয়ায় তিনি অনেক সময়ে আমার বাস ভবনে রোগীকে দেখিতেন। আমার পত্নী বলিলেন, হস্ত দ্বারা দেখ আমার কান দুইটী ঠাণ্ডা হইয়াছে, নাক ঠাণ্ডা, হস্ত পদ ঠাণ্ডা অনেকক্ষণ হইয়াছে। আমি কহিলাম, তোমার কোলের মেয়েটিকে জামালপুর হইতে আনাইব? তুমি তাহাকে দেখিতে চাও? তিনি উত্তর করিলেন, আমি দেখিতে ইচ্ছুক নহি। গৌরাঙ্গ বাবু পূর্ব্বে বন্দাগড়ে আমার শ্বশুর মহাশয়কে তারে সংবাদ করিয়াছিলেন। আমার স্ত্রীর নাভিশ্বাস মোটেই হইল না, কণ্ঠশ্বাস হইল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন আছ? তিনি উত্তর দিলেন, এখন বড়ই আনন্দ, চক্রগুলি ছাড়িতে ছাড়িতে উঠিতেছে, বড়ই আনন্দ। গৌরাঙ্গ বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বসিয়া দেখিতেছেন, তিনি বলিলেন— অনেকের মৃত্যু দেখিয়াছি এমন অদ্ভুত মৃত্যু কখনও দেখি নাই। ইত্যবসরে বিনা খাবি খাইয়া কূটস্থে লীন হইলেন।

এই মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিলে কাহার না হিংসা হয়। উত্তরায়নে কথা

কহিতে কহিতে সাধ্বী আমার ধর্ম্মপত্নীর মৃত্যু সংঘটন হইল। গুরু-দেব কলিকাতা হইতে লিখিলেন, বৌমার মৃত্যু আনন্দ জনক হইয়াছে, তাঁহার আর পুনরাবৃত্তি হইবে না। তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য রাত্রের ঘটনা দেখিয়াছেন, প্রদীপে তৈল না থাকায় জীবন প্রাপ্ত হইলেন না

যে দিন প্রাতঃকালে মৃত্যু হয়, শব তখনও দোতলায় রহিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে আমার শ্বাশুড়িমাতা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্র সহ দেশ হইতে জামালপুর হইয়া মুঙ্গেরে আমার বাস ভবনে উপস্থিত হন, তাঁহাদিগকে শব দেখান হইল না। একখানি অশ্বশকটে জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতিত সকল পুত্র কন্যাকে বলাগড়ে লইয়া যাইতে বলিলাম। তিনি তাহাই করিলেন। আমরা মৃতদেহ গীতাসহ গঙ্গাতীরে গমন পূর্ব্বক সৎকার্য্য কার্য্য সমাপনান্তে মুঙ্গের সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া, সিদ্ধাশ্রম বন্ধ করিয়া আমার শ্যালক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অশ্বশকটে জামাল-পুর রওনা হইলাম। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জ্যোতিশ্চন্দ্র মুখাগ্নী করেন এবং গঙ্গাতীরে গৌরাঙ্গ বাবু ডাক্তার শবের সহিত গিয়াছিলেন।

জামালপুরে শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাপন অন্তে গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শনার্থ পুত্র সহ কলিকাতায় রওনা হইলাম। পরাৎপর গুরুদেবকে আর্য্যমিশন স্কুলে সাক্ষাৎ করিয়া প্রণাম করায় বাবা বলিলেন—বৌমার জীবন রক্ষা জন্য যাহা যাহা মুঙ্গেরে করা হইয়াছিল রাত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সান্নিপাতিক ক্বচিৎ আরোগ্য হয়। গুরু ভ্রাতাগণের প্রমুখাৎ এবং অবশেষে শ্রীযুক্তেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর নিকট শ্রবণ করিলাম, গুরুবাবা ঐ সময়ে নিজের শরীরে সমস্ত প্লেগ লক্ষণ যুক্ত প্রবল জর গ্রহণ করিয়া-ছিলেন, কয়েকদিন শয্যাগত ছিলেন। প্রদীপে তৈল না থাকিলে কিছুই হয় না। ঐ দিবস রাত্রে মাতাঠাকুরাণী আমাকে এবং জ্যোতি-শ্চন্দ্রকে ব্রজনাথ মিত্র লেন ডাঃ বাটীতে বাবার বাস ভবনে রাত্রে নিমন্ত্রণ করেন। আহারান্তে আমরা মলঙ্গা লেনের শ্বশুর মহাশয়ের বাসায়

শয়ন করি। বাবা আমাকে আদেশ করেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দেখিতে পরদিবস যেন আমরা বলাগড়ে শ্বশুরালয়ে গমন করি এবং আপনার অবিবাহিতা শ্যালিকা থাকিলে আপনার শ্বশুর শ্বাশুড়ির মত হইলে বিবাহ করি। অবশেষে ২।৩ মাসের মধ্যে গুরুদেবের মতানুসারে বিবাহ হয়। বিবাহ অন্তে মুঙ্গেরে একাকী গমন করি।

আয় কম হওয়ায় প্লেগের সময়ে সহরে লোকশূন্য হওয়ায় আমার আয় একেবারে কমিয়া গেল তৎপরে বাবার আদেশ মত একবৎসরের জন্য চম্পারন জেলান্তর্গত টুর্কোনিয়া নীলের কারখানায় ডাক্তার হইয়া যাই। সাহেবেরা জুতা খুলিয়া বাঙ্গালায় যাইতে বলায় কার্য্য ত্যাগ করিয়া ঝরিয়া পাথুরিয়া কয়লার খনির ডাক্তার হইয়া দশ বার বৎসর ব্রাহ্মণবাবারি কয়লা কুঠিতে থাকি। ঐ সময়ে ঝরিয়ার অনেকগুলি লোক ক্রিয়াপ্রাপ্ত হন! এই সময়ে আমার কনিষ্ঠা সহধর্ম্মিনী আমার সহিত ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ভেটারিনারি কলেজে কলিকাতায় পড়িত এবং গোপাল ও গোবিন্দ তাহাদের মাতুলালয়ে থাকিয়া বলাগড় স্কুলে পাঠ করিত। ক্রমে ক্রমে জ্যেষ্ঠপুত্র ভেটারিনারি কলেজ হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক সহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বেহার গবর্ণমেন্টের অধীনে কার্য্য করিতে থাকেন। মধ্যমপুত্র গোপাল বলাগড় স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বি,এ, পাশ করিয়া, বলাগড় স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্যকালিন, এম, এ, পরীক্ষা পাশ করে। কনিষ্ঠ পুত্র বলাগড় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া পাস হইয়া, চুঁচুড়ায় আই, এ, পরীক্ষায় পাশ হইয়া কিছুদিন পরে দিল্লীতে সরকারী কার্য্য প্রাপ্ত হয়। কিছুদিন পরে ঐ কার্য্য ত্যাগ করিয়া বাটী আসিয়া, ভাগলপুরে সর্টহাণ্ড টাইপিং পাশ করিয়া, বিভিন্ন মাইনর স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করে।

ঝরিয়া অবস্থিতি কালিন এক সময়ে আমার অন্তঃকরণ প্রদেশে

বেদনা ও চারিপার্শ্বে লালবর্ণ, তৎসহ জ্বরভাব হয় এবং হৃদয়গহ্বরে অব্যক্ত-যন্ত্রনা এবং হৃৎকম্প অনুভূত হওয়ায়, দেওঘরে পরাৎপর গুরুদেব সন্নিধানে গমন করিয়া হৃদয়ের লক্ষণগুলি বর্ণনা এবং হৃৎপিণ্ডের উপরিভাগ লাল-বর্ণ দেখাই। তিনি পরম সন্তুষ্ট হইয়া পৃষ্ঠদেশ চাপড়াইয়া বলিলেন, শ্রীশ বাবু আপনার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইল, মহা আনন্দের লক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে। ভয় না করিয়া স্থিরবায়ুর কার্য্য উত্তমের সহিত করিতে, ভীত হইবেন না। এই সময়ে ঝরিয়া হইতে ক্রমে ক্রমে কয়েকজন ব্রাহ্মণ যুবক গুরুদেবের নিকট দেওঘরে ক্রিয়াপ্রার্থী হইয়া গমন করেন। গুরুদেব তাঁহাদিগকে আত্মকর্ম্মের উপদেশ না দিয়া, আমার নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে আদেশ দেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা তাহার নিকট হইতেই আত্মকর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমার নিকট যাইয়া ক্রিয়া লইতে বলায়, অবশেষে আমার নিকট হইতে নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করেন। প্রত্যেক রবিবারে বাৱারিতে 'একটি গীতাসভা' প্রতিষ্ঠা করায় অনেক ক্রিয়াবান ঝরিয়া এবং নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে গীতার অন্তর্লক্ষ্যের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে সমবেত হইতেন।

শ্রীমান রাধাগোবিন্দের তিনটি পুত্র পর পর জন্মগ্রহন করেন। ঝরিয়া অবস্থিতি কালিন গুরুদেব আমাকে ষষ্ঠ ক্রিয়া প্রদান করেন। বল্লাগড়ে আসিয়া ঐ ক্রিয়া সমাধা অন্তে গুরুদেবকে লিখি, আমাকে আর কোন ক্রিয়া দেওয়া হইবে কিনা? বাবা তাহার উত্তর দেন নাই। শ্রীমান বোধিসত্ত্বের অর্থাৎ গুরুপুত্রের বিবাহ জাঁকজমক সহ কলিকাতায় সম্পন্ন হয়, আমি সস্ত্রীক বল্লাগড় হইতে বিবাহ কার্য্যে যোগদান করি, তৎকালিন বাবা আপনা হইতেই আদেশ করেন, শ্রীশ বাবু! এখন আপনি ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবেশন করিয়া সাধনা করিতে পারেন। তদনুসারে বেহার হইতে একজন ক্রিয়ান্বিত আমার নিমিত্ত একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম পাঠাইয়া দেন, সেই আসনে বসিয়া আত্মকার্য্য করিতাম। কলিকাতায় বিবাহের বৌভাতের সময়ে উপস্থিত ছিলাম, স্ত্রীলোক

দিগের ভোজন ও তৎপরে ক্রিয়ান্বিতগণের আয়োজন করা হয়। যে দিবস ক্রিয়ান্বিতগণ ৬ নং ব্রজনাথ দত্ত লেনে নিজ বাটিতে ক্রমে ক্রমে ভোজন করেন, তাঁহাদের ভোজনান্তে লীলাময় গুরুদেব এক এক দলকে বলিয়াছিলেন, আপনারা উচ্চক্রিয়ান্বিত শ্রীশ বাবুকে জানেন? তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিলেন, জানি; কেহ বলিলেন তাঁহার নাম শুনিয়াছি। বাবা এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যাইবার সময়ে শ্রীশ বাবুকে আপনারা প্রণাম করিয়া যান, তিনি অমুক বাড়ীর দোতলায় আছেন। বিবাহ উপলক্ষে ২।৩টি বাড়ী ভাড়া করা হয়, ঐ সকল ক্রিয়ান্বিতগণ আমি ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট আশুবাবু ভূপাল ও তারাভূষণ উকিলদ্বয় সহ যে দ্বিতল গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তথায় অনুসন্ধান করিয়া উপস্থিত হইয়া সকলে আমার অনুসন্ধান করিয়া একে একে আমাকে প্রণাম করিয়া যান। বাবা তাহার পার্শ্বে দ্বিতল গৃহে অবস্থিতি করিতেন। এদিকে তিনি প্রত্যেক দলের ক্রিয়ান্বিতগণের আহার অন্তে আমাকে প্রণাম করিবার জন্য বলায়, বিস্তর লোক প্রণাম করিয়া যাইলেন। বাবা সকলের আহার অন্তে যখন পার্শ্বের গৃহ প্রবেশ করেন, আমরা সকল ভ্রাতা নির্দ্দিষ্ট ঘর হইতে যাইয়া বাবাকে প্রণাম করিলাম এবং আমি ক্রন্দন করিয়া নিবেদন করিলাম, বাবা! আমাকে কি ক্রিয়াভ্রষ্ট উদ্দেশে বড় বড় বৃদ্ধ যুবক ক্রিয়ান্বিত পাঠাইয়া প্রণাম করিয়া যাইবার কথা বলায়, আমি আতঙ্কে ম্রিয়মান হইয়াছি। তৎশ্রবণে বাবা বলিলেন, আপনি উচ্চক্রিয়ান্বিত, স্থিরবায়ুর ক্রিয়া করেন সুতরাং আপনি সকলের প্রণম্য, তাঁহারা প্রণাম করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গলা ১৩২৮ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষে যখন দেওঘরে ১০ জন সম্ভ্রান্ত স্ত্রী পুরুষকে বাবার ক্রিয়া দিতে যাই, বলাগড়ে প্রত্যাগমন করিয়া গুরুদেবদ্বয়ের জন্য দৈনিক ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। একদিন ভোগ দিবার সময় কূটস্থের মধ্যে দুই জন ঠাকুরের কপালে টাট্‌কা তুলসী পত্র দেখিতে পাই। দেখিয়া স্ত্রীকে বলি, তুলসী দেখিতে পাইতেছি।

আমি ভোগে তুলসী ছিল কিনা জানি না, অথচ দেখিলাম তাঁহাদের কপালে তুলসী। মৃণালিনী বলিলেন, দেখুন, তুলসী ভোগে আছে কিনা? তখন দেখি তুলসী রহিয়াছে, "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" শ্লোকটি মনে আসায় ভাবিলাম, তবে ত দয়াল ঠাকুর গ্রহণ করিয়াছেন। আর একদিন ত্রিদল বিল্বপত্র তাঁহাদের কপালে রহিয়াছে, অথচ ভোগ দেওয়ার পূর্ব্বে ভোগে বিল্বপত্র আছে কিনা দেখি নাই। সেই দিন অমাবস্যা বলিয়া মৃণালিনী বিল্বপত্র দিয়াছিলেন, আশ্চর্য্য ব্যপার! দুই দিন ভোগে একটি মাত্র বিল্বপত্র ছিল কিন্তু নিবেদন অন্তে দেখিলাম কেবল ঠাকুর মহাশয়ের কপালে বিল্বপত্র, কাশীর ঠাকুরের কপালে কিছু নাই। তখন ডাকিয়া আর একটী বিল্বপত্র দেওয়ায় কাশীর ঠাকুরের কপালে বিল্বপত্র দেখিলাম।

একদিন প্রাতে উঠিয়া মৃণালিনীকে বলিলাম গত রাত্রে দেওঘরে মাতাঠাকুরাণীর নিকটে আমি যাইয়া প্রসাদ প্রার্থনা করায়, মা যথেষ্ট খাওয়াইলেন। ইহার তৃতীয় দিবসে মাতাঠাকুরাণী আমার স্ত্রীকে লিখেন, দেখ করুণা, আমার ছেলেকে তাহার মনমত খাইতে দাও না, তাই ছেলে পরশু রাত্রে এখানে আসিয়া আহার প্রার্থনা করেন। আমি তাহাকে দালানে বসাইয়া খাওয়াইলাম, ছেলের আহার কমিয়া গিয়াছে, ছেলেকে টাটকা ছানা ইত্যাদি দিয়াছিলাম, এমন বেটার ছেলেই নয়, তোমার রং-চঙ্গে তরকারিতে ভুলিবে না।

নানক কবীরের পোষাক পরিয়া কয়েকটী লোককে ক্রিয়াদিতে একবার দেওঘরে গিয়াছিলাম।

একদিন রাত্রে আমি দেখিলাম, বিশাল সমুদ্রের কিনারায় একটি তিন কুঠারি একতলা ঘরে তিনজন অন্ধ আমার নিকট অন্ধের ঔষধি চাহিতেছেন। আমি বলিলাম, পাঁচ টাকা মূল্য দিতে হইবে, দুইজনকে চক্ষু প্রদান করিলাম। তৃতীয় ব্যক্তিকে চক্ষু প্রদান করিলাম, তিনি পাঁচ টাকা দিতে চাহেন না। সকলেরই চক্ষু হইল। বাবা আসিয়া আমাকে বলিলেন, কি হইয়াছে শ্রীশ

বাবু ? আমি বলিলাম, বাবা ! দেখুন কি অন্যায়! দুইজন পাঁচ টাকা করিয়া দিয়া চক্ষু পাইয়াছেন, তৃতীয় ব্যক্তিরও চক্ষু হইয়াছে কিন্তু ইনি মূল্য পাঁচ টাকা দিতেছেন না। বাবা বলিলেন, আচ্ছা আমিই টাকা দিতেছি।

একদিন শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ভগ্নী জ্ঞানময়ী—যিনি এখান হইতে ক্রিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এক পত্রে তাঁহাকে লিখি, আমি বাটী হইতে বলাগড় হইতে অন্যত্রে যাইব, কোথা যাইব ঠিক নাই। তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"বাবা! একদিন রাত্রে দেখি, আপনি ও দেওঘরের বাবা পাঁচড়ায় আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা! আপনার কোথায় যাইবার কথা ছিল গিয়াছিলেন কি ? আপনি বলিলেন, এইত আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। বাবাকেও সঙ্গে আনিয়াছি, যাহা জিজ্ঞাসা করিবার থাকে উঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" তৎপরে জ্ঞানময়ী আমাদিগকে খাইতে দেন। জ্ঞানময়ী আমাকে লিখিয়াছিলেন, "আহার কালিন দেওঘরের বাবার দক্ষিণের পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলি নাই দেখিলাম, ইহার কারণ কি বাবা লিখিবেন ?" আমি যথাযথ উত্তর দিয়াছি।

এপ্রিল মাসের শেষে লোধনার শচীন্দ্র চন্দ্র কাননগুইকে পত্র লিখি। তাঁহার ক্রিয়ার শিথিলতার জন্য শাসন বাক্য প্রয়োগ করি। তিনি তাহার উত্তরে লিখিতেছেন যে, আপনার উত্তর আসিবার পুর্ব্বে একদিন শেষ রাত্রি না নিদ্রা না জাগরণ অবস্থায় আপনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যেন বাবারি-কোলিয়ারী যাইতেছি। মধ্যস্থানে একটা ঘরে দেখি, চেয়ারে বসিয়া একজন কি করিতেছেন। মধ্যে টেবিল, তাহার সম্মুখে আর একখানি চেয়ারে আপনি বসিয়া বলিতেছেন, ক্রিয়া হইতেছে না, করিয়া চলুন ঠিক হইবে। আমি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে প্রণাম করিয়া দেখিলাম, কি আশ্চর্য্য! সেই চেয়ারেও আপনার চেহারা। আপনি বলিতেছেন, দুই এক দেখিতেছেন, ক্রিয়া করিয়া ঐরূপই হয়, করিয়া চলুন।

তিন মাস পূর্ব্বে কোম্পানির ডাক্তার বাবু, নরেশ সরকারের বিনয় নামক

ছেলেকে দেখিতেছেন, অনেকটা Typhoidএর মত, নরেশ বাবু আমাকে লইয়া যান। গিয়া দেখি, রোগীর সাংঘাতিক অবস্থা। একটা ব্যবস্থা করি, কিন্তু অবস্থা খুব খারাপ, এমন কি চক্ষু রক্তবর্ণ, লোক চিনিতে অক্ষম, ফুসফুস প্রদাহ নাড়ীর ও শ্বাসের অবস্থা মন্দ থাকায় তাহার পরের দিনে আবার যাইবার কথা। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে কোম্পানীর ডাক্তার রোগী দেখিয়া ভয় পান, এমন কি বিনোদ বাবু L. M. S. ডাক্তারকে দেখান উচিত। তাহাই স্থির হয়, পরদিন বিনোদ বাবুকে আনা হইবে।

ঐ রাত্রি সাড়ে বারোটা একটার সময় অর্দ্ধ নিদ্রা অবস্থায় আছি, বাবা আসিয়া বলিলেন, শ্রীশ বাবু! শ্রীপুরের রোগীটি দেখিতে চলুন। আমরা উভয়ে শূন্যে শূন্যে গমন করিয়া নরেশ বাবুর ছাদে নামিলাম। ঠাকুরের হস্ত সংস্পর্শে রোগীর ঘরের কপাট খুলিয়া গেল। দেখি ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে, রোগী লইয়া চারিটী লোক গাত্রে লেপ দিয়া শয়ন করিয়া আছে। আমরা দুইজন ঘরে প্রবেশ করিয়া যখন রোগীর কপালে হস্ত দেওয়া হইল, তখন আমি যেন বাবা হইয়াছি। আমি একাকী রোগীর কপালে হাত দিয়া চলিয়া আসিলাম, কবাট বন্ধ হইয়া গেল। প্রাতে যাইয়া দেখি রোগীর সাংঘাতিক অবস্থা তিরোহিত, একেবারে নাড়ি ভাল, জ্বর কম, পনর ষোল দিনের রোগী আমাকে ও কোম্পানীর ডাক্তারকে চিনিলেন, চক্ষুর রক্তবর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। আমি নরেশ বাবুকে কহিলাম, কল্য একটা রাত্রির সময়ে এ ঘরে কয়জন শুইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, চারিজন। কিন্তু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; কেন শ্রীশ বাবু ব্যাপার কি? আমি গোপন করিলাম। বলিলাম, আমাকে আর আসিতে হইবে না। আপনার ছেলে সারিয়া গেল। কোম্পানীর ডাক্তার তো অবাক! বলিলেন, দাদা, ব্যাপার কি? যাহাকে গত সন্ধ্যার সময়ে হতাশ রোগী মনে করিয়া উদাস মনে বাটী যাইলাম, সেই রোগী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য উন্মুখ, ব্যাপার কি? আমি বলিলাম, ভৌতিক বিশ্বাস করেন? তিনি বলিলেন করি। আশ্চর্য্য ঘটনা!

১৯২৬ খ্রীঃ মে মাসে শ্রীযুক্ত চুণিলাল সরকার দুই দিন রাত্রে না নিদ্রা না জাগরণ অবস্থায় আমার স্বরূপ দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি যেন তাঁহাকে ক্রিয়ার প্রকরণ গুলি দেখাইয়া দিতেছি। এইরূপ ঘটনা দুই দিন হইয়াছিল। তিনি বলাগড়ে আসিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন। সকলই বাবার লীলা। তবে চুণিবাবুর বিষয় রাত্রে মনে করিয়াছিলাম, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি।

দ্বিজেনের চাকরি হওয়ার সংবাদ আমি দশ বার দিন পূর্ব্বে দেখি। তাহার পরে তারক যখন বাটী আসিয়া দ্বিজেনকে বলে। দ্বিজেন বলে, মুখুয্যে মহাশয় এ সংবাদ দশ বার দিন পূর্ব্বে জানিয়া আমাকে বলেন। তারক আশ্চর্য্যান্বিত! সমস্তই ঠাকুরের খেলা।

২৬।৬।২৬ গত শনিবার তারক বাটী আসিসে, রবিবারের বৈকালে নরুকে বলে, মুখুয্যে মহাশয়কে ডাকিয়া দাও। সেই সংবাদ শুনিয়া পাইখানা যখন যাই, তথায় বসিয়া ভাবিবামাত্র মনে উদয় হয়, তারক ক্রিয়া পাইবার কথা বলিবে। প্রকৃত তাহাই হইল। তারক আমাকে বলিল, আমি ক্রিয়া পাইবার কথা কিম্বা আপনার বিষয় বিন্দুমাত্র না ভাবিয়া গত সোমবারে ঘুমাইতেছি ভোর রাত্রি না নিদ্রা না জাগরণ অবস্থায় দেখিতেছি আপনি আসিয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিতেছেন, 'তোমার সময় খুব নিকট, ক্রিয়া পাইবার চেষ্টা কর। আমি বলিলাম, কথা ঠিক কর, স্বভাব পরিবর্ত্তন কর, দাম্ভিকতা অহঙ্কার ত্যাগ করিবার চেষ্টা কর, তুমি যে সকলের ছোট জ্ঞান করিতে চেষ্টা কর, ক্রিয়া পাইবে।

উপনয়ন বা ক্রিয়া দান

লৌকিক প্রথানুসারে যথাসময়ে আমার বাহ্যিক উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু পরাৎপর ইষ্টদেবের কৃপায় প্রকৃত উপনয়ন হইবার পর আমার ভ্রম সংশোধন হয়।

আমরা যখন পুরুলিয়ায় ছিলাম, ঐ সময়ে আমার শ্যালক বাবু রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পুরুলিয়ায় আগমন করেন। ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ভাদ্র মাসে, আমার স্ত্রী ক্রিয়া পাইবার জন্য অতিশয় অধৈর্য্য হন। ঐ সময়ে আমার শ্যালকের নিকট হইতে বাবার ঠিকানা অবগত হইয়া পরাৎপর ইষ্টদেব মহাশয়কে পত্র লিখেন। তিনিও দয়া করিয়া আমাকে ক্রিয়া দিতে আদেশ করেন। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিবসে বাবার আদেশ মত আমার পত্নীকে ক্রিয়া প্রদান করি। বাবার লীলার কৌশলে তিনি এক অভাবনীয় ভাবে মুগ্ধ হয়েন। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম। স্ত্রী সংসারের কর্ত্রী এবং স্বামীর সংসার বহন করিয়া কত না কষ্ট পান। তাহার ঋণ পরিশোধের উপায় কি? তবে আত্মকার্য্যের দান, ইহার ঋণ শোধ হইতে পারে। তাহাই বাবার কৃপায় হইল, আর "সস্ত্রীক ধর্ম্মমাচরেৎ" ঋষি বাক্যের স্বার্থকতা সম্পাদিত হইল। তাঁহার জন্ম সাথক হইল।

উপদেশ গ্রহণ করিয়া দিন দিন বিধি পূর্ব্বক সাধন করিয়া উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এই দুস্তর সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক হইলে স্ত্রীরূপা তরণী সাহায্যে মায়িক জীব ভব সমুদ্রের কূল পাইতে পারে। আর্য্য ঋষিদিগের মতে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু কাল বশে ঐ স্ত্রীকে কামের চক্ষে দেখিয়া মায়িক জীব কাম-পত্নীরূপে বরণ করিয়া সমুদ্রের তুফানে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়া থাকে। আর দেখ যায় শূন্য ব্রহ্মে মিশ্রিত হইলে পক্ষীরূপ মনুষ্য দুইখানি

ডানাদ্বারা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে চেষ্টা করিলে কিয়ৎ পরিমাণেও উঠিতে পারেন। কিন্তু সংসার বাসনায় মুগ্ধ জীব এক পক্ষহীন একাকী উঠিতে যাওয়া আকাশ কুসুম নহে কি? বরং উঠিতে চেষ্টা করিলে পতন অবশ্যম্ভাবি, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমাদিগের কি ভ্রম ধারণা, স্ত্রীকে ধর্ম্ম পরায়না না করিয়া নানারূপ রং ঢঙ্গে মুগ্ধ হইয়া রহি নাই কি?

পত্নীকে উপদেশ দেওয়া অন্তে সংসারকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলাম এবং যে স্ত্রী সংসারের মূলাধার বলিলে অত্যুক্তি হয় না এবং যিনি স্বামীর সংসার মস্তকে বহন করিয়া কত কষ্ট পাইয়া থাকেন এইরূপ স্ত্রীকে উপদেশ প্রদান করা এবং তাহা হইতে আনন্দ রসের আস্বাদ উপলব্ধি, সংসার কষ্টের কিয়ৎ পরিমাণে উপহার দেওয়া হয় না কি? এখন তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি অনুযায়ী সাধন দ্বারা সকল কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন, সুতরাং এই দয়াপ্রকাশ স্ত্রীর প্রতি সতত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক সাধন দ্বারা আমার পত্নী দিন দিন ফল উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। উপদেশ প্রাপ্ত হইবার তিন চার মাস পরে এক বৎসরের জন্য তাঁহার সাধন বন্ধ হইল। কারণ 'গর্ভাবস্থায় আত্মকার্য্য নিষেধ' ইহা ঋষি বাক্য। তজ্জন্য তিনি বড়ই অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে জামালপুরে আমার স্ত্রী একটী কন্যা সন্তান প্রসব করেন। ইনি একটী কন্যার জন্য পূর্ব্বে অনেক সময়েই দুঃখ প্রকাশ করিতেন দয়াময় তাঁহার সে দুঃখ নিবারণ করিলেন। যখন ঐ কন্যার বয়ঃক্রম তিন মাস মাত্র তখন পরিবারবর্গকে কোলঙ্গায় আনয়ন করিলাম। নব কুমারীর নাম উমাশশী হইয়াছিল। এই সময়ে কোলঙ্গা এবং তন্নিকটবর্ত্তি দুই চারটী ষ্টেশনের বাবু ক্রিয়া পাইবার জন্য পরাৎপর ইষ্টদেব মহাশয়কে লিখেন। বাবা তাঁহার কার্য্য আমাকে দেখাইয়া দিবার জন্য আদেশ প্রদান করায় আমার শ্যালক শ্রীপ্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি ডিস্নার কোম্পানীর তৎকালীন তৃতীয় কেরাণীর কার্য্য করিতেন। কুমার ফেনার পোষ্ট মাষ্টার বাবু গোপীকৃষ্ণ গুপ্ত, চন্দ্রনগরপুরের প্রধান টিকিট বাবু রামলাল

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঝাড়সোগডার পথ পরিদর্শক সাহেবের সময় রক্ষক বাবু সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়ে শ্রীমান কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আমার মাতুল পুত্র কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় গমন করেন তথা হইতে ক্রিয়া লইয়া আইসেন। এই সময়ে কোলঙ্গা ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার মহারাষ্ট্রিয় ব্রাহ্মণ সন্তান, গৌতম গোত্রীয়, নাম শ্রীযুক্ত জগন্নাথ কৃষ্ণজি মহাশয় উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। আমি প্রথমে এ প্রদেশে একাকী ছিলাম, বাবার কৃপায় কয়েকটি ভ্রাতা পাইলাম।

ইহার দুই তিন মাস পরে ডিয়ার কোম্পানীর একজন সহকারী সাহেব, আমাদিগের ম্যানেজারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হ্যারি এ্যাম্বলার, সাহেব, কোম্পানীর কার্য্যের শৈথিল্যতার জন্য জগদেও তেওয়ারিকে পদাঘাত করে, তাহাতেই জগদেও তেওয়ারি চাপরাসির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। এই সংবাদ রাত্রে প্রাপ্ত হইয়া পরদিবস প্রাতে ট্রলি যোগে বড় এ্যাম্বলায় সাহেব এবং আসামীর স্ত্রী এবং আমি কোলঙ্গা হইতে কুমার ফেলায় গমন করি এবং মৃত দেহ দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে ষ্টেশন মাষ্টার বাবু ঘটনার রাত্রেই সর্ব্বত্র তারে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন সুতরাং পুলিশ হাকিম সকলেই আসিবার কথা, আমরা সমস্ত দিবস কুমার ফেলায় অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। অপরাহ্নের এবং রাত্রের ডাক গাড়ীতে ইনেস্পেক্টার, সিংভুমের ডেপুটী কমিশনার আসিলেন। আসামী হ্যারি এ্যাম্বলার সাহেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা টম্প এ্যাম্বলার সাহেব এরূপ জঘন্য চরিত্রের ভ্রাতার সাহায্য করিতে প্রথমতঃ অস্বীকৃত হয়েন। পরে রাগ সম্বরণ করিয়া ভ্রাতাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমাকে ঐ রাত্রেই চক্রধরপুরের রেলওয়ের ডাক্তার সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। আমার কুমার ফেলা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই ডেপুটী কমিশনার সাহেব আমাকে এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ বরেন। কারণ তিনি বলিয়া ছিলেন অন্যান্য সাক্ষীর জবানবন্দি লওয়ার পরে তোমার মতামত জানিবার জন্য আবশ্যক হইতে পারে। এদিকে ডাক গাড়িতে মৃতদেহ চক্রধরপুরে

ডাক্তার এ্যাণ্ডারসন সাহেবের নিকট পাঠান হইল আমাকেও এ্যাম্বলার সাহেব ঐ গাড়িতে পাঠাইলেন সত্য, কিন্তু আমি তাঁহাকে বারম্বার বলিলাম হাকিম সাহেব আমাকে এস্থান পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। "আমার কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিবেন" সাহেব আমার কোন কথা না শুনিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। যথা সময়ে অর্থাৎ রাত্র এক ঘটিকার সময়ে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নিবিড় অন্ধকারে অপরিচিত স্থানে অল্প অল্প বৃষ্টি মাথায় করিয়া ডাক্তার সাহেবের বাসস্থানাভিমুখে গমন করিয়া চিনিয়া লইলাম।

সাহেব তখনও নিদ্রা যান নাই, আমাকে যথাবিহিত সম্ভাষণ করিয়া নিকটে বসাইলেন এবং অসময়ে তাঁহার নিকট আসিবার কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। আমি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে তিনি যথাসাধ্য হ্যারি এ্যাম্বলার সাহেবের সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। আমাকে শয়নের স্থান দেখাইয়া দিয়া তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত দিবস নিয়মিত আহার হয় নাই তৎপরে নানা রূপ শারীরিক পরিশ্রম এবং রাত্র জাগরণে শরীর আচ্ছন্ন সুতরাং শয়ন মাত্রেই নিদ্রার ঘোরে অচেতন হইলাম। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া ডাক্তার সাহেবের কথা মত রেলওয়ের হাঁসপাতাল অভিমুখে রওনা হইলাম। ষ্টেশনে যাইয়া শুনিলাম, আমার একটী তারের সংবাদ—যাহা ডেপুটী কমিশনার পাঠাইয়াছেন, শুনিয়াই আড়ষ্ট। তার দেখিয়া জ্ঞাত হইলাম। হাকিম সাহেব চক্রধরপুরের ষ্টেশনে দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন প্রত্যুষের গাড়ীতে চক্রধরপুর অবতরণ করিয়া এবং আমার সন্ধান না পাইয়া চাইবাসা চলিয়া গিয়াছেন। আমি ইহাতে বড়ই ভীত হইলাম, প্রথম কারণ তাঁহার আদেশ না লইয়া কুমার ফেলা ত্যাগ করা গর্হিত, দ্বিতীয় চক্রধরপুরে তাহার সহিত দেখা না করাও বিশেষ অন্যায়, আমার প্রতি নানা প্রকার সন্দেহের আরোপ করিতে পারেন। যাহা হউক ভাবিতে ভাবিতে রেলওয়ের হাঁসপাতালে উপস্থিত হইলাম এবং যথা সময়ে দুইজন সাহেব

ডাক্তার এবং একজন দেশীয় ডাক্তারের সমক্ষে শবচ্ছেদ করা হইল। আমাকে বড় ডাক্তার সাহেব অনেক প্রকার দেখাইয়া যাহাতে সুবিধা হয় এরূপ করিবেন এরূপ আশা প্রদান করিলেন। ডাক্তার সাহেবের রিপোর্টের অনুলিপি লইয়া মধ্যাহ্নের গাড়িতে কোলঙ্গা রওনা হইয়া এ্যাঙ্গলার সাহেবকে ডাক্তার সাহেবের মতামত প্রকাশ করিলাম। সাহেবের সহিত কথোপকথন অন্তে বাসায় যাইয়া আমার উমাশশী কন্যাটিকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম এবং স্পষ্টই বলিলাম, উহার জীবন প্রদীপ নির্ব্বানোন্মুখ, কারণ ব্যাধিতে তাহার শরীর অতিশয় রুগ্ন দেখিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করিলাম। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার স্ত্রী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নানাপ্রকার চিকিৎসা চলিতে লাগিল সত্য, কিন্তু যখন কাল মুখব্যাদান করেন, তাঁহার কবল হইতে রক্ষা করে কাহার সামর্থ্য। নানা চেষ্টা সত্বেও প্রাণের উমাশশী তাহার গর্ভধারিণীকে এই প্রথম সাংঘাতিক মনকষ্ট দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এরূপ হৃদয় বিদারক ঘটনায় আমার মনকে ততদুর মলিন ভাবাপন্ন করিতে পারে নাই। এই ঘটনার ৭।৮ দিবস পূর্ব্বে কোন সূত্রে জ্ঞাত হইয়াছিলাম যে আমার একটি সন্তান ভবলীলা সাঙ্গ করিবে। অথচ সে সময়ে কোন বালক বালিকার কোনরূপ পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। যাহা হউক যিনি যতদিনের জন্য তাঁহার জিনিষ যাহার নিকট রক্ষা করিতে দিয়াছিলেন, সময়ে তাঁহার জিনিষ লইয়া যাইলেন তাহার আর উপায়ন্তর কি? মায়িক জীব যদি এই মহাবাক্য হৃদয়ে অহরহ পোষণ করিয়া রাখিতে পারেন যে, যাহাকে তিনি আপন ভাবিয়া যত্ন করিয়া থাকেন অথচ তাহা তাঁহার নহে, তাহা বিশ্বরাজের জিনিষ তাহা হইলে এত দারুণ কষ্ট কেন উপলব্ধি করিবে। এই ঘটনার পূর্বে আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রাধাগোবিন্দ বাবাজির পীড়া চিকিৎসা অন্তে পুরুলিয়া হইতে সকলকে জামালপুর রাখিয়া আসি।

জামালপুর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া চক্রধরপুরে হ্যারি এ্যাম্বলার সাহেবের মকর্দ্দমায় সরকারি পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান করি। এই মকর্দ্দমার বিচার অভিপ্রায়ে ডেপুটী কমিশনার সাহেব চক্রধরপুর আগমন করেন। এখানকার ডাকবাঙ্গলায় সাক্ষ্য জবানবন্দী অন্তে এই মকর্দ্দমা দায়রায় প্রদান করেন, সুতরাং নির্দ্ধারিত দিবসে জুডিসিয়াল কমিশনর সাহেবের এজলাসে পুরুলিয়ায় মকর্দ্দমার বিচার হয়, তদ্ধেতু পুরুলিয়া গমন করি। এই মকর্দ্দমায় আমার সাক্ষ্যের উপর আসামীর অনেক নির্ভর ছিল। কারণ মৃত ব্যক্তির প্লীহা কিম্বা হৃদ্‌ব্যাধি ছিল কিনা অনুসন্ধান হয়, প্রকৃতপক্ষে মৃত ব্যক্তির সামান্য কিছুদিনের জন্য একবার প্লীহার চিকিৎসা করা হয় এবং অন্য সময়ে বাত ব্যাধির জন্যও চিকিৎসিত হইয়াছিল, তজ্জন্য তাহার নাম আমার পুস্তকে লিখিত ছিল। সুতরাং আর যাইবে কোথায়, ইহা হইতে প্রমান হইল মৃত ব্যক্তির প্লীহা বড় ছিল এবং বাতের জন্য তাহার অন্তঃকরণ দুর্ব্বল ছিল, তদ্ধেতু সাহেব মারিতে উদ্যত হওয়ায় ভূমিতলে পতিত হয় এবং প্লীহা বিদীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মকর্দ্দমা আসামী সাহেবের পক্ষে হালকা হইল, সুতরাং কেবল দশ টাকা জরিমানা ও একদিনের কারাদণ্ড হইল। কারাদণ্ড—হাকিম সাহেবের নিকট কাষ্ঠাসনে বসিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিয়া, মেয়াদ খাটিয়া হাকিমের সমবিব্যাহারে কাছারি হইতে বহির্গত হইয়া অশ্বশকটে আপন আপন বাস ভবনে গমন করিলেন। আমরাও এযাত্রা রক্ষা পাইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। এই অবিচারের জন্য "অমৃতবাজার" "হিতবাদী" কাগজে এই মকর্দ্দমার বিবরণ প্রকাশ হইল এবং তৎসহ আমার নামে নানাপ্রকার কুৎসা কাগজে প্রকাশ হইল। আমি লোকমুখে শ্রবণ করিয়া এবং স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া রহিলাম। কি দুরদৃষ্ট, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী হইয়াও

সংবাদপত্রে কলঙ্ক কিনিলাম। লোক সমাজে মুখ দেখান কষ্টকর হইয়া উঠিল। আমি সাহেবদিগকে সংবাদপত্রে আমার নামে অনর্থক টিট্‌কারির কথা বলিলাম। তাঁহারা আমার মনস্তুষ্টির জন্য সম্পাদকের নামে নালিশ করিবেন কহিলেন মাত্র, অথচ কিছুই হইল না। সংবাদপত্রের এই মকর্দ্দমার আন্দোলনে ভারত গবর্ণমেণ্টের আসন টলিল এবং বাঁকুড়ার জজ সাহেবের দ্বারা পুনর্ব্বিচার জন্য আয়োজন হইল। পুনরায় পুরুলিয়ার ঐ মকর্দ্দমার বিচার হইবে লোক পরম্পরায় শ্রবণ করিয়া আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য।

মানভূম জেলার মধ্যে যত ইংরাজ নামধারি ব্যক্তি ছিলেন সকলেই উপস্থিত, আমিও সাক্ষীরূপে আদালতে উপস্থিত। আসামী সাহেব একজন প্রধান ইংরেজ উকীল কলিকাতা হইতে আনয়ন করিলেন, এবং গভর্ণমেণ্ট পক্ষে কলিকাতা হইতে ব্যারিষ্টার আসিলেন। এই মকদ্দমায় একজন বাঙ্গালী এবং দুইজন জুরি বসিলেন তিনদিন সমান তোড়ে মকর্দ্দমা চলিল। শেষ দিবসে জুরিগণ আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মত প্রকাশ করিলেন কিন্তু জজ বিচারপতি জুরিগণকে কোন ধারা দেখাইয়া মত প্রকাশ করিতে বলিলেন সুতরাং জুরিগণ হাকিমের মতানুসারেই আসামীকে নির্দ্দোষ মনে করিয়া মত প্রকাশ করিলেন। এবার জজ বাহাদুর আসামীকে পাঁচশত টাকা জরিমানা করিয়া মকর্দ্দমা শেষ করিলেন! এত কাণ্ডের পর মুসিক প্রসব করিল।

সরকারী পক্ষের ব্যারিষ্টার হাস্যমুখে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। আমি লোক গঞ্জনায় কিছুদিবস জ্বালাতন হইলাম। ইহার কিছু দিবস পরে ষ্টিমার কোম্পানীর বড় বাবু বজরঙ্গী বাবু পুরুলিয়ায় টম্ টম্ গাড়ী হইতে পতিত হইয়া একখানি পদ ভগ্ন হয়, এই সময়ে আমি সপরিবারে কোলঙ্গায় ছিলাম। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সপরিবারে পুরুলিয়ায় আগমন করিয়া সিভিল সার্জ্জন ডি, ডি, বসু

মহাশয়ের সহিত বজরঙ্গী বাবুর চিকিৎসায় ব্রতী হইলাম। প্রায় দুই মাস পরে তিনি একরূপ আরোগ্য লাভ করেন সত্য কিন্তু আক্রান্ত-পদ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া কথঞ্চিৎ খঞ্জভাব রহিয়া গেল। যষ্টির সাহায্য ভিন্ন চলিতে পারিতেন না। এই ঘটনার ৭।৮ মাস পরে তাহার স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গকে শোক সাগরে নিক্ষেপ করিয়া ভাগলপুরে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার আমি কার্য্যবশত জামালপুর শ্বশুরালয়ে গমন করি। সেই সময়ে বজরঙ্গী বাবু জামালপুরের অতি সন্নিকটে মুঙ্গাগ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, আমার জামালপুর আগমন সংবাদে আমার পুত্রগণকে, দেখিবার উদ্দেশে জামালপুরে আগমন করিয়া আমাদিগকে পরম আনন্দিত করেন। আমিও দুই তিন দিবস পরে তাহার বাটী গমন করি। জামালপুর হইতে কোলঙ্গায় গমন করিলে সহকারি ম্যানেজার বুল সাহেবের নিকট জ্ঞাত হইলাম তাঁহার মেম কাইলোরিক ব্যাধিতে আপাততঃ বড়ই কষ্ট পাইতেছেন এবং এই ব্যাধিতে প্রায় দশ বার বৎসর হইতে ভুগিতেছেন। ডাক্তারি, হোমিওপ্যাথি, নানাপ্রকার চিকিৎসা করান সত্ত্বেও এই ব্যাধির কিছুমাত্রও উপশম হয় নাই।

এই ব্যাধির ঔষধ এখন আবিষ্কৃত হয় নাই। মেমসাহেব মূত্র ত্যাগকালীন অসহনীয় যন্ত্রনা অনুভব করিয়া থাকেন। আমি ইহা শ্রুত হইয়া সাহেবকে বলি, যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে আমার গুরুদেবের ঔষধি মেমসাহেবকে সেবন করাইতে চাহি। গুরুদেবের ঔষধির ফলাফল ইতিপূর্ব্বেই মেম ও সাহেব পরিজ্ঞাত ছিলেন, কারণ এই মেম সাহেব বহুকালাবধি রক্ত প্রদর ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছিলেন। গুরুদেবের ঔষধিতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। সুতরাং আমি এই মূত্রব্যাধির ঔষধির কথা কহিবা মাত্রই সাহেব ও মেম সম্পূর্ণ

অনুমোদন করিয়া আমাকে কলিকাতায় পরাৎপর ইষ্টদেব মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া হাওড়া হইতে আর্য্যমিশনে উপস্থিত হইয়া বাবার শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া পরম পবিত্র হইলাম এবং মেম্ সাহেবের ব্যাধি বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া আদেশ অপেক্ষায় রহিলাম। তিনি কহিলেন, মহাদেব প্রত্যেক ব্যাধির ঔষধি সৃষ্টি করিয়াছেন তবে সকলের জানা নাই। যাহা হউক ডাক্তারি-মতে মেম্সাহেবের পীড়ার ঔষধি নাই সত্য; কিন্তু কহিলেন যে, আর্য্য ঋষিগণ ইহার ঔষধি অবগত ছিলেন এবং এখনও অনেকে তাহা জ্ঞাত আছেন। যাহা হউক দুই প্রকার ঔষধি লইয়া যান, ইহা বিধিপূর্ব্বক সেবন করিলে দুই মাসের মধ্যেই এই পুরাতন পীড়া আরোগ্য হইবে, কিন্তু মেমসাহেব যেন এই ঔষধি সেবন কালীন মদ্য, মৎস্য এবং মাংস ব্যবহার না করেন। আমি ঔষধি লইয়া পরদিবস কোলঙ্গায় রওনা হইলাম। যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া মেম্সাহেবকে সকল বিষয় জ্ঞাত করাইলাম। মেমসাহেব সুরাপান ত্যাগ করিয়া তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঔষধি সেবন করিলেন কিন্তু কিছুমাত্রও উপকার প্রদর্শিত না হওয়ায় বাবার শ্রীচরণে সকল বিষয় নিবেদন করিলাম। তিনি লিখিলেন, যদি মেমসাহেব মৎস্য মাংস বর্জ্জন করিতে পারেন, তবে অল্প দিবসের মধ্যেই অত্যাশ্চর্য্য ফল দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। বাবার এই পত্রের মর্ম্ম মেমসাহেবকে জ্ঞাত করাইলে মেমসাহেব মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন এবং ঐ নিয়ম অবলম্বন করিয়া ঔষধি সেবন করিতে লাগিলেন। কেবল তিন সন্ধ্যা মৎস্য মাংস বর্জ্জন করিয়াছেন। বহুকাল পরে স্বাভাবিক যন্ত্রণাশূন্য মূত্র ত্যাগ করায় সকলেই আনন্দে ভাসিতে থাকেন। যাহা হউক তদবধি তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। সাহেবেরাও চিকিৎসার ভূয়োভূয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আরও কয়েকটী ব্যাধি বাবার ঔষধিতে আরোগ্য হওয়ায় ঔষধির গুণ দেখিয়া তাহা দ্বারা

চিকিৎসা করিতে মনে বড়ই আগ্রহ হইল। ইহা ভিন্ন ইহাও মনে আন্দোলিত হইতে লাগিল যে বাবার প্রদত্ত জিনিষ পাইয়া আনন্দে মাতিতেছি, কিন্তু পরাধীন অবস্থায় এই জঙ্গলে থাকিয়াও আত্মকর্ম্মের নানারূপ বিঘ্ন হইতেছে। অতএব বাবার ঔষধি লইয়া প্রচার করা বিহিত, ইহাতে মনের উন্নতি এবং বাবাতে সর্ব্বপ্রকারে মতি দৃঢ় হইবে। স্বাধীন ব্যবসা শিক্ষা করিয়া চিরকালই কি পাহাড় জঙ্গলে পরাধীন ভাবে থাকিতে হইবে? কোনস্থানে স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিব, এইটী মনে স্থির করিয়া কয়েক দিবসের বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাবার শ্রীচরণ দর্শন করি এবং প্রস্তাবিত বিষয় উল্লেখ করি। বাবা কহিলেন,—"আপনার প্রায় ১২০৲ টাকা মাসিক আয় এবং কয়েকটি সন্তান হইয়াছে হঠাৎ এরূপ চাকরি ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসা করা যুক্তিযুক্ত নহে"। আমি বলিলাম,—বালকগণ আপন আপন অদৃষ্ট সূত্রে ধরিয়া সংসারে চলিবে, আমার উপর নির্ভর করিয়া যখন তাহাদের কর্ম্মফল ভোগ হইবার নহে, তখন কিজন্য তাহাদিগের নিমিত্ত আমার নিজের সুখ নষ্ট করিব? যাহা হউক যখন আমি পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলাম, মাসে ৩০৲ টাকা হইলেই সুখে কষ্টে সংসার চলিয়া যাইবে তখন তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। সুতরাং আমি যথাসময়ে কোলঙ্গায় প্রত্যাগমন করিয়া অর্দ্ধ বেতনে ৩ মাসের বিদায় প্রাপ্ত হইয়া আমার শ্বশুর মহাশয়ের একজন মুঙ্গেরস্থ বন্ধুর পুত্রকে আমার প্রতিনিধি রাখিয়া জামালপুরে আসিলাম এবং জামালপুরে ইহার ৩ বৎসর পূর্ব্বে কেশবপুর পাড়ায় আমার শ্বশুর মহাশয়ের বাটীর সন্নিকটে একটী মধ্যম প্রকারের বাটী খরিদ করিয়া নূতন বাটীতে ঔষধালয় স্থাপন করিবার আয়োজন করিলাম। বৈদ্যনাথ গমন করিয়া বাবার পরামর্শ মত আপাততঃ ৩৬৲ টাকা মূল্যের দেশীয় ঔষধি কলিকাতা হইতে আনয়ন করিলাম এবং ১০০৲ টাকা মূল্যের ইংরাজী ঔষধ আনাইয়া টেবিল চেয়ার আলমারি বন্দোবস্ত করিয়া ঔষধালয় খুলিলাম। বাবা পূর্ব্বে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে মুঙ্গেরের ডেপুটী

ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেকটার বাবু আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ের যেন আমি পরামর্শ গ্রহণ করি। এবং প্রতিদিন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে এবং স্থানে মুঙ্গের গমন করিলে মুঙ্গেরেও চিকিৎসা কার্য্য চলিতে পারে। আদেশ অনুসারে আমি তাহাই করিলাম এবং প্রথম প্রথম মুঙ্গেরের ভ্রাতৃবৃন্দ চিকিৎসার্থ আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মুঙ্গেরে ৪।৫ জন গুরুভাই মাত্র ছিলেন এবং মুঙ্গের দুর্গের মধ্যস্থ ডেপুটী আশুবাবুর বাটীতে একটি গীতাসভা সংস্থাপিত হইল। প্রতি রবিবারে আমরা কয়েকটী ভ্রাতা সমবেত হইয়া গীতাসভার কার্য্য চালাইতে লাগিলাম। ঐ সময়ে পরাৎপর বাবা আশুবাবুর যত্নে এবং আমাদিগের মঙ্গলের জন্য মুঙ্গের আগমন করেন। বাবা প্রায় একমাস আশুবাবুর বাস ভবনে অবস্থিতি করিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে গীতার ব্যাখ্যা এবং ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া আমাদিগের দুর্ব্বল মনকে বল প্রদান করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে ডেপুটী বাবু, বাবু ভূপালচন্দ্র মজুমদার বি, এল, বাবু সারদা প্রসাদ বিশ্বাস, বাবু সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায় রোডসেস হেড ক্লার্ক, বাবু হরিপদ ঘোষ কালেকটরির মোহরার, বাবু শ্রীবিলাস ভট্টাচার্য্য, বাবার কৃপায় জামালপুরের ভলেণ্টিয়ার আফিসের উচ্চ কেরানী হন, এবং বাবু ষষ্ঠিধর সান্যাল অডিট অফিসের একজন কেরানি এই সকল ভ্রাতাগণ মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহা ভিন্ন জামালপুর হইতে বাবু বসন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় রেল আফিসের একজন প্রধান কেরানি, বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অডিট অফিসের কেরানি, আরও কয়েকটী ভ্রাতা প্রতি রবিবারে গীতাসভায় সমবেত হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে সারদাবাবু ৺গীতার ব্যাখ্যা করিতেন। ক্রমে বাবা ২।১ বার মুঙ্গের আগমন করায়, মুঙ্গেরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল বাবু তারা-ভূষণ বন্দোপাধ্যায় বি, এল, বাবু উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল (এই দুইজন ব্যক্তি এককালে বাবার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন) পরিশেষে নিজ দোষ অনুধাবন করিয়া বাবার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ

করিয়াছিলেন। এই সময়ে কলেক্টরির হিন্দুস্থানি কায়স্থ বংশীয় মহাফেজ বাবু ক্রিয়া পান।

মুঙ্গের সহরে অনেক বাঙ্গালীর বাস, তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি প্রাতের গাড়ীতে জামালপুরের আফিস সমূহে কার্য্য করিতে গমন করিতেন, অপরাহ্নে প্রত্যাগমন করিতেন এবং অবশিষ্ট মুঙ্গেরস্থ বাঙ্গালী বাবুগণ মুঙ্গেরের আদালতে কার্য্য করিতেন। মুঙ্গের হইতে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ বাঙ্গালী বাবু জামালপুরে রেল আফিসে কার্য্য করিতে যাইতেন। মুঙ্গেরের অধিকাংশ বাঙ্গালী বাবুগণ বাবার পথাবলম্বিগণকে নানাপ্রকার গালি বর্ষণ করিতেন।

এইটী পুরাতন প্রথা—যখনই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উত্থান হয় এবং ধর্ম্ম-যাজক প্রকাশ হইয়া সনাতন ধর্ম্মের প্রচার করিতে থাকেন, তখনই ঐ ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়া সকাম ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন। বহু পূর্ব্বকাল হইতে ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে, এইরূপ না হইলে এই ধর্ম্মের এতাদৃশ আদর হইত না। মহামুনি কপিল হইতে ৺চৈতন্য প্রভু পর্য্যন্ত ইহার শত শত দৃষ্টান্তের অভাব নাই, দুঃখের বিষয় ৺চৈতন্য প্রভুর ধর্ম্মকে মায়িক জীব সকাম ধর্ম্ম বলিয়া লোক সমাজে প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রণিধান করিয়া দেখিলে আমাদিগের সকল সন্দেহ দূরীভূত হয়, সে দিকে লক্ষ্য নাই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ধামে এই সনাতন নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার করেন তখন কত শত অসুর ভাবাপন্ন লোক তাঁহার বিরুদ্ধ আচরণ করেন। ঐ সময়ে বৃন্দাবনে বৈদিক এবং তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচারিত ছিল। ত্রেতাযুগে লঙ্কাপুরে সকাম ধর্ম্ম বড়ই প্রবল ছিল। শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার করেন। সেইজন্যই বলি যে মুঙ্গেরের বাবুগণকে ধর্ম্মবিদ্বেষী বলিয়া নিন্দা করা উচিৎ নহে, কারণ ইহা চিরন্তন প্রথা। এই ধর্ম্ম বিবাদ চিরকালই সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু মূলে যে একই জিনিষ, আমাদিগের ক্ষুদ্র বিচারে আইসে না। মুঙ্গেরের কলেজ স্কুলের ৩য় শিক্ষক বাবু অক্ষয়চন্দ্র

পাল বি, এ, এবং তাঁহার আত্মীয় ভ্রাতা বাবু শিবনাথ ঘোষ ভ্রাতাদ্বয়ও গীতা সভায় যোগ দিতে লাগিলেন।

আমার চিকিৎসা ব্যবসা জামালপুর এবং মুঙ্গেরে দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। প্রতি মাসে সর্ব্বসমেত ২২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় হইতে লাগিল। জামালপুর, মুঙ্গের, সুলতানগঞ্জ, ধারারা এবং বর্হি পর্য্যন্ত রোগী দেখিতে যাইতে হইত। এই আয় বৃদ্ধি দর্শনে বাবার নিকট বলিয়া রাখিলাম, টাকা দিয়া আর যেন ভুলান না হয় অর্থাৎ আয় হ্রাস হইলে সময় পাওয়া যায় এবং তাঁহার কার্য্যে শ্রদ্ধা আর হয় না। নচেৎ টাকার প্রলোভনে গুরু ভগবানকে ভুলিয়া যাইতে হয়, ইহা সংসারে বিরল নহে। আর এই সময় অভাব বশতঃ পরাধীন চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় শান্তির উপাসনা করিব, তাহা না হইয়া আবার টাকার প্রলোভনে পড়িলে এবং সময় হারাইলে কি হইল, ইহাপেক্ষা চাকরি ভাল ছিল এইরূপ মনে মনে অনুতাপ হইতে লাগিল। যাহা হউক ঐ অনুতাপ বাবা যেন স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন, তাহার কয়েকমাস পরে কার্য্য হ্রাস হইল। কিন্তু প্রথম প্রথম মুঙ্গের যাওয়ায় এবং তথাকার অধিবাসীদিগের সহিত পরিচিত হওয়ায় রোগী জুটিতে লাগিল। এদিকে জামালপুরের ভ্রাতাগণও আমার চিকিৎসা ব্যবসায়ে উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বিসূচিকা ব্যাধি প্রকোপের সময়ে বাবার সঞ্জীবনী ঔষধিতে অনেক জীবের জীবন রক্ষা হইল। বড় বড় ডাক্তারগণের পরিত্যক্ত বিসূচিকা ব্যাধিগ্রস্থ রোগীকে এই ঔষধির তিন মাত্রা প্রয়োগ করায়, জীবনে হতাশ রোগী আরোগ্য হইতে লাগিল। সুতরাং ঔষধির গুণে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই ডাকিতে লাগিল এবং তাঁহার মহিমা প্রকাশ হইতে লাগিল। কিন্তু মুঙ্গের এবং জামালপুরের এ্যাসিষ্টেন্ট সার্জ্জন ডাক্তার মহাশয়েরা এই ঔষধির বিষয় অবগত হইয়া তাহার আদর না করিয়া বরং অধিকতর শত্রুতাচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের আশা ফলবতী হইল না। আমার চিকিৎসা ব্যবসা নষ্ট করিবার

জন্য সরকারী হাসপাতালের এ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন বাবু লোক সমাজে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, বিসূচিকার ঔষধি বিষ ভিন্ন কিছুই নহে, তজ্জন্য এই ঔষধি প্রয়োগ করিয়া মিছরির সরবৎ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ইত্যাদি অনেক প্রকারে আমাকে অপদস্থ করিতে বিশেষরূপে চেষ্টিত হন। কিন্তু সত্যের জয় চিরকাল হইয়া থাকে। তাহাদের সকল উদ্যম জলবুদবুদের ন্যায় নষ্ট হইয়া বরং দিন দিন দেশীয় ঔষধির প্রচার বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এই সময়ে জামালপুরে আমার বসতবাটী উত্তমরূপে মেরামত করান হয় এবং ঐ বাটীতে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলাম। বৈঠকখানার ঘরে ঔষধালয় ছিল। অফিস টেবিলের উপরে পরাৎপর ইষ্টদেব এবং পরম গুরুদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতিদিন পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগ্যলক্ষ্মী কন্যার সহিত পরাৎপর বাবার উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সংবাদ প্রথমে যখন আশুবাবুর বাটীতে প্রচার হয় তখন অনেকেই বিরক্ত হন। অল্পদিবস পরে সকলের মনোমালিন্য তিরোহিত হয় এবং আপন আপন ভ্রমে পতিত হইয়া বাবার কার্য্যে যে দোষারোপ করেন তাহা উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হন। যিনি স্থির বুদ্ধিমান, অকলঙ্ক স্বভাব বিশিষ্ট, যিনি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে আমরা অতি অল্প বুদ্ধি বিশিষ্ট মায়িক জীব। তিনি যাহা করেন তাহাতে অবশ্যই মঙ্গল বস্তু নিহিত রহিয়াছে। আমরা বিকৃত মস্তিষ্ক বিশিষ্ট হইয়া তাঁহার কার্য্যে দোষারোপ করিতে যাওয়া পাগলামি নহে কি? যখন তাঁহার ভাবাপন্ন হইব, তখন তাঁহার কার্য্যের বিরুদ্ধে বরং কথা বলিতে সাহস করা যায়। ইহা পাগলের প্রলাপ নহে কি?

এই বিবাহের ৬ মাস পূর্ব্বে আমি একবার গুরু দর্শনে বৈদ্যনাথ গমন করি। তৎকালিন পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণী অনূঢ়া ছিলেন, তিনি তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর সহিত বৈদ্যনাথ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই

সময়ে মাতাঠাকুরাণীর গাম্ভীর্য্য মাখা মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই। এত অল্পবয়স্কা কন্যা যে এরূপ ভাবাপন্ন হইতে পারেন ইহা আমার প্রথম দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই বালিকার যে এরূপ ভাব হইতে পারে ইহা ধারণাই ছিল না।

এই সময়ে আমার সহধর্ম্মিনী বাবার নিকট হইতে দ্বিতীয় ক্রিয়ার উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। বাবা এই সময়ে আমার স্ত্রীকে বারম্বার আদেশ করেন যে,—"বৌমা বৈদ্যনাথ আসিয়াছেন, আমার নিকট গোবিন্দ বালককে রাখিয়া শিব দর্শন করিয়া আসুন।" তিনি মুক্তকণ্ঠে ইষ্টদেব মহাশয়কে বলেন,—জীবন্ত শিব রাখিয়া মৃত শিবের দর্শন জন্য আসি নাই। তিনি কোনক্রমে শিব দর্শন করিতে যাইলেন না।

বিবাহের কয়েক মাস পরে বাবা সস্ত্রীক মুঙ্গের আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐকালিন আমি জামালপুরে থাকিয়া প্রতিদিন একবার করিয়া মুঙ্গের আসিতাম। বাবার যাহাতে মুঙ্গের আগমন হয় তজ্জন্য সকলেই চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ঐ পূজার সময়ে জামালপুরেই ছিলাম, পূজার সময়ে মুঙ্গের জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী আমাদিগের আশুবাবু পূজার দিবস দুই প্রহরের গাড়িতে ষ্টেশন হইতে কেশবপুর আমার ঔষধালয়ে পদব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা কহিলাম,—সকল হাকিমগণ আপনার উপর জেলার ভার প্রদান করিয়া বিদায় লইয়াছেন, আপনার জেলা ছাড়িয়া এখানে আগমন করা উচিত হয় নাই। তিনি কহিলেন,—দাদা! আপনারা সকল ভ্রাতা একত্র হইয়া আনন্দ করিবেন, আমি একাকী কি করিয়া নিরানন্দে থাকিব. এইজন্য চলিয়া আসিয়াছি। যোগ-সঙ্গীতের গানে কয়েকঘণ্টা অতিবাহিত করিলাম। সন্ধ্যার গাড়িতে আশুবাবু মুঙ্গের প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার ২।১ মাস পরে মাননীয় আশুবাবু নোয়াখালি বদলী হইয়া মুঙ্গের ত্যাগ করেন। তাঁহার মুঙ্গের ত্যাগ করায় আমাদিগের গীতাসভায় গোলযোগ

ঘটিল। তাহার পরে মুঙ্গেরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে ৺গীতাসভা স্থাপিত হয়, তিনি সকল ভার গ্রহণ করিয়া সভায় সেক্রেটারী পদে বরিত হন। সুতরাং বলাবাহুল্য প্রতি রবিবারে জামালপুরের এবং মুঙ্গেরের ক্রিয়ান্বিতগণ তথায় সমবেত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে তারাভূষণ বাবুর বাটীতে বাবা পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণীসহ মুঙ্গের আগমন করেন।

বাবার মুঙ্গের আগমনের পরেই মুঙ্গেরের একজন খ্যাতনামা ধনী মহাজন বাবু গঙ্গাপ্রসাদের একটি পুত্রের কাশীর পীড়া হয়, মুঙ্গেরের সকল ডাক্তার কবিরাজ এবং হাকিমগণ ঐ রোগীকে চিকিৎসা করিয়া কিছুই ফলপ্রদান করিতে অপারক হয়েন। আমাকে ঐ রোগী দেখাইবার জন্য উক্ত বাবু তাঁহার জুড়ি পাঠাইয়া দেন। আবার এই সময়ে আমি বাবার সিদ্ধাশ্রম সংযুক্ত ঔষধালয়ে দাতব্য ঔষধি ব্যবস্থা করিতে প্রতিদিন প্রাতে জামালপুর হইতে বড়বাজারের, সিদ্ধাশ্রম বাটীতে আগমন করিতাম। বাবার আদেশ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ধনী মহাজনের পুত্রকে দেখিয়া ঔষধি প্রদান করা হয় এবং বাবার কৃপার বলে বাবার ঔষধিতে একরাত্রের মধ্যে অভাবনীয় ভাবে উপকার হওয়ায় তখন হইতে প্রতিদিন তাঁহার বাটীতে যাইতে আরম্ভ করিলাম এবং যে কোন ব্যাধি হইলে আমাকেই আহ্বান করিয়া চিকিৎসা করাইতেন। তাহাতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাদিগের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণ আমাকে ডাকাইয়া চিকিৎসা করাইতেন এমন কি আমাকে গঙ্গাপ্রসাদ বাবু মুঙ্গেরে না পাইলে জামালপুরে জুড়ি পাঠাইয়া লইয়া যাইতেন।

আমরা যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পবিত্র হইলাম বাবা প্রতিদিন মুঙ্গেরে তারাভূষণ বাবুর বাটীর প্রাঙ্গনে গীতা ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে মোহিত করিতে, লাগিলেন। একদিন বিশেষ কৃপা করিয়া আমাকে বলেন,—আমি সপরিবারে তোমার জামালপুরের বাটীতে যাইব। তাহাতে আমার মনে এই

ধারণা হইল আমার পত্নীকে দয়া করিয়া চরণ দর্শন দিবার জন্য বাবার এই চাতুরি। এত দয়া না থাকিলে তাঁহাকে দয়াময় বলিবে কেন? যাহা হউক আমি গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর জুড়িগাড়ি আনাইয়া মা বাবাকে লইয়া জামালপুরে চলিলাম।

বাবার সমভিব্যাহারে মাননীয় চণ্ডিচরণ ঘোষাল এবং তারাভূষণ বাবুও চলিলেন। জামালপুরে আমাদিগের ঔষধালয় বাটীতে অবতরণ করিলেন; আমার স্ত্রী এই বাটীতেই ছিলেন, সুতরাং তিনি মাতাঠাকুরাণীকে সম্মান পূর্ব্বক গৃহে লইলেন। বাবা ডাক্তারখানায় বসিয়া জামালপুরের ক্রিয়ান্বিতগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"আমি আর কোথাও যাইব না, যাঁহাদিগের ইচ্ছা হইবে তাঁহারা এই স্থানেই আসিয়া দেখা করিয়া যাউন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ মনে ব্যথা পাইলেন। আমি বরং বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলিলাম,—এই স্থানে অনেক ক্রিয়ান্বিতা মাতাগণ আছেন যাঁহারা পদব্রজে দিবসে এরূপ স্থানে আসিতে লজ্জিতা হন, অথচ আপনার শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষিনী হইয়া আপন আপন ভবনে অধৈর্য্যা হইতেছেন; তাঁহাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের দর্শন দিউন। কিন্তু আমার কথার উত্তরে পুরুষ ব্যাঘ্র স্বরূপ মহাপুরুষ গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"পিপাসাতুর ব্যক্তি কুয়ার নিকট গমন করেন, কিন্তু কূপ কি পিপাসাতুর ব্যক্তির নিকট যাইয়া থাকে?" তিনি ভাবময় পুরুষ, কি ভাবে অপর স্থানে গমন করিলেন না। হয়তো শিষ্যবর্গের ভক্তির পরীক্ষার জন্য এই লীলা করিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

যাহা হউক অনেকেই বাবার সকাশে আগমন করিয়া হৃদয় মন সার্থক করিলেন। বাবা ও মাতাঠাকুরাণী সেবা অন্তে মুঙ্গের প্রত্যাগমন করিলেন, যাইবার সময়ে আমাকেও সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। এই সময়ে বাবা মুঙ্গেরের সিদ্ধাশ্রম বাটীতে উপস্থিত হইয়া প্রতিষ্ঠা করেন এবং চণ্ডিবাবু দিবারাত্র উক্ত বাটীতে অবস্থিতি করিতে আদিষ্ট হয়েন। আমি প্রতিদিন

জামালপুর হইতে প্রাতের গাড়িতে পুরব সরাই ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পাল্কি করিয়া আশ্রম বাটীতে উপস্থিত হইতাম, ২ ঘণ্টা কাল তথায় থাকিয়া রোগীদিগকে ঔষধি ব্যবস্থা করিয়া দশ ঘটিকার গাড়িতে জামালপুর প্রত্যাগমন করিতাম। সিদ্ধাশ্রম ঔষধালয়ে মাননীয় চণ্ডিবাবু আমার সহকারীরূপে কার্য্য করিতে লাগিলেন। যখন আমি জামালপুর থাকিতাম আমার অনুপস্থিতিতে তিনি রোগীদিগের ঔষধি প্রদান করিতেন।

বাবার সিদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার পর তারাভূষণ বাবুর বাটী হইতে ৺গীতাসভা এই সিদ্ধাশ্রম বাটীতেই প্রতিষ্ঠিত হইল এবং প্রতি রবিবারে অপরাহ্ণ চার ঘটিকা হইতে ছয় ঘটীকা পর্য্যন্ত ৺গীতা ব্যাখ্যা করিবার ভার এই অর্ব্বাচীনের উপর বাবা প্রদান করেন। এতাদৃশ দুরূহ কার্য্যের ভার আমার ন্যায় মূর্খের উপর কেন দিয়াছিলেন, তিনিই বলিতে পারেন। প্রতিষ্ঠার প্রথম রবিবারে বাবা আচার্য্যরূপে ৺গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া কি ক্রিয়ান্বিত কি অক্রিয়ান্বিত সকলেই মুগ্ধ হয়েন। উপরে যে ঘরে সভা হইত, লোকে লোকারণ্য, এমন কি বারান্দায় লোকের জনতায় অস্থির হইতে হইত। প্রতি রবিবারেই এইরূপ জনতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

বাবার মুঙ্গের অবস্থিতিকালীন আমি প্রাতে মুঙ্গের যাইয়া সিদ্ধাশ্রমের ঔষধালয়ের কার্য্য সমাপন অন্তে পরাৎপর বাবার চরণ দর্শন অন্তে দশ ঘটিকার গাড়ীতে জামালপুর গমন করিতাম এবং আহারান্ত ১ টার গাড়ীতে পুনরায় মুঙ্গের আসিয়া তারাভূষণ বাবুর বাটীতে সকল ভ্রাতাগণের সহিত সমবেত হইতাম ঐ সময়ে মুঙ্গেরের স্কুল কাছারির কার্য্য প্রাতঃকালে হইত সুতরাং সকল ভ্রাতাই আহার অন্তে বাবার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেন। অপরাহ্ণ হইতে রাত্র ৮।৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত বাবার শ্রীমুখ নিসৃত সুধা স্বরূপ ধর্ম্ম উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দে বিভোর হইতেন। ঐ সময়ের কথা হৃদপুটে উদিত হইলে সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে হয়, সে এক পরমানন্দের বাক্য-সুধা।

বাবার আদেশে সিদ্ধাশ্রমের নিয়মাবলী লিখিত হইল। এই ধর্ম্মসভায় জামালপুর মুঙ্গের এবং ভাগলপুরের ক্রিয়ান্বিতগণ সকলের সাধ্যমত এককালীন টাকা দান করেন এবং প্রতি মাসে সকলের আয় অনুসারে চাঁদা দেওয়া নির্ণীত হয়। পুরাৎপর বাবাও এককালীন ১০৲ টাকা প্রদান করেন। এই দানের টাকাতে সভার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র খরিদ করা হয়। মাসে মাসে যে চাঁদা সংগ্রহ হইবে তাহাদ্বারা সিদ্ধাশ্রম বাটী ভাড়া, দেশীয় ঔষধির মূল্যের কিয়দংশ এবং আমার জামালপুর হইতে মুঙ্গের গমনাগমনের রেলওয়ের টিকিটের মূল্য দেওয়া সাব্যস্ত হয়। সকল সংকুলান হইয়া অবশিষ্ট টাকা সিদ্ধাশ্রম তহবিলে মজুত থাকিবে, লিপিবদ্ধ হয়। এবং সময়ে ঐ টাকা ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়িত হইবে স্থিরীকৃত হয়। অধমাধমকে উপাচার্য্যের কার্য্যে বাবা বরণ করেন এবং কলেকটরির রোডসেস্ হেড ক্লার্ক মাননীয় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার সহকারীরূপে বরণ করেন। মাননীয় তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার কার্য্যাধ্যক্ষরূপে মনোনীত হয়েন।

এই সময়ে বাবা মুঙ্গেরে একমাস কৃপা করিয়া অবস্থিতি করিয়া ৺বৈদ্যনাথ প্রত্যাগমন করেন। এদিকে জামালপুর হইতে অডিট্ আফিস কলিকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ায় জামালপুর প্রায় বাঙ্গালী ভদ্রলোকশূন্য হইয়া পড়িল, সেইজন্য আমার চিকিৎসা কার্য্যেরও ব্যাঘাত হইল। ওদিকে মুঙ্গেরের গঙ্গাপ্রসাদ প্রধান ধনী, তিনি বারম্বার মুঙ্গের যাইতে অনুরোধ করায় এবং মুঙ্গেরের ভ্রাতাগণের ভূয়োভূয় আকিঞ্চনে বাবার আদেশ মত সপরিবারে ঔষধি ও জিনিষপত্রসহ মুঙ্গেরের সিদ্ধাশ্রম বাটীতে গমন করিয়া ঔষধালয় খুলিলাম। সিদ্ধাশ্রম ঔষধালয়ের সহিত আমার ঔষধালয় একত্রিত হইল। মাননীয় চণ্ডি দাদা বাবার আদেশ অনুসারে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। তদবধি নিয়মমত গীতা সভা হইতে লাগিল।

মুঙ্গেরের দুর্গোৎসব খুব জাঁকজমক বিশিষ্ট। প্রায় ৩০।৩৫ খানি প্রতিমা অতি সমারোহে বাজী বাজনা করিয়া বিজয়া হইয়া থাকে তাহা দেখিবার

জিনিষ। যেস্থানে রামলীলা হয় ঐ ময়দানে সকল প্রতিমা সমবেত হয়, প্রায় এক লক্ষ লোকের সমাগম হয়। একবার পূজার সময়ে বাবা মহা অষ্টমীর উৎসব পূর্ণিয়ায় সাতকড়ি বাবুর বাটীতে সম্পাদন করেন, বাবা ও সাতকড়ি বাবু মুঙ্গের ও জামালপুরের ক্রিয়ান্বিতগণকে ঐ উৎসবে একত্রিত হইতে নিমন্ত্রণ করেন। সাতকড়ি বাবুর জ্যেষ্ঠতাত পুত্র, তারাভূষণ বাবু, সন্তোষ বাবু, ভূপালবাবু উকিল, ভাগলপুরের বাবুদিগের ভাগ্নেয় শ্রীরমেশচন্দ্র সিং, বেলেলিরাজ ষ্টেটের অডিটার বাবু উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং আমি ডাকগাড়িতে পূর্ণিয়া রওনা হইলাম। সকল ভ্রাতায় একত্রিত হইয়া যাইতেছি—কি আনন্দ।

যথা সময়ে সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনে যাইয়া দেখিলাম, পরাৎপর বাবা, পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণী, সন্ধ্যার গাড়িতে আরও কয়েকটী ভ্রাতা কলিকাতা হইতে আসিয়া আমাদিগের জন্য সাহেবগঞ্জে অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বাবা ও মাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণ দর্শন এবং অন্যান্য ভক্ত ভ্রাতাগণকে সন্দর্শন করিয়া আনন্দোচ্ছাসে হৃদয় উথলিয়া উঠিল। অল্পক্ষণ পরে মতিহার ষ্টেশন অভিমুখে গাড়ী ছাড়িল। পরাৎপর বাবা ও মাতাঠাকুরাণী প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন; আমরা সকল ভ্রাতা মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে আনন্দ করিতে করিতে সক্রিগলি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তথায় অবতরণ করিয়া বাষ্পীয় পোতে গঙ্গা পার হইয়া মতিহারি ষ্টেশনের অপর পারে পৌঁছিলাম। প্রায় ২ ঘণ্টা সময় ষ্টীমারে থাকিতে হইয়াছিল।

মতিহারী ষ্টেশনে আমরা প্রায় ৮ ঘটিকা প্রাতে উপস্থিত হইলাম। তথায় যৎকিঞ্চিৎ জলপান অন্তে উত্তরবঙ্গ রেলওয়ের মধ্যম শ্রেণীর গাড়িতে উঠিয়া আনন্দ করিতে করিতে যাইতে লাগিলাম। মধ্যম শ্রেণীর সমস্ত কামরা আমরা অধিকার করিয়াছি। বাবার গুণানুবাদ করিতে করিতে চলিলাম, সে এক বিমল আনন্দ। সংসার ভুলিয়াছিলাম, মুখে আনন্দ, মনে আনন্দ, প্রতিপদ বিক্ষেপে আনন্দ, সকলের আনন্দ মিলিয়া পরমানন্দ পুরুষের হৃদয়তন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যে স্থানে যাইতেছি সেও এক

আনন্দপুরী। এ সময়ে সংসারের মোহ মায়া যেন সকলেই ভুলিয়াছেন। আর যে কখন নিরানন্দ আসিবে ইহা যেন কাহারও মনে আসিতেছে না! মনে এরূপ ধারণা হইতে লাগিল যেন পূর্ব্বকালের কোন মহামুনি সশিষ্যে কোথায় গমন করিতেছেন।

যখন আমাদিগের গাড়ী কাটিহার ষ্টেশনে উপস্থিত হইল তখন শুনিলাম, আমাদিগকে এই ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পূর্ণিয়ার লাইনের গাড়ীতে উঠিতে হইবে। আমরা তদ্রূপ করিতেছি এমত সময়ে প্লাটফরমে আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। শুনিলাম আমাদিগের একজন গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মিত্র এই কাটিহার মহকুমার মুন্সেফ, পূর্ব্ব সংবাদে বাবার শ্রীচরণ দর্শনার্থ ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ হইয়া এবং তথায় আরও দুইটী ক্রিয়ান্বিত উপস্থিত ছিলেন। আনন্দে আনন্দে যেন আমরা কিম্ভূত কিমাকার হইতে লাগিলাম। আমরা মায়িক জীব সদা নিরানন্দে ভাসিয়া থাকি, এক আনন্দময়ের আশ্রমে চলিতেছি কিনা, সেইজন্য তাঁহার সর্ব্বদিকে আনন্দ। তাহা প্রদান করিয়া আমাদিগের শোক জর্জ্জরিত মনকে যেন আনন্দে ভাসাইয়া চলিয়াছেন। সে এক বিচিত্র কথা।

বাবার আদেশ মত পূজার কয়েকদিবস অক্ষয় বাবু পূর্ণিয়া যাইবার জন্য স্বীকৃত হইলেন। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িল, আমরা আন্দাজ বেলা ১০॥ ঘটিকার সময়ে পূর্ণিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। বাবা ও মাতাঠাকুরাণীর জন্য সাতকড়ি দাদা পাল্কি রাখিয়াছিলেন, তদ্ধেতু তাঁহারা অবতরণ করিয়াই ভাটামহল্লায় সাতকড়ি বাবুর বাটী রওনা হইলেন। আমরা অনেকগুলি ভ্রাতা আসিয়াছি তাহার উপযোগী ঘোড়ার গাড়ি, ঝাম্পনি এবং আমাদিগের জিনিষ পত্র লইয়া যাইবার জন্য ২।৩ খানি গরুর গাড়ী রাখিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদিগেরও রওনা হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। ভাটা, পূর্ণিয়া ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশের অধিক হইবে। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই নির্দ্ধারিত স্থানে পৌঁছিলাম। রাস্তার দুইধারে ভীষণ জঙ্গল এবং খানা ডোবা কিরূপ স্যাঁৎ-

সেঁতে জঙ্গল পূর্ণ। নদীর অবস্থা অতি শোচনীয়, পূর্ণিয়াকে যে এরূপ দেখিব পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারি নাই।

সাতকড়ি বাবুর বাটি একতলা পাকা চক, বাহিরে একখানি সুসজ্জিত বাঙ্গালা, ঐ বাঙ্গালায় আমাদিগের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। পরাৎপর বাবা অধিকাংশ সময় এই বাঙ্গলায় অবস্থিতি করিতেন। এখানে প্রায় ১৩।১৪ জন ক্রিয়ান্বিত ছিলেন, ক্রমে ক্রমে সকলে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন সে এক মহা ক্রিয়ান্বিতের জনতা। সন্ধ্যার সময়ে গীতা পাঠ সংকীর্ত্তন ও যোগ-সঙ্গীতে সকলে ভরপুর হইতেন। দিবারাত্র ধর্ম্ম আলোচনা, সংসার যেন আহারও নাই; সকলেই ধর্ম্ম লইয়া মাতোয়ারা, তাহা মনে করিলেও অশান্ত হৃদয়ে শান্তির উদয় হয়।

যে দিবস আমরা তথায় উপস্থিত হই, ঐ দিবস ষষ্ঠি তিথি। সাতকড়ি বাবু ভাগ্যবান পুরুষ, শিবদুর্গাকে ঐ তিথিতে ঘরে মঙ্গলাচরণ করিয়া আনিলেন। ভূতনাথের সহিত ভূত প্রেতের অভাব ছিল না, সে ভূতের জীবনও সার্থক বলিতে হইবে। সপ্তমীর দিবারাত্রে আহারাদির বিলক্ষণ আয়োজন, কোন জিনিষের অপ্রতুল ছিল না। "খাও খাও" "লও লও" ভিন্ন অন্য কথা নাই। এই দিবস অক্ষয় দাদা মুক্তক মহাশয় কাটিহার হইতে আগমন করিলেন। পরদিবস মহা অষ্টমী, বেলা ৮ ঘটিকার মধ্যে সন্ধিক্ষণ সুতরাং অতি প্রত্যুষে পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরাণী আমাদিগের পরম গুরুদেবের প্রতিমূর্ত্তিখানি নানাপ্রকার সুন্দর পুষ্পে সজ্জিত করিতে লাগিলেন।

সাতকড়ি বাবু পূর্ণিয়ার মধ্যে একজন খ্যাতনামা উচ্চপদস্থ উকীল, মিউনিসিপালিটির এবং ডিঃ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং আরও কয়েকটী উপাধিতে ভূষিত। তথাকার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট সকল সাহেবই তাঁহাকে মান্য করেন সুতরাং সাহেবের বাঙ্গালা হইতে নানাপ্রকারের পুষ্প আসিতে লাগিল। তাঁহার বাটিদ্বয় নানারূপ সুন্দর পুষ্পের তোরণে সজ্জিত করা হইল।

সন্ধিক্ষণের পূর্ব্বে বাবা সকল ক্রিয়ান্বিতগণকে বাটীর মধ্যে পরমগুরুদেবের

প্রতিমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিতে আদেশ প্রদান করায় তদ্রূপই হইল। যথা সময়ে বাবার শ্রীমুখ দ্বারা গীতাপাঠ ও ফুল চন্দন অর্পন অন্তে, একে একে আমাদিগের সকলকে ফুল চন্দন দিতে আদেশ প্রদান করায় তদ্রূপ হইল এবং সকলে বাহিরে আগমন করিয়া যোগ-সঙ্গীতের গানে দিবা রাত্র অতি আনন্দে অতিবাহিত করিলেন। বেলা বার ঘটিকার সময়ে পূর্ণিয়ার স্থানীয় এবং আমরা সকলেই সমারোহ পূর্ব্বক প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম।

পরদিবস আহারান্তে আমরা কয়েকটী ভ্রাতা একত্রিত হইয়া পূর্ণিয়ার আদালত গৃহ এবং বাজার দর্শন মানসে অশ্বশকটে বহির্গত হইলাম। বাজারটী অন্যান্য জেলার বাজার অপেক্ষা হীন, আদালত গৃহসকল অন্যান্য জেলার ন্যায় একস্থানে সন্নিবেশিত নহে। উকিল কিম্বা আদালতের কর্ম্মচারিদিগের বড়ই কষ্ট, কারণ এক কাছারি হইতে অন্য কাছারিতে যাইতে হইলেই বুক দুড় দুড় করে এবং চাল চিঁড়ে সংগ্রহ করিয়া যাইতে হয়। কোন কাছারি একপোয়া, কোন কাছারিগৃহ অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত, অথচ পূর্ণিয়া ইংরেজ-রাজের একটী বড় জেলা, সকলই কিম্ভূত কিমাকার। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এই সহরে বড় কম নহে। বাটী ভাড়া পাওয়া দুর্ঘট, আমলা এবং উকীলগণ আপন আপন বাটী প্রস্তুত করিয়া বসবাস করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার সময়ে আমরা বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া বাবার সহিত সংমিলিত হইলাম এবং গীতাপাঠ গীতাব্যাখ্যায় সকলেই আনন্দে আত্মহারা হইলাম।

৺বিজয়াদশমীর দিবস বৈকাল বেলায় সাতকড়ি বাবুর বাটীতে দুইজন ক্ষত্রিয় বংশীয় ভদ্রলোক এবং শ্রীযুক্ত অরবিন্দ শর্ম্মা নামক আসাম দেশীয় ব্রাহ্মণ ক্রিয়ান্বিত একাম্বা নামক গ্রাম হইতে আসিয়া উপস্থিত। প াংশীয় বাবার শ্রীচরণে প্রণাম অন্তে কহিলেন, অনেকগুলি ক্রিয়ান্বিতের প্রতিনিধি স্বরূপ আমরা উক্ত গ্রাম হইতে আসিয়াছি। গ্রামস্থ সকল ক্রিয়ান্বিতের সানুনয় প্রার্থনা, যাহাতে পরাৎপর ইষ্টদেব সশিষ্যে তথায় পদধূলি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র গ্রামকে পবিত্র করেন এবং তাঁহাদের সকলের মনোবাঞ্ছা।

পূর্ণ করিয়া অতুল আনন্দ প্রদান করেন। বাবা তৎশ্রবণে যাইতে স্বীকার করিলেন এবং আমাদিগের কয়েকজনকে তাঁহার সহিত যাইতে আদেশ প্রদান করায়, পরদিবস আমরা যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

একাদশীর দিবস আহারান্তে বাবার সহিত আমরা পূর্ণিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া বেলা ১০—৩০ মিনিটের গাড়ীতে একাম্বা ষ্টেশনে রওনা হইলাম, এই ষ্টেশন পূর্ণিয়া হইতে ২।৩টী ষ্টেশনের উত্তরে। ষ্টেশন হইতে একাম্বা গ্রাম প্রায় তুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী। আমরা একাম্বা ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া কয়েকটী হস্তী ও বাবার নিমিত্ত অতি সুসজ্জিত পাল্কি অপেক্ষা করিতেছে দেখিতে পাইলাম। তাহা ভিন্ন আমাদের জিনিষ পত্র লইয়া যাইবার জন্য একখানি গোশকটও আসিয়াছে। আমরা ষ্টেশনে অবতরণ করিবামাত্র পরাৎপর ইষ্টদেব মহাশয়কে প্রথমেই পাঠান হইল। আমরা তৎপশ্চাৎ আপন আপন হস্তিযানে রওনা হইলাম এবং কয়েকটী নদী নালা পার হইয়া একাম্বা গ্রামে উপস্থিত হইলাম।

যে বাটীতে আমাদিগের হস্তী উপস্থিত হইল দেখিলাম যে যেন বিবাহের বাটী। প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপে প্রাঙ্গন পরিবেষ্টিত লোকে লোকারণ্য। ঐ চন্দ্রাতপের তলদেশে অনেক লোক উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, আমাদিগকে দেখিয়া তাঁহারা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া আমাদিগেকে সমাদর করিলেন এবং একখানি সজ্জিত বাঙ্গালার ভিতর লইয়া যাইলেন। দেখিলাম যদিচ বাটীটি খড়ের, কিন্তু পুষ্পে পুষ্পে এরূপভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে তাহাতে এক মনোরম দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ বাঙ্গালার ভিতর কাষ্ঠাসনের উপরিভাগে ফরাস পাতা, তাহার এক পার্শ্বে বাবা সুসজ্জিত আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, আমাদিগকে দেখিয়া রাস্তার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশের ফরাসে আমাদিগকে বসিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

বাবার অপর পার্শ্বে, তাঁহার ফটো ও পরম গুরুদেবের ফটো পুষ্প চন্দনে সুশোভিত রহিয়াছে। ভৃত্যগণ ব্যজন করিতে লাগিল, আমরা প্রকৃতিস্থ

হইয়া বাবার মহিমা দেখিয়া অবাক। কি আশ্চর্য্য! বাবার সকলই গুপ্ত। পুর্ণিয়া জেলার প্রান্তদেশে হিন্দুস্থানি ক্ষত্রিয় বৈশ্য এতগুলি ক্রিয়ান্বিত এক গ্রামে আছেন আমরা ইতিপূর্ব্বে ঘুণাক্ষরে জানিতাম না। আবার এই গ্রামে ব্যবসা উপলক্ষে কয়েকজন বাঙ্গালি বাবুও আছেন। ইহারা বহু পূর্ব্বে বাবার নিকট উপদেশ পাইয়া কেমন একস্থানে ৪০।৫০ জন ভ্রাতার সহিত একত্রিত হইয়াছেন। এই গ্রামে উচ্চ ক্রিয়ান্বিত ডাক্তার বাবু অরবিন্দ শর্ম্মা আসামদেশীয় ব্রাহ্মণ। ডাক্তারি কার্য্য উপলক্ষে এখানে মিলিত হইয়া সকলকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন।

যাহা হউক অল্পক্ষণ পরেই বাবা আমাদিগের দর্প চূর্ণ করিবার জন্যই যেন তথাকার ক্রিয়ান্বিতগণের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন "একে একে সকলেই আপন আপনি ক্রিয়া দেখাও।" তাঁহারা সকলেই একে একে ক্রিয়া দেখাইতে লাগিলেন। বাঙ্গালী (বাক্যনবিশ, মুখ সর্ব্বস্ব) ক্রিয়ান্বিতগণ অপেক্ষা তাঁহাদের কার্য্য এবং ভক্তি শতগুণে প্রশংসনীয়। আরও কয়েকটী অন্যান্য ক্রিয়াও দান করিলেন। ইহা ভিন্ন দ্বারবঙ্গ জেলা হইতে ক্রিয়া পাইবার জন্য ২।১ জন ব্যক্তি উপস্থিত। বাবা তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিলেন। অন্দর মহলে ক্রিয়ান্বিতাগণের ক্রিয়া পরিদর্শন অভিপ্রায়ে বাবা গমন করিলেন। গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্মীর বরপুত্র, ধন ধান্যে পরিপূর্ণ।

মহাসমারোহে তথাকার ভ্রাতাগণ জলপান করাইলেন তৎপরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানি, আসামি, ক্রিয়ান্বিত ভ্রাতাগণ সমবেত হইয়া গ্রামের উত্তরাংশে আম্র কাননের অতি সন্নিকটে একটী পার্ব্বতীয় নদীর তীরদেশে বায়ু সেবন মানসে গমন করিলেন। ঐ স্থানটী অতি মনমুগ্ধকর। তথায় প্রকৃতির শোভায় মোহিত হইয়া সকলে যেন মন প্রাণ এক করিয়া যোগ-সঙ্গীতের গানে সকলে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রায় ৭০।৮০ জন ভ্রাতা বাবার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আনন্দে বিভোর হইলেন। উত্তরে ধবলাগিরী দৃষ্টিগোচর হইতেছে, নদীর জল খরতর

স্রোতে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে, এইরূপ দৃশ্যে মানবগণ মুগ্ধ না হইবেন কেন? ইত্যবসরে পুরুষ সিংহ কয়েকটী শিষ্য সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। ইহাতে সকলের মনের আনন্দোচ্ছ্বাস যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। বাবা কাষ্ঠাসনে বসিয়া আমাদিগের ভাব লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন হিন্দুস্থানি, বাঙ্গালী ও আসামি ভ্রাতাগণ সমবেত হইয়া হিংসা দ্বেষ শূন্য হইয়া ভারত সন্তানগণ পূর্ব্বকালের ন্যায় যোগরত্ন উদ্ধার করিয়া স্বাধীন ভাবাপন্ন হউন।

নদীর তীর হইতে ডাক্তার বাবুর ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া বাবার গীতা ব্যাখ্যা শ্রবণে সকলে উৎসুক হইলেন এবং পরাৎপরও সকলকে মোহিত করিলেন। রাত্রে অতি উপাদেয় জলপান অন্তে প্রত্যুষে বাবার সমভিব্যাহারে একাম্বার নির্দ্ধারিত যানে প্রত্যাগমন করিয়া বাষ্পীয় শকটের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রাতে ৭ ঘটিকার সময়ে পূর্ণিয়া যাত্রা করিলাম। যথাসময়ে মাননীয় সাতকড়ি বাবুর ভবনে উপস্থিত হইয়া সকলের সহিত সংমিলিত হইলাম এবং বাবার মহিমা লইয়া আনন্দ করিতে লাগিলাম।

দুই দিবস পরে কাঠিহারের মুন্সেফ বাবু পরাৎপর ইষ্টদেব এবং আমাদিগকে তাঁহার কাঠিহার ভবনে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমরা সর্ব্বারম্ভে বাবার সহিত আনন্দ করিতে করিতে পূর্ণিয়া হইতে রেল শকটে যাত্রা করিলাম। কাঠিহার ষ্টেশনের নিকটেই তাঁহার বাসভবন, তত্রাচ বাবার জন্য পাল্কিসহ দাদা উপস্থিত ছিলেন। আমরা মহা আনন্দে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলাম। মাননীয় অক্ষয় বাবু মহা সমারোহে আয়োজন করিয়াছিলেন। দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সমাপন এবং নানারূপ সৎকথা আলোচনার পরে আমরা সকলে কাঠিহার ষ্টেশনে আসিলাম। আমার এইস্থান হইতে মুঙ্গেরে প্রত্যাগমনের কথা ছিল, কিন্তু ভ্রাতাগণ এই হতভাগ্য ভায়ের প্রতি স্নেহ বশতঃ নানারূপ কৌশল করিয়া বাবার দ্বারায় আমার গমন বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং বাবার সহিত পূর্ণিয়ায় ফেরত আসিলাম। তৎপরে

৩।৪ দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া আমি, সন্তোষ বাবু, রমেশ বাবু এবং উমেশ বাবু মুঙ্গের যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। যথাসময়ে সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া, যাত্রী গাড়িতে মুঙ্গের পৌছিলাম।

এই ঘটনার প্রায় একবৎসর পরে পরাৎপর ইষ্টদেব পুত্ররূপে দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করিলেন। মহা আনন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলাম। যথাসময়ে খোকা দাদামহাশয়ে অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করিবার অনিচ্ছায় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া নিমন্ত্রণ করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিলেন এবং তাঁহার আদেশমত মুঙ্গের ও জামালপুরের প্রত্যেক ক্রিয়ান্বিতের বাটীতে উপস্থিত হইয়া সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া আসিলাম এবং যাহাতে সকলে দেওঘরে বাবার ধামে সমবেত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করেন এরূপ বিনীত ভাবে অনুরোধ করিলাম সত্য, কিন্তু সকলের ভাগ্যে যাওয়া হইল না। এই উৎসবের জন্য লক্ষ্মীসরাই, বহি এবং ভাগলপুরস্থ ক্রিয়ান্বিতগণকেও নিমন্ত্রণ করা হয় এবং মুঙ্গেরের হিন্দুস্থানি ক্রিয়ান্বিত ভ্রাতাগণকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। অপরাহ্নের গাড়িতে মুঙ্গেরের এবং জামালপুরের কয়েকটী ভ্রাতাসহ যাত্রা করিলাম। ভাগলপুর হইতে ঐ গাড়িতে দুই একটী ক্রিয়ান্বিত আসিয়া আমাদিগের সহিত সংমিলিত হইলেন। সকলে একত্রিত হইয়া আনন্দ করিতে করিতে জামালপুর ত্যাগ করিলাম।

লক্ষ্মীসরাই ষ্টেশনে গাড়ির জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে গাড়ি পশ্চিম হইতে আসিলে দেখি, তাহাতে বহি হইতে দুই একটী ভ্রাতা আসিয়া মিলিলেন। লক্ষ্মীসরাই ষ্টেশনে সকল ভ্রাতা এক গাড়ীতে উঠিলাম এবং মহা আনন্দে আনন্দময়ের ধামে পৌছিলাম। বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া বার্ণ কোম্পানীর ক্ষুদ্রাকারের গাড়িতে দেওঘরে রাত্র আন্দাজ সাড়ে এগার ঘটিকা রাত্রে উপস্থিত হইলাম। আমাদিগের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া গুড়াকেশ বহির্বাটীতে আগমন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জলখাবার প্রস্তুতের বন্দোবস্ত হইল।

দেখিলাম, অনেকগুলি ক্রিয়ান্বিত ভ্রাতা কলিকাতা হইতে আগমন করিয়াছেন। তাহা ভিন্ন অন্যান্য স্থান হইতেও কয়েকজন আসিয়াছেন. যেন ক্রিয়ান্বিতের বাজার। আরও শুনিলাম পরদিবস আরও কয়েকজন আসিবেন। আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উদরকে ঠাণ্ডা করিলেন, আমিও নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তি সুখ অনুভব করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইল, অদ্য পূজনীয় খোকাদাদার অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ ভোজনের দিন। অন্নপ্রাশন ৭ দিবস পূর্ব্বে সমাধা হইয়া গিয়াছে। এই যজ্ঞের আয়োজন যজ্ঞেশ্বর নিজেই করিয়াছেন।

কলিকাতা নিবাসী বাবু কানাইলাল শেঠ আর্য্যমিশনের সেক্রেটারী মহাশয় বাবার ভক্ত শিষ্য, তিনি কয়েক দিবস পূর্ব্বে দেওঘরে আসিয়াছেন, যজ্ঞের রীতিমত আয়োজন করিতেছিলেন। কলিকাতা হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মণও আসিয়াছেন, তাঁহারা নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছেন। সে এক মহা আয়োজন। কানাই বাবু যে কত প্রকার সরবৎ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ দিবস অভাবনীয়রূপে কোথা হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৎস্য আসিয়া উপস্থিত হইল। কালিয়া পোলাও যথেষ্ট প্রস্তুত হইয়াছিল। নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য, সরবৎ, মিষ্টান্ন, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। যিনি তাহা দেখিয়াছেন তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন। বাবার আদেশ মত মুঙ্গেরের সকল ব্রাহ্মণ, ক্রিয়ান্বিতগণকে পরিবেশন করিতে হইয়াছিল। দেওঘর হইতে প্রায় তিনশত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। প্রায় এক হাজার লোকের উপযোগী জিনিষপত্রের আয়োজন হইয়াছিল। রাত্রে খোকাদাদার অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে যে সকল ক্রিয়ান্বিত গীত প্রণয়ন এবং মুদ্রিত করিয়াছিলেন তাহা সঙ্গীত হইল এবং খোকাদাদার করকোষ্ঠী পঠিত হইল তাহাতে এই উপলব্ধি হইল ইনি ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য দেশে গমন করিয়া স্বনামধন্য হইবেন। আমরা তথায় দুই দিবস অতিবাহিত করিয়া মুঙ্গেরে প্রত্যাগমন করিলাম।

এই উৎসবের ৭ মাস পূর্ব্বে বাবার পরম ভক্ত শালকিয়া নিবাসী বাবু

চণ্ডিচরণ ঘোষাল মহাশয় আশ্চর্য্যভাবে দেহত্যাগ করেন। তাহা লইয়া মুঙ্গেরের ক্রিয়ান্বিত মহলে একটা বিষাদের ছায়া পতিত হয়। এই সময়ে পরাৎপর ইষ্টদেব আমাকে ক্রিয়া দিবার আদেশ প্রদান করেন। মুঙ্গের জেলার অন্তপাতী কয়েকজন ভদ্রবংশীয় হিন্দুস্থানি কায়স্থ এবং ছত্রী ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করি। জামুই মহকুমার ইংরাজী বিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক ক্রিয়া লইয়া যান। তন্মধ্যে জগদম বাবু দিন দিন উন্নত হইতেছেন। এই বৎসর মুঙ্গেরের ম্যাজিষ্ট্রেট সেরেস্তাদার বাবু সর্ব্বানী চরণ মুখোপাধ্যায় স্বস্ত্রীক এবং কলেক্টারির হেড্‌কেরাণী বাবু গোপাল কৃষ্ণ রায় সস্ত্রীক বাবার নিকট হইতে উপদেশ পান।

মাননীয় সর্ব্বাণি দাদা এক সময়ে বাবার প্রতি হতশ্রদ্ধ ছিলেন কিন্তু তাঁহার কৃপায় বাবার একজন ভক্ত শিষ্য হইয়া উন্নতি করিতেছেন। ইনি বাবার প্রতিষ্ঠিত মুঙ্গেরের সিদ্ধাশ্রমের সহকারী সেক্রেটারি হইয়া দিন দিন আশ্রমের উন্নতি করিতে লাগিলেন। মুঙ্গেরের খ্যাতনামা উপেন্দ্র বাবু উকীল, স্ত্রীর প্রাধান্যে ক্রিয়ার প্রতি শৈথিল্য এবং আমাদিগের সহিত মিশিতে সাহসী হইতেন না। কি আশ্চর্য্য! একজন বিজ্ঞ বিদ্বান ব্যক্তি স্ত্রীর ভয়ে কাতর হইয়া এই অমূল্য নিধিকে তাচ্ছিল্য করিতে লাগিলেন। মুঙ্গেরের খ্যাতনামা ডেপুটী-ইনেসপেক্টার-অব-স্কুল বাবু হরিবংশ সাহা সস্ত্রীক বাবার নিকট ক্রিয়া পাইয়া সিদ্ধাশ্রমে অনেক সময়ে উক্ত বাবু আত্মকার্য্য করিয়া দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। ইনি পরে পেনসন লইয়া সপরিবারে ৺কাশীবাস করিবেন স্থির করেন।

আমার ধর্ম্মপত্নী—ক্রিয়া পাইয়া দিবারাত্র বিভোর থাকিতেন। মুঙ্গেরের দেশমান্য নানকপন্থি স্বরূপদাস বাবাজী বাবার প্রতি অনুরক্ত হইয়া কলিকাতা হইতে উপদেশ লইয়া আসেন। ইহার একটা সুতার কারখানা এবং সাধু-দিগের জন্য বাটীতে সদাব্রত আছে। ইহার আশ্রমকে বড়-সঙ্গৎ কহিয়া থাকে। ক্রিয়ার উন্নতি বিলক্ষণ হইতে লাগিল এবং অনেক সময়ে সিদ্ধাশ্রমে

আসিয়া আমার সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব লইয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। ইনি মুঙ্গের নগরের মধ্যে প্রধানতম বৈদান্তিক বলিয়া বিখ্যাত। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিদাস সাধুও পরে উপদেশ পান।

মুঙ্গের হইতে বর্হি ষ্টেশনে প্রায় মধ্যে মধ্যে রোগী দেখিতে যাইতে হইত। তথায় আমাদিগের একজন ক্রিয়ান্বিত ভ্রাতা বাবু যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসা করিতেন। কঠিন ব্যাধি পাইলে আমাকে লইয়া যাইতেন। আমার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রদ্বয় মুঙ্গেরের সরকারী ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। পরাৎপর বাবা মধ্যে মধ্যে মুঙ্গেরকে পবিত্র করিতে আসিয়া আমাদিগের মনের মলিনতা দূর করিয়া যাইতেন। এক সময়ে মুঙ্গেরের তারাভূষণ বাবুর ব্রাস ভবনের প্রাঙ্গনে বাবা কলিকাতা হইতে সুবিখ্যাত ক্রিয়ান্বিতগণকে আনয়ন করিয়া যোগ-ধর্ম্ম-বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন. অনেক লোকের সমাগম হয়। মহা অষ্টমীর উৎসব কার্য্য প্রতি পূজার সময়ে সিদ্ধাশ্রমে সম্পন্ন করিতেছিলাম।

যে সময়ে জামালপুর হইতে আমার ঔষধালয় মুঙ্গেরে সিদ্ধাশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়ের সহিত একত্রিত করি, তাহার কিছুদিবস পরে মুঙ্গেরে প্লেগ ব্যাধির সূত্রপাত হয়। প্রথম বৎসরে মুঙ্গেরে অধিক লোকের ঐ ব্যাধিতে প্রাণনাশ হয় নাই। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের চৈত্র মাসে জামালপুর নিজ ভবনে আমার জ্যেষ্ঠ কুমার শ্রীমান্ জ্যোতীষ চন্দ্রের শুভ উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন হয়। মুঙ্গের হইতে পত্নী পুত্রকন্যাগণসহ উক্ত কার্য্যের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে গমন করেন। শ্বশুরালয়ে সকল কার্য্যের আয়োজন হয় কেবল উপনয়ন এবং ভোজনাদির কার্য্য নিজ ভবনে সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হয়। মুঙ্গের হইতে মাননীয় তারাভূষণ, ভূপাল, সর্ব্বানি, গোপালবাবুগণ সপরিবারে জামালপুর গমন করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিলেন। পরাৎপর ইষ্টদেব মহাশয়কে সংবাদ দেওয়া হয়, তৎকালিন তিনি তমলুক ছিলেন সুতরাং আগমন করিতে পারেন নাই। উপনয়নের ১০।১১ দিবস পরে পুত্রগণসহ পত্নী মুঙ্গের প্রত্যা-

গমন করেন। এই কার্য্যও অন্নপ্রাশনের ন্যায় সমারোহে হইয়াছিল বলিতে হইবে।

শেষবার বিবাহের কিছু পূর্ব্বে জন্মভূমি দর্শন এবং বাল্যকালের বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখিবার জন্য পদব্রজে স্বইচ্ছায় গুপ্তিপাড়া—আমার সাধের গুপ্তিপাড়ায় গমন করিয়াছিলাম। গুপ্তিপাড়ার জমিদার ফটিক বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। পথিমধ্যে বাল্যকালের কথা মনে জাগরূক হইতে লাগিল সেই পথ—সেই বাটী দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। আবার অনেক স্থান লোকশূন্য হইয়াছে দেখিলাম, দেশের এত পরিবর্ত্তন যে হইতে পারে তাহা পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই। সেই বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির—রথ দেখিলাম, কিন্তু যেন সকলই শ্রীহীন হইয়াছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে এবং ভাবিতেভাবিতে নির্দ্দিষ্ট বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলাম। ফটিক বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আনন্দিত হইলাম, আমার জন্য জলযোগের আয়োজন করিলেন। জলযোগ অন্তে গুপ্তিপাড়ার শ্রীমান সতীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাগান বাটীতে ফটিক বাবুর সহিত গমন করিলাম, সে স্থানে কয়েকজন ভদ্রলোক তাস খেলিতেছিলেন। আমাকে কেহই চিনিতে পারিলেন না, আমার দশাও তথৈবচ। আমার যখন তের বৎসর বয়ক্রম, তৎকালীন গুপ্তিপাড়া পরিত্যাগ করিয়া নলডাঙ্গায় মাতুলালয়ে গমন করি। ইহার পূর্ব্বে মহাসমারোহে সতীশ বাবুর বিবাহ হয়, তাহাই মাত্র স্মরণ হয় এবং সতীশ বাবুকে বাল্যকালে অনেকবার দেখিয়াছিলাম—মনে তাহা ধারণা হয় না। সতীশ বাবু আমার মাতামহের কুটুম্ব।

যাহা হউক ফটিক বাবু আমার পরিচয় প্রদান করিলে সকলেই চিনিতে পারিলেন এবং শিষ্টাচারভাবে এবং আত্মীয়ের ন্যায় সকলেই আমার সহিত ব্যবহার করিলেন এবং সতীশ বাবু আমাকে ভুয়োভূয় তাঁহার বাটীতে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেনন। আমার অনিচ্ছা সত্বেও কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না কারণ আমার জন্য গুপ্তিপাড়ার জমিদার ফটিক বাবু জলপানের

আয়োজন করিলে রাত্রে তাহার বাটীতেই জলপান হইল কিন্তু রাত্রে সতীশ বাবুর বৈঠকখানায় শয়ন করিলাম ইহাতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ। পরদিবস সতীশ বাবুর বাটীতেই আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রাতে ফটিক বাবু সহ পাড়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে পরিভ্রমন করিয়া ২।১ জন সমবয়স্কের সহিত আলাপ পরিচয় হইল. কেহই আর চিনিতে পারিলেন না। পরে আমার বাল্যবন্ধু বাবু রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্যের বাটীতে গমন করিয়া তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর চরণ দর্শন করিলাম তিনিও বিশেষ আহ্লাদিতা হইলেন।

অপরাহ্নে গোপজাতীয় কুঞ্জ গোপের সহিত দেখা হইল। ত্রিশ বৎসরের পরে এই বাল্যবন্ধুটী আমাকে চিনিতে পারিলেন এবং অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সে এক মহা আনন্দ! তাহার সহিত আমার যেমন অকপট বন্ধুত্ব ভাব ছিল, তাহার পরিচয় কুঞ্জ দিয়াছিল। কুঞ্জ অতি গরীবের পুত্র কিন্তু দেখিলাম ইষ্টক অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছে ধন ধান্যে শ্রীমান, মনে বড়ই আনন্দ হইল। দুই দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া বাষ্পীয় পোতে বলাগড়ে প্রত্যাগমন করিলাম। জন্মভূমি এবং জন্মবাটী দেখিতে গমন করিয়াছিলাম। সে স্থানে বাগান প্রস্তুত হইয়াছে স্থান নির্ণয় করিতে পারিলাম না! কি পরিবর্ত্তনশীল জগৎ! এক সময়ে যে স্থানে অট্টালিকা বাজার হাট, আবার কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐ স্থানের ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কালেতে কি না হয়? জীব যেরূপ মরজগতে কালে বিলীন হয়, জীবের আবাস ভূমিও সময়ে কালের স্রোতে শ্মশানভূমি অথবা বন জঙ্গল বা নদীতে পরিণত করাইয়া দিয়া থাকে। জন্মভূমি দেখিতে যাইলাম। বাটী নাই. যেস্থানে বাটী ছিল তাহাও নির্ণয় হইল না। এককালে যে বাটীতে মহা সমারোহে পূজা পার্ব্বন হইয়া গিয়াছে, প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা পাড়ায় শোভা বর্দ্ধন করিত, এখন কিনা তাহার স্থান নির্ণয় হইল না। যাহা হউক যথাসময়ে বলাগড়ে শ্বশুর মহাশয়ের বাটীতে পৌছিলাম।

বিবাহের পরে পরমারাধ্য বাবার আদেশ অনুসারে মুঙ্গের একাকী গমন

করিলাম। ঐ সময়ে মহামারি তিরোভাব হইয়াছে, কিন্তু সহরটি শ্রীহীন অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। কয়েকটী বাঙ্গালি বাবু এবং কয়েকটী স্ত্রীলোক এই ব্যাধিতে গতাসু হইয়াছেন শুনিলাম। আমি ক্ষুন্নমনে মুঙ্গেরে আসিলাম এবং আমার সাবেক ডাক্তারখানার বাটির উত্তরাংশে আর একটী দ্বিতল বাটী ভাড়া করিলাম এবং ডাক্তারখানা এবং সিদ্ধাশ্রম খুলিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। মুঙ্গেরে অবস্থিতিকালীন মাননীয় সর্ব্বানি বাবুর যত্নে কয়েক ঘর রোগী পাইয়াছিলাম. শুনিলাম অধিক দিন অনুপস্থিত থাকায় ঐ সকল লোক অন্য ডাক্তারকে ডাকাইয়া চিকিৎসা করাইযা থাকেন। একেত মহামারিতে সহরবাসী আত্মীয়হীন এবং শ্রীহীন হইয়াছে তাহার উপর অধিক দিন স্থান ত্যাগে আমার পসার একেবারেই নষ্ট হইয়াছে।

কিছুদিনের মধ্যে নব স্ত্রী ও প্রথম এবং দ্বিতীয় পুত্রকে মুঙ্গের আনয়ন করিলাম এবং আমার স্ত্রী অতিশয় বালিকা বিধায় তাহার সাহায্যের জন্য আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়ের স্ত্রীকে নূতন বাসায় আনয়ন করিলাম তাহারা দুইটীই সমবয়সী। যদি উভয়ে একত্রে থাকেন পিতা মাতা বিচ্ছেদে আকুল হন না। যাহা হউক পণ্ডিত মহাশয় ও আমি একত্রে এই বাটীতে বাস করিতে লাগিলাম। এই দুইটী বালিকা, ইহাদের দ্বারা সংসার চলিবে কিরূপে? সেজন্য একজন পাচকও রাখিতে হইল। এত আয়োজন করিলে কি হইবে আমার ব্যবসার কিছুমাত্রও উন্নতির আশা দেখিলাম না, তিন মাস ভাগ্য পরীক্ষার জন্য কায়ক্লেশে অতিবাহিত করিলাম লক্ষীহীনের ভাগ্যের উদয় অসম্ভব।

মুঙ্গেরের সকল ভ্রাতারই মত আমি স্থান ত্যাগ করি, নচেৎ আমার আর্থিক কষ্ট অধিক ভোগ করিতে হইবে। পরাৎপর ইষ্টদেব মহাশয়কে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলাম, কিন্তু তিনি এই স্থানেই থাকিতে লিখিলেন। আমার সংসার প্রায় অচল হইয়া উঠিল, এমত সময়ে টুরকুরিয়া নিলের কনসার্ণের ডাক্তার পদ শূন্যের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে মুঙ্গেরের অক্ষয় বাবু কলিকাতায়

আমার ঐ পদ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে অনুমতি চাহেন। বাবা অনুমতি দেন, তদনুসারে আমি তথায় আবেদন করিলাম। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে মনোনীত করিয়া ম্যানেজার তারে নিয়োগ করেন। ঐ সংবাদ প্রাপ্তে ভ্রাতাগণকে সমবেত করাইয়া পুনরায় তাঁহাদের মত গ্রহণ করি। মাননীয় সর্ব্বানি দাদা ব্যতীত সকলেই ঐ কার্য্যে যাইতে অনুমোদন করেন।

কয়েক দিবস পূর্ব্বে বাবা একদিনে দুইখানি কার্ড লিখেন, তাহাতে "নদীর জল, বৃক্ষের তলদেশ কেহ লইবে না" এইরূপ ভাবের দুইখানি জ্ঞানপূর্ণ কার্ড পাই, কিন্তু মায়িক মন সুখ ঐশ্বর্য্যকে অধিক মূল্যবান মনে করিয়া বাবার উপদেশ উপেক্ষা করিয়া পবিত্র এত সাধের মুঙ্গের পরিত্যাগ করাইয়া ছাড়িল। জিনিষপত্র একটা ব্যবস্থা করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র ও নবস্ত্রী সহ সন্ধ্যার গাড়ীতে বি, এন, ডবলিউ রেলওয়ের জিউধারা ষ্টেশনের টিকিট ক্রয় করিলাম; মুঙ্গের ষ্টেশনে টিকিট লইয়া বাষ্পিয় পোতে গঙ্গা পার হইয়া মুঙ্গের ঘাট ষ্টেশনে উঠিলাম সমস্ত রাত্রি মধ্যম শ্রেণীর মধ্যম আয়তনের গাড়িতে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস মজফরপুর প্রভৃতি ষ্টেশন পশ্চাতে রাখিয়া চম্পারন জেলার অন্তর্গত জিউধারা ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম. ষ্টেশনটী ৩য় শ্রেণীর সুতরাং তদ্বিষয়ে লিখিবার কিছুই নাই।

ইতিপূর্ব্বে টুরকুরিয়ার খাজাঞ্চি বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখি যে তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্টেশনে একখানি গাড়ী পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অবতরণ করিয়া জানিলাম কোন গাড়ীই আইসে নাই, জিনিষপত্র অনেক, সঙ্গে স্ত্রী ও ছোট ছোট দুইটী বালক, মহা বিপদেই পড়িলাম; বিশেষ কারণ তথায় গাড়ী পাওয়া যায় না। নিরুপায় হইয়া সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার বাবুকে আমার বিপদের কাহিনী বিবৃত করায় তিনি দয়া করিয়া একটি ষ্টেশনের লোক টুরকুরিয়া পাঠান। এই ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল মাত্র। যাহা হউক ঐ হিন্দুস্থানী বাবুটি আমার পুত্রদ্বয় ও বালিকা স্ত্রীর জন্য জল খাবারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমরা তাঁহাকে

শত শত ধন্যবাদ দিয়া বেলা বার ঘটিকার সময়ে জিনিষপত্র তাঁহার অধীনে রাখিয়া টুরকুরিয়ায় রওনা হইলাম। সে এক কিম্ভূৎ কিমাকার দেশ, কাঁচা রাস্তা শীতকাল বলিয়া রক্ষা, দুইধারে ময়দান ভিন্ন কিছুই লক্ষ্য হয় না। মধ্যে মধ্যে ২।৪ খানি দুই চালাযুক্ত তৃণকুটির মাত্র। ইষ্টক নির্ম্মিত ঘর দৃষ্টি গোচর হইল। তবে কুঠিটি প্রকাণ্ড, কল কারখানাও যথেষ্ট, শুনিলাম ভারতবর্ষের মধ্যে এই কুঠি শ্রেষ্ঠতম। সে যাহা হউক লক্ষ্মী বাবু যদিচ আমার অপরিচিত কিন্তু আমাদিগের জন্য আহারাদির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট আদর আহ্বান করিয়া বাটীতে লইয়া গেলেন। প্রায় ১০।১২ জন বাঙ্গালি বাবুর বাসা একস্থানে নির্ম্মিত। অন্যান্য বাবু মহাশয়েরাও আমাকে যথোচিত খাতির যত্ন করিলেন। আহার অন্তে আমার বাসায় গমন করিলাম। পূর্ব্ব ডাক্তার বাবুর চাকর ছিল তাহার নাম কুঞ্জিয়া। আমার কার্য্যে নিযুক্ত হইল এবং ঠাকুর মহাবীর পাঁড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমাদের সকল অসুবিধা দূর হইল। বাসা পূর্ব্ব হইতেই মেরামত ছিল। জিনিষপত্র পরদিবস ষ্টেশন হইতে আসিয়া পৌঁছিল। ঐ কুঠির বড়বাবু হুগলির নিকট খামার পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিচরণ ঘোষ মহাশয় ঐ সময়ে দেশে ছিলেন, তিনিও কয়েক দিবস পরে আসিলেন। তিনি মহাশয় ব্যক্তি আমার যথেষ্ট যত্ন এবং তত্ব তল্লাস লইতেন। তথায় যতগুলি বাবু ছিলেন সকলেই সপরিবারে বাস করিতেছিলেন সুতরাং আমিও তাঁহাদের প্রতিবেশী হইলাম। গায়ে গায়ে বসত সুতরাং সকল স্ত্রীলোক সকল বাসায় যাতায়াত করিতে কোনরূপ অসুবিধা বোধ করিতেন না। বাসার দক্ষিণাংশে হিন্দি মাইনর স্কুল, পোষ্টাফিস এবং বাজার। সপ্তাহে দুইবার করিয়া হাট বসিয়া থাকে। মৎস্য অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে এবং সস্তা মুল্যে বিক্রয় হয়। এদেশে "ঢবুয়া" পয়সা প্রচলিত, টাকাতে ৩০ গণ্ডা পাওয়া যায়। সকল জিনিষপত্র সস্তা দরে বিক্রয় হয়।

পরদিবস কোম্পানীর কুঠি দেখিলাম, বৃহৎ কারখানা, নীলের চাষের

জন্য ইঞ্জিনে কলের লাঙ্গল ব্যবহার হয় ও অন্যান্য নানাপ্রকার কল কারখানা দেখিলাম, বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানি আমলা ২৫।৩০ জনের উর্দ্ধ। এই কোম্পানীর একচ্ছত্রী জমিদারী, বিশ মাইল দৈর্ঘ ও প্রস্থে, তন্মধ্যে ৭।৮টী নীল কুঠি। ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক কুঠিতে একজন করিয়া সাহেব, জমিদারীর গোমস্তা ও তহশিলদার এবং একজন কিম্বা দুইজন করিয়া বাঙ্গালী বাবু থাকেন। ইহা ভিন্ন সমস্ত জমিদারীর জন্য একজন জমিদারীর ম্যানেজার সাহেব আছেন। ইহার পৃথক কাছারি এবং উচ্চতম ও অন্যান্য কেরানি ও হিন্দুস্থানি আমলা আছে, এই সাহেবের কাছারি এই টুরকুরিয়াতে। অন্যান্য ২।৩টী কুঠিতে সরকারী কার্য্য উপলক্ষে আমাকে হস্তিতে এবং স্যাম্পনিতে যাইতে হইত। এই কোম্পানীর জমিদারীর মধ্যে ধনী তালুকদারও আছেন, তাঁহাদিগের আয়ও বড় কম নহে। ঐ সকল তালুকদারদিগের বাটীতে আমাকে কখনও কখনও যাইতে হইত, তাঁহারা হস্তি বা স্যাম্পনি পাঠাইয়া দিতেন। জমি সকল দেখিলাম খুব উর্ব্বরা—ধান প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

সাহেবাদগের প্রজার প্রতি অত্যাচার কম দেখিলাম না। তবে নীল-দর্পনের লিখিত অত্যাচারের অপেক্ষা কিছু কম। প্রজারাও সময়ে সময়ে সাহেবদিগের প্রতি বিরূপ হইয়া প্রতিশোধও প্রদান করিয়া থাকে। টুরকুরিয়ার একজন ধনী হিন্দুস্থানি শুড়ি জাতীয় মহাজন আছেন। তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা বসতবাটী, ঐ বাটীতে আমাকে প্রায়ই যাইতে হইত। এক বৎসর টুরকুরিয়ায় ছিলাম ইহার মধ্যে পসার যথেষ্ট হইয়াছিল। জ্যোতীষ রাবাজিকে টুরকুরিয়া হইতে হুগলী কলেজে পড়িতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। শ্রীমান গোপালচন্দ্র আমার দ্বিতীয় পুত্র হিন্দি ভাষা আয়ত্ব করিয়া লইয়াছিল। টুরকুরিয়ায় স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে, ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই চলে।

এই এক বৎসরের মধ্যে একবার ছুটি লইয়া পরিবারকে কলাগড়ে রাখিয়া আসি। দুইবার মতিহারি সহর দেখিতে গমন করি, অতি ছোট সহর—কেমন শ্রীহীন। সামান্য কয়েকখানি দোকান রাস্তার দুই ধারে সজ্জিত, ইহাকে

জেলা বলিলে লজ্জিত হইতে হয়। টুরকুরিয়া হইতে মতিহারি ৫ মাইল মাত্র,মতিহারির ২।৩ জন বাবুর সহিতও সাক্ষাৎ হয়, তাঁহারা বিশিষ্ট ভদ্রলোক। টুরকুরিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমি স্বপ্নাকি ছিলাম কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। তথায় গান বাজনার চর্চ্চা খুবই দেখিলাম। খামারপাড়া নিবাসী কালি বাবুর সহিত আমার সৌহৃদ্যতা যথেষ্টই হয়, তিনি অতি ভদ্রলোক। টুরকুরিয়ার ম্যানেজার একটি যুবক সাহেব আসিলেন, আমার জুতা পায়ে দিয়া তাঁহার বাঙ্গালায় যাওয়াই তাঁহার চক্ষুশূল হইল, এই সাহেবের জুতাতঙ্কর ব্যাধি ছিল।

একদিবস সকল সাহেব ষড়যন্ত্র করিয়া জমিদার সাহেবের বাঙ্গালায় আমাকে ডাকেন। আমি যাইলে জুতা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে কহেন। আমি সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বাহিরে রহিলাম। আর যাইবে কোথা! ইহাতে সাহেবেরা একত্র হইয়া পরামর্শ করিয়া ম্যানেজারকে জানান। আমাকে ডাকাইয়া পাঠান, আমি তাঁহার আফিসে যাইলে তিনি বলেন জমিদার সাহেবের বাক্য অবহেলা করিয়া অন্যায় কার্য্য করা হইয়াছে। আমি তাহা না মানিয়া আমাকে যে জমিদার সাহেব বিনামা খুলিতে বলায় অপমানিত হইয়াছি, তাহাই প্রকাশ করি এবং জুতা খুলিয়া কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কার্য্যে এস্তাবা প্রদান করি। একমাস অন্তে কার্য্য ত্যাগ করিয়া বলাগড়ে আসি।

ইহার কিছুদিবস পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪।৫ মাস পূর্ব্বে ঐ স্থানে থাকিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় নলডাঙ্গার হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় ডাক্তারকে বদলি রাখিয়া ঝরিয়ার অন্তর্গত বাগডিগি কলিয়ারিতে ২২ দিবস কার্য্য করি। এস্থানে মনসংযোগ না হওয়ায় এবং এই কলিয়ারিতে মাসে মাসে বেতন পাওয়া যায় না শ্রবণ করিয়া কার্য্য ত্যাগ করি এবং টুরকুরিয়া প্রত্যাগমন করিয়া হৃষি বাবুকে বাগডিগি প্রেরণ করি। পরে শুনিলাম ঐ ডাক্তার বাবু তথাকার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এক বৎসর টুরকুরিয়া কুঠিতে ছিলাম সত্য, কিন্তু

মনের প্রকৃত শান্তি একদিন তথায় পাই নাই। কারণ প্রাণের লোক তথায় ছিল না অধিকন্তু মন্দ প্রকৃতির লোকের সহিত বাস করিতে হইত।

কার্য্য ত্যাগ করিয়া বলাগড়ে গমন করি। তথায় কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া কলিকাতায় বাবার শ্রীচরণ দর্শন এবং শ্বশুর মহাশয়ের সাক্ষাৎ মানসে গমন করি। অর্থাভাবে মনুষ্যকে হেয় হইতে হয় ২৫।৩০ টাকা বেতনের চাকরির জন্য তখন লালায়িত হইলাম। কিন্তু সময় না হইলে কিছুই হয় না সুতরাং আমার চেষ্টা উদ্যম বৃথা হইল, এমন কি সিমুলতলার জন্য একজন ৪০৲ বেতনের ডাক্তারের পদ শূন্য হইল। আবেদন তো করিলাম তৎপরে কলিকাতার গণ্য মান্য বিদ্বান বাবু রাজেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী বাহাদুর এবং শোভাবাজারের রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নিকট হইতে মাননীয় সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সুপারিশ পত্র প্রদান করা সত্বেও বিফল মনোরথ হইলাম। কলিকাতার মধ্যে খ্যাতনামা এম,ডি, ডাক্তার নীলরতন সরকার, যিনি আমার সমপাঠী একত্রে তিন বৎসর ডাক্তারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছি। যিনি এককালে আমার অকপট বন্ধু বলিয়া অনেক সময়ে পরিচয় দিয়াছেন এবং বন্ধুচিত কার্য্য করিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তখন তিনি ক্যাম্বেল স্কুলের ছাত্র। এখন তিনি কলিকাতার মধ্যে গণ্যমান্য ধনবান লোক।

কোন লোকের অনুরোধে তাঁহার বাটী গমন করি এবং চার ঘণ্টাকাল তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার বৈঠকখানায় প্রতীক্ষা করি। আমার মনে কত আনন্দ! নিলরতন আসিয়া আমাকে দেখিয়া কত আনন্দিত হইবে, বাল্যবন্ধুকে পাইয়া এবং দেখিয়া আমিও আনন্দে ভাসিব। ও হরি! তিনি বাটী আসিয়া আমাকে চিনিতেই পারিলেন না। যাহাকে তুই মুই করিয়া ব্যবহার করিয়াছি, সে ব্যক্তি ধনমদে মত্ত হইয়া অবস্থাহীন পোষাকহীন মর্য্যাদাহীন একজন নেটিভ ডাক্তার শ্রীশ মুখুর্য্যের সহিত কিরূপে বন্ধুভাবে আলাপ করিতে পারেন। আমি বারম্বার মনে মনে যেরূপ ইহার নিকট আদর আহ্বান পাইব মনে ধারণা

করিয়াছিলাম তাহাই হইল। যিনি আমাকে এই ডাক্তার বাবুর নিকট প্রেরণ করেন আমি তাহাকে স্পষ্টই বলিয়াছিলাম, ডাক্তারবাবু আমাকে চিনিতে পারিবেন না তাহাই হইল। ইহাতে ভালরূপ শিক্ষা পাইলাম। আমিও লজ্জাহীন ঐ ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে একখানি সুপারিশ পত্র চাহিয়াছিলাম তাহাও দিলেন না। যাহা হয় মঙ্গলের জন্য। এইরূপ নানা উদ্যম নষ্ট হইতেছে। আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। শ্বশুর মহাশয়ের বাসায় কয়েকদিন আহারাদি করিতেছি।

একদিবস বাবার পাদপদ্ম দর্শন করিবার জন্য মিশনে গিয়াছি (বাবা কলিকাতায় অবস্থিতি কালীন প্রতিদিন আমি স্কুলে যাইতাম) শুনিলাম আমার প্রিয় বন্ধু ও ভ্রাতা বাবু বামদেব বন্দ্যোপাধ্যায় পরীক্ষা দিতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, জিনিষপত্র আর্য্যমিশনে রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি পি, ডবলিউ, ইনেস্পেক্টরের পরীক্ষা দিতেছেন। আমি তাহা শুনিয়া বহুকাল পরে তাঁহার দর্শন মানসে রাত্র আট ঘটিকা পর্য্যন্ত স্কুলে অপেক্ষা করিলাম। শ্বশুর মহাশয় যদি কুণ্ঠিত হয়েন এই ভাবিয়া দুঃখিত মনে মনঙ্গা লেনস্থ বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম এবং যথাসময়ে আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া শয়নের উদ্‌যোগ করিতেছি এমন সময়ে বামদেব ভায়া অতি কষ্টে আমাকে দর্শন দিতে ক্লেশ স্বীকার করিয়া বাসায় উপস্থিত, আমরা উভয়ে বিপুল আহ্লাদে মগ্ন হইলাম সে একটি স্মরণীয় রাত্র।

যাহা হউক তাঁহার বারম্বার অনুরোধে বি, এন, রেলওয়ের মহুলিয়ায় তাঁহার বাসায় যাইতে প্রতিশ্রুত হইলাম এবং শুনিলাম তথায় অনেকগুলি ক্রিয়ান্বিত আছেন এবং আমার ন্যায় মহাপাপীকেও দর্শন করিতে তাঁহারা ব্যাকুলিত। যাহা হউক সে যাত্রায় কলিকাতায় কোনরূপ ফল না হওয়ায় বলাগড় প্রত্যাগমন করি এবং ২।৪ দিবস অন্তে পুনরায় কলিকাতা হইয়া মহুলিয়ায় রওনা হইলাম। হাওড়া হইতে যে নূতন লাইন বি, এন, আর, লাইন খুলিয়াছে ঐ পথে যাত্রা করিলাম। এই আমার এই নূতন লাইন দেখা।

যাহা হউক খড়গপুর এই লাইনের প্রকাণ্ড নূতন ষ্টেশন। বেলা বার ঘটিকার সময়ে হাওড়া ছাড়িয়া তিন ঘটিকার সময়ে খড়গপুর পৌছিলাম। তথায় তিন ঘণ্টার উর্দ্ধকাল অপেক্ষা করিতে হইল। এই খড়গপুর সংযোগ ষ্টেশন নাগপুরের অভিমুখে আমাকে যাইতে হইবে। খড়গপুর হইতে ৭।৮টা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া মহুলিয়ায় যাইতে হয়। আমি খড়গপুরে অবতরণ করিয়া বামদেব ভায়াকে তারে সংবাদ প্রদান করিলাম এবং ৬ ঘটিকার সময়ে মহুলিয়া যাত্রা করিলাম এবং যথাসময়ে নয় ঘটিকার রাত্রে ষ্টেশনে গাড়ী উপস্থিত হইলে অনেক ক্রিয়ান্বিতসহ দাদামহাশয় আমাকে গাড়ী হইতে অবতরণ করাইলেন। সে মহা আনন্দ, আনন্দে আনন্দ মিলিয়া গেল। সে দিনের আনন্দ অতি পবিত্র।

সকল ভ্রাতা সমভিব্যাহারে দাদামহাশয় আমাকে তাহার বাস ভবনে লইয়া যাইলেন। পথের কষ্ট ভুলিলাম বাবার গুণানুবাদে রাত্রি দুইটা বাজিল সকল ভ্রাতা আপন আপন ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সকল ক্রিয়ান্বিতের বাড়ী মহুলিয়া গ্রামে এবং ইহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানেও অনেক ব্যক্তিকে দাদামহাশয় ক্রিয়া দিয়াছিলেন। যাহাহউক দুই ভ্রাতায় সুখ দুঃখের কথায় রাত্র প্রভাত করিলাম। নিম্নতলে বধূমাতাঠাকুরাণী তরফে আমার মা যাঁহাকে মা বলিয়া আহ্বান করি ৫।৬টি পুত্র লইয়া পরিচারিকাসহ থাকেন। মার আমার আনন্দের সীমা নাই। দাদামহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রদ্বয়কে কুমার ফেলায় দেখিয়াছিলাম ইহারা বড় হইয়াছে। দয়াময় তৎকালীন দাদাকে পাঁচটী পুত্র রত্ন দিয়াছেন।

আমি আনন্দে দাদামহাশয়ের ভুয়োভূয় অনুরোধে এবং ক্রিয়ান্বিতগণের অভিপ্রায়ে এক মাস তথায় রহিলাম, প্রতিদিন গীতার চর্চ্চা ও বাবার গুণানুবাদ চলিতে লাগিল রাত্রে যোগ-সঙ্গীতে আনন্দিত। দিন কয়েক আনন্দের ধুম চলিতে লাগিল। গ্রামের ক্রিয়ান্বিতগণ তাঁহাদের পত্নীগণের ক্রিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। প্রায় এক মাস অতিবাহিত করিয়া পুনরায় ঝরিয়ার

অন্তর্গত বাগ্‌ডিগি কোলিয়ারির ম্যানেজারের নিকট তারে সংবাদ লইলাম যে, কার্য্য খালি আছে কিনা এবং আর আমাকে চাহেন কিনা। উক্ত ম্যানেজার সাহেব তারে আমাকে যাইতে সংবাদ দিলেন। তদনুসারে আমি সকলের নিকট বিদায় লইয়া মেদিনীপুর লাইন হইয়া ভাগা ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া বাগ্‌ডিগি হইতে প্রেরিত চাপরাসিসহ রাত্রি নয় ঘটিকার সময়ে উক্ত কোলিয়ারিতে খুদিরাম বাবুর বাসায় পৌঁছিলাম। এই কোলিয়ারিতে প্রথমে যখন বাইশ দিবস কার্য্য করিয়া গিয়াছি, এখানকার বড়বাবু খুদিরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় থাকিতাম এবং তাঁহার ব্যবহারে মোহিত হইতে হইত, এবারেও তাঁহার ভরসা এবং চেষ্টায় পুনরায় বাগ্‌ডিগি আসিলাম। পরদিবস প্রাতে ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম,—তিনি সন্তোষ হইলেন। ঔষধপত্র কিছুই নাই, বাসাও নাই শুনিলাম।

যাহা হউক ব্রাহ্মণ বারারি কোলিয়ারিতে আমার ভ্রাতা শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি কোলঙ্গায় ছিলেন, এখানে গত বৎসর সাক্ষাৎ হওয়ায় বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। ইনি ই. আই, কোল কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার অফিসের উচ্চতম কেরাণী, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহেবের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। আমি অম্বিকা বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই স্থির করিলাম এই স্থানেই আহারাদি করিয়া বাগ্‌ডিগি কার্য্য করিব, কারণ বারারি হইতে বাগ্‌ডিগি অতি নিকট। ম্যানেজার সাহেব তাহাতেও সম্মত হইলেন। শ্রীযুক্ত অম্বিকা বাবু রবিবারের প্রাতে জিয়াগড়া জেনারেল ম্যানেজার অফিসে ছিলেন, আমি তথায় গমন করি। ঐ অফিসের অফিস মাষ্টার মিষ্টার সেভিকে অম্বিকা বাবু আমার পরিচয় দিলেন এবং কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি অম্বিকা বাবুর লিখিত মত বলাগড় হইতে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম, ঐ সময়ে সেভি সাহেব, জেনারেল ম্যানেজার মিষ্টার টার্ণবুল সাহেব বিলাত গমন করায় তৎপরিবর্ত্তে কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে আমার আবেদন প্রাপ্ত হইয়া

এবং অম্বিকা বাবুর সুপারিসে আমাকে বারারির ডাক্তারের পদ দিতে মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে বারারির ডাক্তার বাবু রামতারক দাস অনুপযুক্ত।

যাহা হউক সে সময়ে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, এক্ষণে জেনারেল ম্যানেজার টার্ণবুল সাহেব বিলাত হইতে আসিয়াছেন সুতরাং আমার জন্য বড় সাহেবকে সেভি সাহেব বলিলেন এবং আমাকে পুনরায় একখানি আবেদন করিতে অনুরোধ করিলেন আমি মূল প্রসংশাপত্রগুলিসহ আবেদন করিয়া চলিয়া আসিলাম। ঐ পত্রের উপর বড় সাহেবের এইরূপ আদেশ হইল যে, পরদিন প্রাতে সেভি সাহেব যেন আমাকে বারারি লইয়া গিয়া ডাক্তার রাম তারকের নিকট হইতে চার্জ্জ দেওয়া হয় এবং আমাকে পঞ্চাশ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হয়! আমি এই সংবাদ সন্ধ্যার পরে বাগ্‌ডিগি হইতে আসিয়া পাইলাম এবং সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া স্তম্ভিত হইলাম কারণ এত শীঘ্র যে আমাকে ইহারা এই কার্য্য দিবেন ইহা ধারণাই করি নাই, আমি বড়ই চঞ্চল হইলাম। এইরূপ ধনী ঘরের কার্য্য পাইয়া ছাড়িতে পারিব না। বাগ্‌ডিগিতে সকলই বেবন্দোবস্ত। মাসে মাসে বেতন পাওয়া যায় না, থাকিবার বাসা নাই। অথচ আমি সেখানে আসিয়াছি এবং একবার ছলনা করিয়া তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া টুরকুরিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণ অভদ্রোচিত কার্য্য হইয়াছে। আবার লিখিবামাত্রই আমাকে বিলেট সাহেব তারে সংবাদ দিয়া আনাইয়াছেন। এখন কি না তাহাদিগের চাকরী ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী কুটিতে কার্য্য করিতে লজ্জিত হইতেছি না।

এখন উপায়! কি করা যায়, অম্বিকা ভায়ার অফিসের কয়েকটি সহকারি কেরাণী বারারি বাসায় ছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলাম পরিশেষে জিয়লগড়া অফিসের কেরাণী বাবু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়সহ ঐ রাত্রে বাগ্‌ডিগি খুদিরামবাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে সঠিক সকল সংবাদ কহিলাম; তিনি বারারির চাকরী যে খুব ভাল স্বীকার

করিলেন। কিন্তু বিলেট সাহেব আপনাকে ছাড়িবেন না এবং টার্ণবুল সাহেবকে লিখিয়া আপনার চাকরির অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন ইহাও বলিলেন। যাহা হইক আমার বিশেষ অনুরোধে রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময়ে আমি ও খুদিরাম বাবু সাহেবের বাঙ্গলায় গমন করিলাম। খুদিরাম বাবু আমার হইয়া প্রস্তাব করিলেন সাহেব ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া আমার মুখ দর্শন করিবেন না বলিলেন। আমিও তাঁহাকে দুই-চারটি কথা বলিলাম। কিছুতেই সাহেবের মন নরম হইল না। কি করি উপায় নাই। বারারির চাকরিটীও থাকিবে না এখানকার চাকরীটিও যাইল।

হরিষে বিষাদ হইল। নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে নিত্যবাবুসহ বারারি আসিলাম এবং ইহাই ঠিক করিলাম। প্রাতে সেভি সাহেবের নিকট যাইবার কথা। সরল মনে সকল বিষয় খুলিয়া বলিব ইহা সত্বেও যদি চাকরী দেন ভালই নচেৎ কলিকাতায় ফেরৎ যাইব বা মহুলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিব। প্রাতে জিয়ানগড়া আফিসে যাইয়া সেভি সাহেবকে সকল বিষয় কহিলাম। প্রথমতঃ তাঁহা শুনিয়া ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আমাকে বলিলেন এই কথা বড় সাহেবকে বলাই প্রশস্ত, তাহাই হইল। বড় সাহেবের এ সম্বন্ধে এই আদেশ হইল, যে যখন এই ডাক্তার বাবু বাগ ডিগির জন্য আসিয়াছেন তখন তথায় এস্তাবা দিয়া ১ মাস কার্য্য করিয়া এখানে আসিতে পারেন। নচেৎ আপাততঃ আমরা নিকটবর্ত্তী কোলিয়ারীর সহিত বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহি। এই কথা শুনিয়া আমি সেভি সাহেবকে কহিলাম,—আমি আর বাগ্ডিগি চাকরী করিব না আপনারা যখন রাখিতে পারিলেন না আমি কল্যই চলিয়া যাইব, আমি যখন বাগ্ডিগিতে চার্জ্জ লই নাই, খরচপত্র কিছুই লই নাই, তখন আমাকে কোন বিষয়ে দায়ি করিতে পারিবে না। সেভি সাহেব বড় সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে বলিয়া দিলেন যে ১ মাস পরে বারারির জন্য তোমাকে নিযুক্ত করিব। এত চেষ্টার মূলে যে অম্বিকবাবু তাহা লিখা বাহুল্য। অনেক দিন অম্বিক এবং আমি ছোটনাগপুরের

অন্তর্গত কোলঙ্গায় ছিলাম সেই জন্য ভায়ার একান্ত ইচ্ছা আমি এস্থানে পূর্ব্ব মত থাকি।

যাহা হউক আমি পরদিবস ঝরিয়া হইয়া পুরাতন রাস্তায় সিনি দিয়া মহুলিয়ায় গমন করিলাম। আবার সকল ভ্রাতা সমবেত হইয়া ১ মাস মহা আনন্দে কাটিতে লাগিল। প্রতিদিন মহুলিয়ায় গীতা পাঠ ও যোগ সঙ্গীত—আনন্দময়ের কৃপায় দিন কাটিতে লাগিল। সুসন দুর্গপুরের রাজবাটীর ডাক্তারের পদ শূন্য হওয়ায় আবেদন করিয়াছিলাম, ঐ পদের নিয়োগপত্র পাই কিন্তু বহুদুর বলিয়া ঐ কার্য্য গ্রহণ না করিয়া বারারির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এ দিকে আমাদের ভক্ত ভ্রাতা আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুরের জেনারেল ডেপুটী কালেক্টর) আমাকে মেদিনীপুরে তাঁহার বাস ভবনে যাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এই আশুবাবুর মুঙ্গেরের কেল্লার বাসায় প্রথমে মুঙ্গেরের গীতাসভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমি বারারি বা জিয়ানগড়া হইতে এপর্য্যন্ত কোনই পত্র পাইলাম না। তাহাতে মনে করিলাম তথায় বুঝি আমার কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। সে যাহা হউক মাননীয় বামদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়ার সহিত পরাৎপর বাবার শ্রীশ্রীচরণ দর্শন মানসে কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।

খড়গপুর ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হয়। তথায় অবতরণ করিবা মাত্র আশুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। কয়েক বৎসর পরে সাক্ষাৎ, উভয়ে বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমরা কলিকাতায় বরাবর না যাইয়া আশু দাদার সহিত তন্মুহুর্ত্তেই মেদিনীপুরে যাত্রা করিলাম। খড়গপুর হইতে মেদিনীপুর দুইটী মাত্র ষ্টেশন সুতরাং দেখিতে দেখিতে মেদিনীপুর পৌছিলাম এবং ষ্টেশন হইতে অশ্বশকটে আমরা তিন জন বাসায় পৌছিলাম। আশুবাবুর বাসা প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা, আড়ম্বরের ত্রুটি নাই। অনেকগুলি পরিচারকে সুরক্ষিত। বৌমা আমাদিগের আসিবার পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া নানা প্রকার আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে আর একজন ক্রিয়ান্বিতকে

সংবাদ দেওয়াইয়া আনয়ন করিলেন, তিনিও আমার পূর্ব্ব পরিচিত। পূর্ণিয়ার সাতকড়ি বাবুর বাসায় আলাপ হয়, অতি ভদ্রলোক। সন্ধ্যার সময়ে গীতা পাঠ দ্বিতলে সম্পন্ন হয়। বধূমাতা চিকের অন্তরালে থাকিয়া গীতা শুনিলেন। আশু বাবু টেবিল হারমোনিয়মে যোগ-সঙ্গীতের গীতে মধু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বাবার অনিচ্ছার ইচ্ছায় দিবারাত্র মহা আনন্দে কাটিল।

পর দিবস প্রাতে সুন্দর আহারের আয়োজন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কারণ ৮ ঘটিকার মধ্যে এইরূপ আয়োজন কিরূপে হইল? আহারান্তে একখানি অশ্বশকটে ষ্টেশনে গমন করিলাম, সঙ্গে আশুবাবু দো-চাকার গাড়ীতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিতে চলিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ী পঁহুছিলাম আশু দাদার বিনয়ে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া যাত্রা করিলাম। আমরা দুই ভ্রাতায় খড়গপুরে অবতরণ করিয়া পুরি যাত্রিগাড়ীতে কলিকাতা রওনা হইলাম এবং ৩॥০ ঘটিকা সময়ে কলিকাতায় পৌছিয়া আর্য্যমিশনে বাবার শ্রীচরণে উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে দর্শন করিয়া হৃদয় মন পবিত্র করিলাম। পরদিন প্রাতে ত্রিতল ঘরে বাবার নিকট বসিয়া আছি এমত সময়ে একখানি তারের সংবাদে জ্ঞাত হইলাম আমার বারারি চাকরি হইয়াছে এবং সত্বর আমাকে তথায় কার্য্য গ্রহণ করিতে লিখিতেছেন। অম্বিক বাবুর বিশেষ চেষ্টার ফলে এই কার্য্য হইল সত্য, কিন্তু বারারির উপস্থিত ডাক্তারবাবু রামতারক দাস যিনি ১২ বৎসর এই কুঠিতে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, আমিই তাঁহার কার্য্যের হন্তারক হইলাম,—কথঞ্চিৎ মনে উদয় হইতে লাগিল।

বাবা বলাগড় হইতে ছেলেদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে আদেশ করিলেন এবং বলাগড় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বাবার সহিত এক গাড়ীতে যাইবার জন্য আমাকে দিনস্থির করিয়া দিলেন। সুতরাং মাননীয় বামদেব বাবুর সহিত বিদায় গ্রহণ করিয়া বলাগড় যাত্রা করিলাম। ওদিকে রাম বাবু মহুলিয়া যাত্রা করিলেন। কোথায় বাবার আদেশে ভায়া আমাকে ও ছেলেদের লইয়া মহুলিয়ায় যাইবেন আর তাহা না হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। আমি

যথাসময়ে কলাগড় হইতে ২।১ দিনের মধ্যে কলিকাতায় বাবার সমভিব্যহারে হাওড়ায় যাইয়া ঝরিয়ার টিকিট ক্রয় করিলাম। বাবা ও আর একটী ভ্রাতা বৈদ্যনাথ যাইতেছেন সুতরাং একখানি মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলাম, পরম পুরুষের সহিত এক গাড়ীতে থাকিয়া হৃদয়ে যথোচিৎ বলের সঞ্চার করিয়া লইলাম। আমি বেলা ২ ঘটিকার সময়ে আসানসোলে নামিয়া ঝরিয়ার গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

আমি আর্থিক কষ্টে ক্লিষ্ট হইয়াছি, মহাপাপীর সাজা মনে মনে অনুভব করিতেছিলাম। সেই জন্য চিন্তান্বিতভাবে আমাকে চাকরিস্থানে নামাইয়া গেলেন। আমি সন্ধ্যার সময়ে ঝরিয়ায় অবতরণ করিয়া বারারি অম্বিক বাবুর বাসায় গমন করিলাম এবং আমাকে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। পর দিবস প্রাতে জেনারেল ম্যানেজার টার্ণবুল সাহেবের আদেশ মত জমিদারী ম্যানেজার পেভি সাহেব প্রাতে ৮ ঘটিকার সময়ে আসিয়া রামতারক বাবুর নিকট হইতে চার্জ্জ দেওয়াইলেন। আমার বেতন ৫০৲ টাকা হইল। পরিবার রাখা উপযোগী একটী বাসাও পাইলাম। অম্বিক বাবুর সহিত মেসে আহারাদি চলিতে লাগিল। ডাক্তারখানায় মোটে ২৪।২৫টী ঔষধের শিশি দেখিলাম, সুতরাং অনেক টাকার ঔষধ আনাইয়া লইলাম। ইষ্ট ইণ্ডিয়াম কোল কোম্পানীর বিবরণ কথঞ্চিৎ দেওয়া বিধেয়, কারণ যখন এখানে দাসত্ব-স্বীকার করিলাম এবং কয়েক বৎসর কার্য্যও করিতে হইবে এইরূপ আশা মরীচিকা হৃদয়ে খেলা করিতেছে, তখন ইহার সহিত সম্বন্ধ বড় কম নহে।

এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট কলিকাতাস্থ জারডিন স্কিনার কোম্পানী। কয়লার খাদের ভারতবর্ষের মধ্যে বিখ্যাত নামা মিঃ টার্ণবুল এই কোম্পানীর সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং জেনারেল ম্যানেজার। ইহার অধীনে কেন্দুয়াডিহি এবং তৎঅধীনস্থ ২।৩টী খাত এবং বারারি জিয়ানগড়া খাত এবং আরও দুই একটী খাত এই কোম্পানীর অধীন। সকল কুঠির তত্ত্বাবধান টার্ণবুল সাহেব করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পৃথক অফিস ও বাঙ্গলা

জিয়ানগড়ায় স্থিত। তাঁহার অধীনস্থ সকল কুঠিতে ম্যানেজার এবং সহকারী ম্যানেজার থাকেন। এই বারারি কুঠি সুবৃহৎ এবং বার তের বৎসর হইতে কার্য্য চলিতেছে। এখনও বহুকাল চলিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমাকে যদিচ টার্ণবুল সাহেব নিয়োগ করিলেন এবং মেডিকেল অফিসর পদ দিয়া বারারি পাঠাইলেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বারারির ম্যানেজার মিষ্টার ফ্লুরি সাহেব আমার মনিব এবং তাঁহার আদেশ অনুসারে আমাকে সমস্ত কার্য্য করিতে হইতেছে এবং হইবে। আমাকে প্রতিদিন জেনারেল ম্যানেজারকে ম্যানেজারের স্বাক্ষরসহ দৈনিক রিপোর্ট পাঠাইতে হয়। এই কুঠির ম্যানেজারের দুর্ণাম শুনিলাম তজ্জন্য সদাই প্রথম প্রথম ভীত ভাবে কার্য্য করিতাম এবং কখন চাকরি পরিত্যাগ করিতে হয় তাহার অবসর দেখিতেছিলাম কিন্তু গুরু কৃপায় ইঁহার পুত্রগণের এবং স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যই হউক বা যে কারণেই হউক ইহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই আমার প্রতি সৎ আচরণ করিয়া আসিতেছেন।

ম্যানেজার সাহেবের আফিসে বাবু শচীদুলাল দাস প্রধান কেরাণী বাবু সতীশচন্দ্র চন্দ্র সহকারী, বাবু পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস সময় রক্ষক, বাবু নিমাই চরণ বকসী গুদাম বাবু এবং উপর্য্যুপরি কয়েকটী সারভেয়ার বাবু ওরফে কম্পাস বাবুগণ কার্য্য করিতেন এবং আমার সহিত সকলেই সৎব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এই বাবুগণ ভিন্ন আরও কয়েকজন বাঙ্গালীবাবু খাতের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে কয়লা কুঠির বাবু মহাশয়েরা প্রায়ই মদ্‌কাকে হৃদয়ের বন্ধু বিবেচনায় তাহার সহিত প্রণয় অধিক হয়, কিন্তু এই কুটীতে তাদৃশ কিছুই পরিলক্ষিত হয় নাই। বাবুদিগের স্বভাব চরিত্র ভদ্রোচিতভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যদ্রূপ শুনিলাম, এই কুঠির বাবুগণ কয়লা কুঠির দৃষ্টান্তস্থল স্বরূপ। বাঙ্গালীর স্বভাব যেরূপ, বিবাদ, দ্বেষ, হিংসা ভিন্ন থাকিতে পারে না, কিন্তু ইহাদের তাদৃশ কিছুই দেখি নাই। যুবকের অংশই অধিক ছিলেন তাহাতেও কোনরূপ স্বভাবের ব্যতিক্রম হয় নাই, বিশেষ প্রশংসার কথা।

জেনারেল ম্যানেজার সাহেবেরও সাত আটটী বাবু এই বারারিতে পৃথক বাসায় বাস করিতেন। তন্মধ্যে বাবু রজনীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয় কেরাণী বারারি কুঠির জন্ত খাজাঞ্চীর উপাধী প্রাপ্ত হন, লোকটি সামাজিক অতি ভদ্র এবং জ্ঞানী, আমার সহিত তাঁহার কম সৌহৃদ্যতা ছিল না। বাবু ব্রজ মোহন চৌধুরী কায়স্থ বংশীয় এই কোম্পানীর একজন পুরাতন আমলা, অতি সরল পরোপকারী ভদ্রলোক. বাবু নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় যুবক হইয়াও ধর্ম্ম কর্ম্ম করণেচ্ছু সদাচার ব্যক্তি। বাবার আদেশ মত আত্মকার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করেন! বাবু রাধাকিশোর সামন্ত—সরল প্রকৃতির অনেক পরিচয় তিনি দিয়া থাকেন ইংরাজীতে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন ইনিও বাবার আদেশে উপদেশ প্রাপ্ত হন। ইহা ভিন্ন অনাথ বাবু এবং আমার শ্যালক দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আফিসে কার্য্য করিতেন। সকল বাবুদিগের প্রতি মাননীয় অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চ কেরাণী বাবু সৎ ব্যবহার করিতেন। আমার সমবয়স্ক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত সৌহৃদ্যতা হয়. তিনি প্রসংসার পাত্র, তবে এতাধিক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও আত্মধর্ম্ম কি? অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

আমি সরল প্রাণে বন্ধুত্বের মত ধর্ম্মের আবশ্যকতা কিয়ৎ পরিমাণ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু যে সংস্কার মনুষ্য হৃদয়ে দৃঢ়রূপে বদ্ধমুল হয় তাহা উৎপাটন করাও সুকঠিন। সুতরাং আত্মধর্ম্ম যে জীব মাত্রেরই করণীয় স্বীকার করা স্বত্তেও এই ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইল না। সকলই জীবের কর্ম্মফলের উপর নির্ভর করে। মাননীয় নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়. রাধাকিশোর সামন্ত এবং পাথরডিহির ষ্টেশন মাষ্টার: বাবু অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখানে উপদেশ পান। কিন্তু রাধাকিশোর বাবু ভিন্ন সকলেই কিছু না কিছু কার্য্য করিতেছেন। অবিনাশ বাবুর অবস্থা মন্দ নহে। গৌরিক্ষা অল্প দিবসের মধ্যে হইয়াছে। আমি অল্প অল্প ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিতে লাগিলাম! তাহাতে একটী অবস্থা অনুভূত হয়, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ১৯১২

সালের আশ্বিন মাসে মহাঅষ্টমীর উৎসব কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য নলডাঙ্গায় গিরিজাভূষণ বাবুর বাটীতে গমন করি। তথায় রাজা ব্যোমকেশ দেবরায়, শৈলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন এবং সকল ভ্রাতা সমবেত হইয়া মহা আনন্দে ৺কাশীর বাবার কার্য্য সম্পন্ন হয়। পর দিবস গ্রামস্থ সকল পুরুষ এবং স্ত্রীবৃন্দকে পরিতোষ-রূপে বাবার প্রসাদ দেওয়া হয়। রাজ দেওয়ান শ্রীশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং রাজাবাহাদুরের সহিত পূজার সময় সাক্ষাৎ করি। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

নলডাঙ্গায় বাবার লক্ষ্য পতিত হওয়ায় ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ান্বিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে চলিল। আমার মাতুল পুত্র শ্রীমান কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় অতি কষ্টে সপরিবারে নলডাঙ্গায় পর্ণ কুঠিরে বাস করিতেছে। কি পরিতাপের বিষয়। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া জগতস্থ তাবৎ জিনিষ পরিবর্ত্তনশীল হইতেই হইবে, ইহা স্বতসিদ্ধ! তখন ভায়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা অজ্ঞানের কার্য্য। তথায় কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া চাকরী স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করি। চাকরি গ্রহণ করিয়া আশ্বিন মাসে সিংভূম জেলান্তর্গত বি. এন, রেল মহুলিয়া ষ্টেশনে মাননীয় বামদেব বন্দ্যোপাধ্যায় দাদা মহাশয়ের বাসায় গমন করি এবং সকল ভ্রাতা সমবেত হইয়া বাবার কৃপায় মহা আড়ম্বর সহকারে মহাঅষ্টমীর কার্য্য সমাধা করিয়া তিন চার দিবস পরে বারারি প্রত্যাগমন করি। বাবার আদেশ অনুসারে অল্প দিবসের জন্য গীতাপাঠ রজনী বাবুর বাসায় হইতে থাকে কিন্তু ইহাতে ভ্রাতা মণ্ডলীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত হওয়ায় পরিত্যাগ করি। আপন বাসায় অবসর মত সময়ে গীতা পাঠ করিয়া আনন্দ পাইতাম। বারারিতে ধর্ম্ম কথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হইলেই যেন সকলে অন্ধকার দেখিতেন সুতরাং আমিও তাঁহাদিগের ভাবাপন্ন হইয়া পড়িলাম। মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে হইত প্রাণের লোক থাকা স্বত্বেও নির্ব্বাক হইতে হইত সেরূপ ক্রিয়ান্বিতের সমাজ কখনও কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

এই ভাবে দিন কাটাইতে লাগিলাম এবং অন্যান্য স্থানের ভ্রাতাদিগের সৎ ব্যবহারের জন্য এই স্থানটীকে হেয় মনে করিতে লাগিলাম। মিশনের ঔষধি সামান্য সামান্য আনাইয়া দিতে পারিতাম কারণ উত্তর সাধক না হইলে এই সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। এক বৎসর পরে ৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। বারারির চতুষ্পার্শে রোগী দেখিবার জন্য জেনারেল ম্যানেজারের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। স্বরস্বতী পূজার দিন প্রাতে ৭৷৷০ ঘটিকায় বসিয়া রাত্র ৮ ঘটিকার সময়ে একাসনে ১৭২৮৲ প্রাণায়াম করি। বাবার কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। বারারির উচ্চ কেরাণীবাবু শচীদুলাল দাস মহাশয়ের খুল্লতাত শ্রীযুক্ত দীননাথ দাস মহাশয় উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন এই স্থানেই বাবার ক্রিয়া দেখাইয়া দিই, তিনি ভক্তির সহিত কার্য্য করিতেছেন। কয়লা কুঠিতে অধিকাংশ লোকই অসৎ সঙ্গ হওয়ায় নিম্নগামী হইয়াই থাকে সুতরাং ধর্ম্ম প্রচার এরূপ স্থানে হওয়া সুকঠিন। আমি সপরিবারে অধিকাংশ সময়ে এই স্থানে ছিলাম, স্ত্রী বালিকা, বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর হওয়া সত্বেও তাঁহার ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য হইল না। সেরূপ পিপাসা বুঝি নাই যে তাঁহাতে উপদেশ দেওয়াইয়া দিই, বুদ্ধি অতি কম, সুবুদ্ধি কখন হইবে জানি না, কলহ বিবাদ যেন অঙ্গের ভূষণ অকর্ত্তব্য পরায়ণা, এই বালিকা ভাব কত দিনে তিরোহিত হইবে পরাৎপরই জানেন।

সন ১৩১২ সালের পৌষ মাসে পরাৎপর ইষ্টদেব, নলডাঙ্গায় মাননীয় গিরিজা ভূষণ দেব রায় মহাশয়ের আকিঞ্চনে নলডাঙ্গা যাইতে সম্মত হয়েন এবং নলডাঙ্গায় যাবতীয় ক্রিয়ান্বিত ভ্রাতা এবং গিরিজা বাবু বাবাসহ কলিকাতা হইতে নলডাঙ্গায় যাইতে অভিমত প্রকাশ করেন। এদিকে পরমারাধ্য পরাৎপর ইষ্টদেব তাহাতে সমর্থন করিয়া আমাকে দয়া করিয়া তথায় যাইতে পত্র লিখেন। ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়া পনর দিবসের বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিলাম। আনন্দময়ের আনন্দ যেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে ঝরিয়ার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দত্ত দাদা মহাশয় আমার

সহিত বাবার শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে কলিকাতায় গমন করিয়া কৃতার্থ হয়েন, তিনি এক দিবস পরে ফিরিয়া প্রত্যাগমন করেন। আমি, গিরিজা বাবু, বিনয় বাবু, মাষ্টার ও বিনোদ বাবু, আনন্দময়ের সমভিব্যাহারে উষাকালের খুলনা এক্সপ্রেস গাড়ীতে শিয়ালদহ হইতে রওনা হইলাম। সে মহা আনন্দ কাহিনী। বাবার গড়গড়ার নল আমার হস্ত হইতে কিরূপ ভাবে অন্তর্হিত হইল? অভাবনীয় ব্যাপার। সকলই তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছায় সংঘটন হইয়াছিল আমার বিশ্বাস।

সাড়ে দশ ঘটিকার প্রাতঃকালে আমরা যশোহর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। গাড়ীর বন্দোবস্ত ছিল, যথাসময়ে নলডাঙ্গায় একটী বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলাম। তথায় গিরিজা বাবুর আজ্ঞানুযায়ী লোকজন সকল উপস্থিত হইয়া পাকাদির কার্য্য সম্পন্ন হইতেছিল, আমরা বাসায় পৌছিয়া যশোহর বাজারে নল খরিদ করিতে বাবাসহ গমন করি। বাজার হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্নান আহারান্তে দুইখানি অশ্বশকটে আমরা অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময়ে নলডাঙ্গা রওনা হইলাম। রাত্রি অনুমান আট ঘটিকার সময়ে নলডাঙ্গার রংমহলের ঘাট নৌকাযোগে পার হইয়া গিরিজা বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। বাবার সমাদরের জন্য ফুল লতা পাতার তোরণ সকল নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল এবং বৈঠকখানায় নলডাঙ্গায় বড় রাজা, তৎভ্রাতা ব্যোমকেশচন্দ্র দেব রায়, নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত থাকিয়া পরাৎপর ইষ্টদেব মহাশয়কে অভ্যর্থনা করেন এবং একবাক্যে সকলেই স্বীকার করেন যে, অভাবনীয়ভাবে তাঁহার আগমন হইয়াছে। বাবা তাহা খণ্ডন করেন। পরাৎপর তিন চার দিবস তথায় থাকিয়া অনেকের সহিত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া অনেকের অন্ধবৎ মতকে খণ্ডন করিয়া দেন।

বাবা পরদিবস প্রাতে আমাদিগকে লইয়া ৺সিদ্ধেশ্বরী রামেশ্বরী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রণামী প্রদান করেন এবং বলী প্রদানের দোষের বিষয় বর্ণনা করিয়া উদাহরণ প্রদান করিয়া সকলের মুখ বন্ধ করেন। নলডাঙ্গাস্থ সকল

ক্রিয়ান্বিত সমবেত হইয়া আপন আপন কার্য্য প্রদর্শন করান এবং আমার মাতুল পুত্র শ্রীমান কালীপ্রসন্ন ভায়ার পত্নীকে ক্রিয়া প্রদান করেন। তৎভিন্ন কালীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বলদেপাড়ার কয়েকজন ক্রিয়ান্বিত আগমন করিয়া তাঁহাদের পরিবারবর্গকে ক্রিয়া দেওয়ান। কি আনন্দে কয়েক দিবস কাটিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে যেন পূজার তিন দিন কাটিয়া গেল। বাবা, বিনয় বাবু এবং বিনোদ বাবু সহ কলিকাতায় চলিয়া গেলেন; সে কি এক ভাবের উদাস ভাব সকলের হৃদয়কে আক্রান্ত করিল। আমি কয়েক দিবস তথায় থাকিয়া প্রজাগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া বাবার শ্রীচরণ দর্শন পাইলাম। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান জ্যোতিষচন্দ্র এই বৎসর প্রাথমিক স্কুল পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারিলেন না, বিশেষ পরিতাপের বিষয়। বাবার আদেশ ছিল যে আমার পত্নীকে বৈদ্যনাথে লইয়া যাইয়া ক্রিয়া দেওয়াইয়া আনা হউক। কিন্তু আমি বারাবারি আসিয়া ইঁহার মনের অবস্থা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া বুঝিলাম সময় উপস্থিত হয় নাই, অভাগিনী এই পর্য্যন্ত এইরূপ সার রতনে বঞ্চিতা রহিয়াছেন, সকলই তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের ফল।

অত্রস্থ ক্রিয়ান্বিতগণের মনের তেজ নষ্টপ্রায় অনুমিত হয় সুতরাং ক্রিয়ার উন্নতি এদিকে নাই, হইবে কি না বাবাই জানেন। যখন ক্রিয়ার কোন কথাই কহিবার বা ন্যায় অন্যায় কথা প্রয়োগ নিষিদ্ধ, তখন ক্রিয়ার উন্নতির আশা আকাশ কুসুম নহে কি? এই কয়লা কুঠির কাল বর্ণের ধুম রাশিতে এ প্রদেশ কু-আশা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, এ কুয়াসা সাময়িক নহে দিবা রাত্র একভাবে তমোতে অন্ধকারময়। এই কুয়াসা কাটাইবার জন্য গুরুদেব সুদর্শন চক্র আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন তাহার ব্যবহার করিতে পারিলে কুয়াসা কাটিয়া যায়, কিন্তু কংশের ভয়ে প্রাণ আকুল এখন দয়াময়ের কৃপাই একমাত্র ভরসাস্থল। সন ১৩১৩ সালের মহা অষ্টমীর উৎসব এই গরীবের কুটিরে সম্পন্ন হয়, তাহাতে মাননীয় অম্বিকা বাবু, রজনী বাবু, অবিনাশ বাবু, রাধা

কিশোর বাবু এবং সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন এবং গীতা পাঠের সময়ে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান জ্যোতিষচন্দ্র সমবেত হন। রাত্রে মহা আনন্দে যোগসঙ্গীত আশ্রম সঙ্গীতের গীতে মুগ্ধ হয়েন এবং সন্ধিক্ষণে সকল ভ্রাতা সমবেত হইয়া ফুল চন্দন প্রদান করেন। মুল কথা মহা আনন্দে রাত্র কাটিয়া যায়, পরদিবস স্থানীয় বাঙ্গালী বাবু এবং তাঁহাদিগের পরিবারবর্গ ভোজন করেন।

এই কার্য্যের সমস্ত কার্য্য শ্রীযুক্ত অম্বিকা বাবুর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। সন ১৩১৪ সালে অর্থাৎ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি পাই। এই সময়ে শ্রীমান জ্যোতিষচন্দ্র বাবাজীবন প্রবেশিকা পরীক্ষার অনুমতি পান এবং যথা সময়ে পরীক্ষা দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পরীক্ষায় বিফল মনোরথ হয়েন। ফাল্গুন মাস হইতে এই কুঠি এবং ঝরিয়ার চতুষ্পার্শে বিসুচিকা ব্যাধি হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে চৈত্র মাসে এই কুঠিতে এতাদৃশ বিসুচিকার প্রভাব হয় যে শত শত লোক এই ব্যাধিতে গতাসু হয়েন। এই দুর্দ্দমনীয় ব্যাধিতে আমাদের একজন ভক্ত ভ্রাতা নিত্যগোপাল বাবু মানব লীলা সম্বরণ করেন, বিসুচিকা-বিন্দু প্রয়োগেও কোন ফল লাভ হইল না। প্রদীপে তৈল না থাকিলে স্বভাবত নির্ব্বাণ হইয়া থাকে। কি দুর্দৈব! ইনি ক্রিয়া পাইয়া মুর্চ্ছা ব্যাধি হইতে অব্যাহতি লাভ করেন এবং মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্বে গ্রহণী ব্যাধিতে ভয়ানকভাবে কষ্ট পাইতে ছিলেন অতি কষ্টে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া এই কাল স্বরূপ ব্যাধির প্রকোপে গত হইলেন। ইহা ভিন্ন এই স্থানের আরও দুইটী বাবু এই ব্যাধিতে মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

বিসুচিকাগ্রস্ত বাঙ্গালী বাবুদিগের শুশ্রূষা করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার কার্য্যকারক শ্রীপতি চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট পরিশ্রম করেন কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই বাবুদিগের ব্যাধি আক্রান্ত দৃষ্ট এবং মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়ায় জিয়ানগড়া এবং বারারির অধিকাংশ বাবু দেশে চলিয়া যান; আমি প্রথমে আমার শ্যালক দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার স্ত্রীকে দেশে পাঠাইয়া দিই। তাহার পরে সকল বাবুর অন্তর্ধান

হওয়ায়, মনে ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় সাত দিবসের বিদায় প্রার্থনা করি। তাহাতে বড় সাহেব বিদায় দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় সুরেন্দ্র বাবুদিগের সহিত বংশবাটী হইয়া বলাগড় গমন করি। তথায় দুই চার দিবস অতিবাহিত করিয়া বংশবাটী হইয়া নিজ বসত বাটী চুঁচড়ায় গমন করি। বাটী পরিদর্শন করিয়া কলিকাতা গমন করি।

আমার চুঁচড়ার বাটিটী ছাদ বদল এবং অন্যান্য ভগ্ন সংস্কারের বিশেষ দরকার হওয়ায় চুঁচড়া নিবাসী বাবু যোগেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের বিশেষ যত্নে এবং তত্ত্বাবধানে বাটিটীর সমস্ত কার্য্য শেষ হয়। এই কার্য্যে প্রায় দুইশত টাকা খরচ হয়। ঐ বাটিটী দেখিবার জন্য বংশবাটী হইয়া চুঁচড়ায় গমন করি। কিন্তু যোগেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় একাকী বাটিটী পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় শ্বশুর মহাশয়ের মলঙ্গা লেনস্থ বাসায় গমন করি। তথা হইতে এক দিবস পরে বেলগাছিয়া পশু চিকিৎসা বিদ্যালয়ে শ্রীমান জ্যোতিষচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে দ্বিজেন্দ্র ভায়ার সহিত গমন করি। বিদ্যালয়স্থ হোষ্টেলটী অতি সুন্দর, প্রকাণ্ড দ্বিতল প্রকোষ্ঠ ছাত্রে পূর্ণ। দুঃখের বিষয় জ্যোতিষচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় মলঙ্গালেনে প্রত্যাগমন করি। তৎপর দিবস জ্যোতিষচন্দ্র আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, ইনি স্বইচ্ছায় এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন, দেখা যাউক ইঁহার উদ্যম কিরূপ।

এই বৎসরে প্রাণাধিক আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান গোপালচন্দ্র বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম হইয়া বলাগড়ের স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াছেন। আমি এবং দ্বিজেন্দ্র ভায়া একত্রে আট নয় দিবস দেশে থাকিয়া বারারি প্রত্যাগমন করি। চাকরী না থাকিবার কথা, কারণ বিনা বিদায়ে ডাক্তার হইয়া ভীষণ বিসূচিকা ব্যাধির কোলিয়ারিতে প্রকোপ কালিন চলিয়া যাওয়া সম্পূর্ণ গর্হিত। যাহা হউক তখন পর্য্যন্ত বাবু মহাশয়েরা দেশ হইতে সকলে প্রত্যাগমন করেন নাই। বারারি শ্রীভ্রষ্ট। তখনও পর্য্যন্ত চৌদ্দ পনরটী করিয়া প্রতিদিন কুলি-

দিগের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। যাহা হউক বড় সাহেব বিশেষ দয়া করিয়াই আমাকে কার্য্য করিতে আদেশ প্রদান করেন। এই সময়ে একজন মান্দ্রাজী ডাক্তার এখানে আমার অনুপস্থিতিতে কার্য্য করিতেছিলেন আমিও তাঁহার সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত অরুণোদয় মজুমদার মহাশয় কম্পাউণ্ডার রূপে এই কুটিতে নিযুক্ত হয়েন ইনি একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ বিচক্ষণ লোক আমার সহকারির কার্য্য করিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজী ডাক্তারটী এক মাস পরে প্রস্থান করেন। ক্রমে একমাস পরে এই ভীষণ ব্যাধির অস্তিত্ব তিরোহিত হইল। ক্রমে ক্রমে সকল বাবু প্রত্যাগমন করিয়া আপন আপন কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই প্রদেশ বলিয়া নহে—বাঙ্গালার অনেক স্থানে এই ব্যাধি এবং বসন্ত ব্যাধিতে অনেক লোক ক্ষয় হয়! পাপেতে বঙ্গদেশ টলমল করিতেছে। পর-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবেই এই লোকক্ষয় অবশ্যম্ভাবী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। দুই মাস পরে শ্রীমান জ্যোতিষচন্দ্র তাঁহার বিমাতা (ওকে) মাসিকে এই স্থানে রাখিয়া যান। কি আশ্চর্য্য চৌদ্দ পনর বৎসর সাধন করিয়াও ভীষ্ম বধ হয় নাই এইটী উপলব্ধি করিলাম, কি মনের রাজ্য এবং তাহার প্রতাপ। এখন যখন ভীষ্ম বধ হয় নাই তাহার পরে দ্রোণ কর্ণ অবশেষে দুর্য্যোধন অর্থাৎ কাম রিপুর বিনাশ সাধন না হইলে তো মনের বৈরাগ্য ঘটিবে না। আত্মরাজ্য স্থাপন দুরূহ কার্য্য। চিরকাল মন জীবকে প্রতাপের সহিত আপন কবলে রাখিয়া রাজ্য করিতেছে। তাহার রাজ্য হইতে তাহাকে পরাস্ত করা কিরূপ অধ্যবসায় আবশ্যক তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। ইহাও সম্ভব নহে—কুরুকুলের জয় হইবে, কারণ তাহা কখনই হয় নাই পাণ্ডবের জয় অবশ্যম্ভাবী।

হাল ছাড়িলেই ডুবাইবে ইহা স্বতসিদ্ধ। দেখিতে দেখিতে বর্ষা গত হইয়া শরৎ আসিল। বিদায় লইয়া দেশে যাইবার ইচ্ছা হওয়ায় তাহা মন হইতে তিরোহিত করিলাম। মহাঅষ্টমী ৺কালীর বাবার উৎসব নিজ কুটিতে

সম্পন্ন করার মানসে ঝরিয়া অঞ্চলের ভ্রাতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই যোগদান করিলেন না, এমন কি মাননীয় অম্বিক ভায়াও তুচ্ছ করিয়া বাবার দেহে ফুল চন্দন দিতে আসিলেন না. সুতরাং একাকী যথাসাধ্য কার্য্য করিলাম। এই পাপীর প্রদত্ত ফুল চন্দন বাবা গ্রহণ করিলেন কি না তিনিই জানেন। স্ত্রীকে লইয়া বৈদ্যনাথে বাবার ধামে যাইবার আদেশ জন্য পরাৎপর ইষ্টদেব মহাশয়কে লিখিলাম। তিনি ৺রাসের সময়ে বাবার বাগানে ৺কাশীর বাবার মন্দির উৎসবের সময়ে স্ত্রীকে লইয়া যাইতে লিখিলেন। যথাসময়ে বাবা এ দাসকে উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে এ দেশস্থ ক্রিয়ান্বিতবর্গকে আমাকে প্রতিনিধি করিয়া কতকগুলি ছাপান নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিলেন। তদনুসারে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দত্ত, পাথরডিহির ষ্টেশন মাষ্টার অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ভূপাল বারারির ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়গণ আমার সহিত রাসের সময়ে বৈদ্যনাথ গমন করেন। বলা বাহুল্য পত্নীও আমার সহিত গমন করেন। ইহার সম্বন্ধে পরাৎপর বাবা একটি আশ্চর্য্য জনক বিভূতি আমাকে দেখান সে অতি অভাবনীয়।

যাহা হইক আমরা সকলে সন্ধ্যার গাড়িতে ৺বৈদ্যনাথ রওনা হইলাম পথে মহা আনন্দে আনন্দময়ের লীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতে লাগিলাম। দেওঘর যাইব, বৈদ্যনাথে গাড়ীতে উঠিলাম—উঠিয়া গাড়ীর মধ্যে দণ্ডায়মান ছিলাম ইত্যবসরে আমার কোটের পকেট হইতে একটী স্বর্ণ মোহর ও ৬টী টাকা অন্তর্হিত হইল বাবা ঐ মোহরটী গ্রহণ করিবেন না তজ্জন্য এইরূপ ঘটনা সংঘটন হইল প্রমাণ সত্ত্বেও গোলযোগে প্রবৃত্ত হইলাম না। কারণ তখন মন দৌড়াইয়াছে বাবার ধামে, কখন পৌঁছিব এই আগ্রহই তখন বলবৎ, সুতরাং উচ্চবাচ্য না করিয়া দেওঘর ষ্টেশনে আমরা অবতরণ করিলাম। পূর্ব্ব লিখিত মত নলডাঙ্গার বাবু গিরিজাভূষণ দেবরায় মহাশয় বাবার আদেশমত পাল্কি লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। স্ত্রীকে পাল্কিতে উঠাইয়া দিয়া আমরা মহা আনন্দে বাবার আনন্দ কুটীরে পদব্রজে যাইতে লাগিলাম।

পুরীধামে যাইতে যেমন পর্ব্ব উপলক্ষে যাত্রীর সমাগম হয়, তদ্রূপ ঐ গাড়ী হইতে অনেক ভ্রাতৃবৃন্দ অবতরণ করিয়া বাবার কুটিরাভিমুখে যাইতেছিলেন। শত শত পুণ্যবান ব্যক্তির সমভিব্যহারে আমরাও যাইতে লাগিলাম। পুষ্পবাটীর নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলাম, ব্রহ্মমুহূর্ত্তে যেমন শত শত সাধুর সমাবেশ যোগবলে দেখা যায়; পুরীধামের উষাকালের বিবরণ তদ্রূপ দৃষ্টিগোচর হইল। পুরীধামে যেমন একাকার পরিদৃশ্যমান হয় অর্থাৎ "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" বোধে সকলকে সমজ্ঞান করিয়া আলিঙ্গন ও কোলাকুলি হইয়া থাকে; ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই থাকিয়া শ্রীক্ষেত্রে মিলিত হইয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে ও ভ্রাতৃমিলনে তদ্রূপ হইতে লাগিল। সে দৃশ্য যিনি দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন—সে আনন্দে মিলিয়াছেন তিনি ভিন্ন উপলব্ধি করে কাহার সাধ্য। তথায় বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, উড়িয়া, পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, একত্রিত ভাব। তথায় কাহারও মলিনতা নাই, বিশেষতঃ নির্ম্মলের নিকট মলিনতা থাকিবে কি করিয়া।

অনেক পূর্ব্ব পরিচিত ভ্রাতৃবর্গের সহিত একত্রিত হইয়া সে আনন্দে ভ্রাতাগণ আত্মহারা হইতে লাগিলেন। আমার যে তাহা হয় নাই, এমত নহে, বরং তখন আনন্দে দিশেহারা হইতে লাগিলাম। বহুকাল পরে অর্থাৎ প্রায় দুই বৎসর পরে পরাৎপর বাবার আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্য ও পবিত্র হইলাম! স্ত্রীকে বাটীর মধ্যে লইয়া যাইলাম এবং পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীযুক্তা মাতাঠাকুরাণীর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া মনে শান্তি পাইলাম। বাগানে কত তাম্বু পড়িয়াছে এক এক বিভাগের ক্রিয়ান্বিতের জন্য স্থাপিত হইয়াছে। বহিঃপ্রাঙ্গণে সুবৃহৎ চন্দ্রাতপ পরিশোভিত হইয়াছে এবং নূতন মন্দির স্থাপিত ও সুসজ্জিত রহিয়াছে। বাগানের চতুর্দ্দিকে আলোকমালায় সুশোভিত রহিয়াছে, সে দৃশ্য অতি মনোহর। আমাদের সহিত বন্ধুবান্ধবের দেখা সাক্ষাৎ করিতে করিতে এবং হাস্য ও আনন্দচ্ছাস করিতে করিতে সূর্য্যদেব পূর্ব্ব গগনে দৃষ্টিগোচর হইলেন। তখন এই মনে হইতে লাগিল

আরও কিয়ৎকাল ব্রহ্মমুহূর্ত্ত থাকিলে বরং ভালই হইত, কারণ ঐ আনন্দ হইতে মন বঞ্চিত হইত না। কি ভাগ্য করিয়াছিলাম যে এমত দুর্লভ গুরু পাইয়াছিলাম, যাঁহার কৃপায় শত শত ভাগ্যবানগণের সহিত দর্শন লাভ ঘটিল। ভাগ্য বিধাতার নিকট এইরূপ ভাগ্যবানের সমাবেশ হওয়াই সম্ভব।

আরার এবং আলীপুরের ডেপুটী বাবুদ্বয় সপরিবারে পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত আলিঙ্গন করিবার সময়ে তাঁহার বিহ্বল হইয়া ভ্রাতৃ প্রেমে ডুবিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে সংযোগ করিয়া রাখিবার মানসে যেন ছাড়িতে চাহিলেন না। মুঙ্গেরের অধিকাংশ ভ্রাতাই আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের তাম্বুতে যাইয়া আনন্দে আলাপ করিয়া কত সুখানুভব করিলাম। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই তাহার উপর পথ ক্লেশ কিছুই মনে আসিল না। পরাৎপর বাবাকে প্রথম দর্শনেই নিবেদন করিয়াছিলাম যে, প্রাতেই যেন আমার স্ত্রীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ক্রিয়াদান করেন। বাবা তদুত্তরে এ দাসকে কহিলেন—মধ্যাহ্ন কালীন নূতন মন্দিরের কার্য্যান্তে উপদেশ দিবেন। ওদিকে আমার স্ত্রীও তাঁহার শ্রীচরণে বারম্বার উপদেশ পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। যাহা হউক, সে অনেক রহস্য। এগার ঘটিকার সময়ে তাহার জন্ম সার্থক হইল, বাবা এ সংবাদ এ দাসকে জ্ঞাপন করিলেন; সকলই তাঁহার লীলা।

ক্রমে আমারা হস্ত-মুখ প্রক্ষালন মানসে নদীতটে শত শত ভাই গমন করিলাম। কত দিক হইতে বনের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া ধর্ম্ম সঙ্গীতের রবে নদী তীরস্থ অরণ্যকে যেন ঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল। মুঙ্গেরের মাননীয় স্বরূপদাস বাবাজী নদীতটে আসিয়া সককেকে আলিঙ্গন, করিয়া আনন্দিত হইলেন। অনেক পরিচিত ভাই বন্ধু অনেক দিবস পরে সম্মিলন সে এক মধুর ভাব। তাম্বুতে তাম্বুতে ধর্ম্ম কথা—বাবার কথা ভিন্ন অন্য কথা শ্রুতিগোচর হইল না। ভাবময় গুরু বিশ্বেশ্বর যেন সকল মায়িক জীবের জীবভাব ভুলাইয়া সকলকে একভাবে—মহাভাবে পতিত করিয়াছেন, সকলেই স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ও সংসার ভুলিয়াছিল—ভাবের হিল্লোলে সকলেই মগ্ন। স্নান অন্তে উপর্য্যুপরি তৃতীয়

ব্যয়ে সকল ব্রাহ্মণ ও ক্রিয়ান্বিতের ভোজন চব্য-চষ্য-লেহ্য-পেয় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। আমার ন্যায় সকল কার্য্যে অদক্ষ ব্যক্তিও বাবার কৃপায় অসীম বল প্রাপ্ত হইয়া রাত্র ৬টা পর্য্যন্ত পরিবেশন করিতে সক্ষম হওয়া বাবা প্রদত্ত বল ভিন্ন আর কি অনুমিত হইতে পারে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফকির ও গরীবদিগকে পয়সা বিতরণ করা হইল। রাত্র আন্দাজ আট ঘটিকার সময়ে বাবার সহিত আমরা সকলেই প্রসাদ পাইলাম। বাহান্ন বিঘা স্থানের নাম, তজ্জন্য বাবা বাহান্ন প্রকার ভোগের আয়োজন করিয়াছিলেন, সে অতি উপাদেয়। রাত্রি দশ ঘটিকার সময়ে আতস বাজি পোড়ান হয়, বেলা এগার বার ঘটিকার সময়ে দলে দলে ক্রিয়ান্বিতগণ পশ্চিম এবং পূর্ব্বদিকের বাষ্পীয় শকটে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ধ্যার মধ্যে অনেক ক্রিয়ান্বিত আপন আপন স্থানে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। আমরা ঐ রাত্রে তথায় অবস্থিতি করিয়া পরদিবস আনন্দভোগ করিয়া রাত্রির গাড়ীতে ঝরিয়া প্রত্যাগমনের অভিলাষী হইলাম এবং রাত্রে ধর্ম্ম-সঙ্গীত কয়েক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাবার সমক্ষে গীত হয়। আবার যে তিমিরে, সেই তিমিরে পতিত হইবার জন্য মন উদ্যত হইল। কিন্তু মহানন্দে দুই দিন কাটিল—কোন সময়ে দিবা কোন সময়ে রাত্র আসিল—যাইল বোধগম্য নাই, বরং এই মনে অনেকেরই বোধ হয় হইতেছিল, সময় যেন না যায়, এ আনন্দে মগ্নভাব যেন নষ্ট না হয়, এ অমৃত সমুদ্রে যেন আর তুফান না উঠে। হায় জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, দেখিতে দেখিতে সব গত হয়, কিছুই থাকে না, কিন্তু স্থিরে লক্ষ্য পূর্ণভাবে থাকিলে, গত আগত উপলব্ধি হইতে পারে না। এ মহাবাক্য বাবার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি হৃদয়ঙ্গম তাঁহার কৃপায় হইল না, যদি মধুর অমৃত ভাব হৃদয়ে জাগরূক থাকিত তবে কেন এত আক্ষেপ হইবে? তাহা হইলে এই বিমল আনন্দভাব গত হইবে কেন?

বাবা দয়া করিয়া ক্ষণেকের জন্য, দুই দিবসের জন্য ক্রিয়ান্বিত মায়িক জীবকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন সে সময়ে স্নেহ মায়া কিছুই আসিতে পারে

নাই। এ ভাব স্থায়ী হইলে কোন জীবই সে স্থান হইতে আসিতে পারে না, বাবার শ্রীচরণে পতিত থাকিতে হয়, তাহা হইলে মায়ক জীবের সংসার আশ্রম নষ্ট হইয়া যায়, এই-কারণেই বাবার অনিচ্ছার ইচ্ছায় মোহ ও মায়া আসিয়া হৃদয় আক্রান্ত হইল। তখন মায়িক জীব পরমানন্দ সুখ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী পুত্রের দিকে ছুটিল,—মনের জয় হইল। জামালপুরের পণ্ডিত মহাশয়, ভাগলপুরের রমেশ বাবু এবং আমরা-সকলে একত্রে বাবার চরণ ধুলি গ্রহণ করিয়া বাহির হইলাম। বাবা আমার ন্যায় মহাপাপীর মস্তকে পদরজ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, আবার তাঁহারই বলে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলাম। তাঁহার পদ যুগল ক্রিয়ান্বিত মাত্রেই প্রতিদিন নিজ নিজ মস্তকে ধারণ করেন তবে কৃপণতাও করেন সত্য, কিন্তু পদ দুইটী মস্তকে ধারণ করিতে অস্বীকৃত হইবার যো নাই, তবে কেন বাহিরে এ ভাব। এ সম্বন্ধে ঝরিয়া আসিয়া লিখিয়াছিলাম।

যাহা হউক আমরা পথে বাবার গুণানুবাদ করিতে করিতে যাত্রা করিলাম এবং নির্বিঘ্নে সকলে আপন আপন বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। মন মোহ অন্ধকারে ডুবিল সেই জন্যই উপরে উল্লেখ করিয়াছি "যে তিমিরে আবার সেই তিমিরে" পতিত হইল। বারারি আসিয়া রাস উপলক্ষে বারোয়ারিতে মগ্ন হইলাম। নিবৃত্ত মার্গ হইতে প্রবৃত্তি মার্গের চরম সীমায় উপস্থিত, মন এখন ভাবশূন্য হইয়া ঘোরতর অভাবে রাজ্য বিস্তার করিল। ধুমধামের সহিত মথুর সাহার যাত্রা, বাই, খ্যামটার আমোদে আমরা সকলেই ডুবিলাম; বাইনাচে বাই বৃদ্ধি হইল। অনেক কোলিয়ারির বাবু ও সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইল, তিন দিবস অনেক বাবু ভায়াকে জলপান করান হইল। হায়, কয়েক দিবস পূর্ব্বে কি পবিত্র বিমলভাবে মন আপ্লুত ছিল, এখানে আসিয়া তাহার বিপরীতভাবে মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল।

এক ভাব মায়িক জীব উপভোগ করিতে ভাল বাসে না, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মন দৌড়াইয়া অভাবে হাবুডুবু খায়, ইহাই মনের ধর্ম্ম। আবার অভাবে

স্বভাব নষ্ট হয় ইহাও মহাজনের বাক্য। মন যাহা চাহে তাহা না হইলে জীবদেহে রাজত্ব করিবে কি করিয়া। যাহা হউক এই বারোয়ারির বাই ছুটিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জ্যোতিষচন্দ্র পশু চিকিৎসা বিদ্যালয়ে জলপানি এবং মধ্যম পুত্র শ্রীমান গোপালচন্দ্র বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলেন, ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইলাম। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান রাধাগোবিন্দের উপনয়ন ১১ই মাঘ বলাগড়ের বাটীতে সম্পন্ন হয়। আমাদিগের যাওয়া ঘটিল না। শ্বশুর মহাশয়ের অধিক বয়ঃক্রম হওয়ায় প্রযুক্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া বলাগড়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। স্ত্রী আত্মকার্য্য করিতেছেন, দর্শনাদি একরূপ মন্দ হইতেছে না।

সন ১৩১৩ সালের রাসের সময় বারারি কুঠিতে বারোয়ারি পূজা গত হইল। অনর্থক আমোদ আহ্লাদে মাতিয়া আত্মহত্যা হইল। এই সময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রবৃন্দ ঝরিয়া অঞ্চলে খাতের কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য আগমন করেন তাঁহাদিগের সহিত কলেজের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার গুপ্ত আগমন করেন। ইনি লোধনা কুঠিরের প্রধান সারভেয়ার শ্রীযুক্ত বাবু মণীন্দ্রচন্দ্র কাননগুইয়ের পরিচিত পূর্ব্ব হইতেই ছিলেন। হেমন্তবাবু মণীন্দ্র বাবুর নিকট আমার বিষয় অবগত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ মানসে একদিন সন্ধ্যার সময়ে হেমন্তবাবু, মণীন্দ্রবাবু, এবং তিসরা কুটির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারি শ্রীযুক্ত বাবু পরেশনাথ ভট্টাচার্য্যসহ আমার বাসায় আগমন করেন। হেমন্ত বাবু শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোক হইলেও জ্ঞানী এবং ধর্ম্মপরায়ণ এবং আত্মধর্ম্ম গ্রহণে বিশেষ আগ্রহান্বিত। আমার সহিত আত্মধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক তর্ক মীমাংসা অন্তে, ক্রিয়া লইবার জন্য বিশেষ উৎসাহিত হওয়ায়, আত্মকর্ম্মের উপদেশ পাইবার অনুমতি প্রার্থনা করায় বাবার আত্মশক্তির বলে বলীয়ান হইয়া তাঁহাকে এবং উল্লিখিত পরেশ বাবুকে ক্রিয়া দিতে ইচ্ছুক হইলাম। তাঁহারা উভয়ে পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে আমার কুটিরে আসিয়া আত্মকর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হন।

হেমন্তবাবু বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে ছাত্রবৃন্দসহ কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন। উক্ত হেমন্তবাবু হ্যাট্‌কোট্‌ধারী হইলেও পরম বৈষ্ণব ছিলেন, মৎস মাংস পূর্ব্ব হইতেই বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বগ্রামে ভাঙ্গনঘাটে বারোয়ারি পূজা উপলক্ষে বলী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বাবার অপার মহিমাবলে উক্ত দুইটী ভ্রাতা আত্মদর্শনে মুগ্ধ হইয়া ক্রিয়ার উন্নতি সাধনে তৎপর ছিলেন। এই ঘটনার দুই তিন মাস পরে, অর্থাৎ সন ১৩১৩ সালের ফাল্গুন মাসে ঝরিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথমে ৺বৈদ্যনাথে পরাৎপর বাবার শ্রীচরণ দর্শন করিতে এবং আত্মকর্ম্মের উপদেশ লইতে গমন করেন। বাবা তাঁহাকে এই অধম মহাপাপীর নিকট আসিয়া ক্রিয়া লইতে আদেশ করায় মর্ম্মাহত হইয়া বাধ্য হইয়া আমার সহিত দেখা করেন এবং উপদেশ এইখানেই পাইবেন বাবা আমার মুখ দিয়াই বলান। কিন্তু যে পর্য্যন্ত "ধর্ম্ম ও পূজাদি মীমাংসা" গ্রন্থ কলিকাতা হইতে না আনান, তাবৎ ক্রিয়া পাইবেন না এই ব্যক্ত করান।

ইহার ক্রিয়া পাইবার পূর্ব্বে আমার "হৃদদেশে" এক প্রকার কিরূপ অনুভূত হওয়ায় পরাৎপর বাবার শ্রীচরণ দর্শনার্থ ৺বৈদ্যনাথে গমন করি। ৺বৈদ্যনাথে পরাৎপর বাবার ধামে যাইয়া পরাৎপরের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া তৃপ্ত হই। এই সময়ে তাঁহাকে শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসু হই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি মলিন মনের মানুষ এবং তাঁহার একান্ত ইচ্ছা আপনার নিকট আত্মকর্ম্মের উপদেশ পাইয়া মহাতৃপ্ত হন এইরূপ মনের বাসনা, তাঁহাকে বঞ্চিত করিলে ঐ ব্যক্তির দুর্ব্বল হৃদয়বশত অপরের নিকট ক্রিয়া লইতে মনের বাসনা পূর্ণ হয় না। বাবা শ্রীমুখে ব্যক্ত করেন যাহা করা হয় মঙ্গলের জন্য, আমি নিরস্ত হইলাম। আমি যে দিবস ৺বৈদ্যনাথ গমন করি, ঐ দিবস অপরাহ্নে তাঁহার আদেশ মত ৺বৈদ্যনাথ ত্যাগ করি। এখানে আসিয়া সংসার মায়ায় স্ত্রীপুত্রের প্রলোভনে মত্ত হইলাম। আমার প্রত্যাগমনের কয়েক দিবস পরে ঝরিয়ার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ

মুখোপাধ্যায় বারারিতে ক্রিয়া পান। এই ঘটনার ৭।৮ দিন পরে বৈদ্যনাথের পিতৃব্য যিনি ঝরিয়া রাজবাটীতে পাচকের কার্য্য করিতেন একদিন আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং উপদেশ প্রার্থনা করিয়া রোদন করিতে থাকেন। তাঁহার নাম শ্রীরামবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়। ২।৪ দিবস পরে ক্রিয়া পান।

এই সময়ে আমার বাসাবাটীর উত্তরোস্থিত কুঠির, সাভেয়ার বাবুর বাসা, তথায় প্রতি রবিবারে ৺গীতা চর্চ্চা হইত। তদুপলক্ষে ঝরিয়ার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ এবং রামবিষ্ণু মুখোপাধ্যায় লোধনার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ কাননগুই ভ্রাতা এবং পরেশনাথ ভট্টাচার্য্য ক্রিয়ান্বিতগণ আগমন করিতেন। গীতা পাঠ অন্তে রাত্র ৭।৮টার সময়ে আপন আপন বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিতেন। এক দিবস ঝরিয়া নিবাসী নীচ বংশজাত কাঙ্গাল কৈরি আমার চিকিৎসালয়ে আমার নিকট আগমন করিয়া ক্রিয়া প্রার্থনা করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন ইহার বিষয় পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথের নিকট শ্রুত ছিলাম, ইনি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মে উন্মত্ত। নিচবংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও এবং লেখাপড়া বোধ না থাকিলেও সাধু সন্ন্যাসী: ভক্ত ছিলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে ইনি কোন সাধুর নিকট হঠযোগের কঠোর উপদেশ পাইয়া তাহা সাধন করিয়া মুখ হইতে রক্তস্রাব হওয়া সত্ত্বেও ঐ কার্য্যেই মুক্তি হইবে এই ধারণায় ঐ কার্য্য ত্যাগ না করিয়া প্রাণ সংশয় কার্য্য করিতে একান্ত অনুরক্ত। তাঁহার আত্মীয়স্বজন ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করেন।

ইত্যাবসরে ঝরিয়ার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ প্রমুখ সংবাদ শ্রুত হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়া আত্মকার্য্য পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি বাবার আদেশ লইয়া তাঁহাকে আত্ম কার্য্যের উপদেশ প্রদান করি। ইনিও প্রতি রবিবারে গীতা সভায় আসিতে থাকেন। সন ১৩২৪ সালের বৈশাখ মাসে এক রবিবারে ঝরিয়া বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রীধরচন্দ্র সূত্রধর ইনি বৈদ্যনাথের ভগ্নীপতি, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় ২।৪ দিবস পরে ক্রিয়া পান। ইনি

জ্ঞানবান; ক্রিয়া পাইয়া ধন্য হয়েন বাবার লীলা বুঝে কাহার সাধ্য, দেখিতে দেখিতে এ প্রদেশে এ দেশীয় কতকগুলি জীবের মঙ্গলের জন্য দৃষ্টিপাত করেন।

এ দেশীয় ব্রাহ্মণবর্গ কদাকার আচরণে অত্যন্ত, প্রত্যেক শুভকার্য্য অর্থাৎ অন্নপ্রাসন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যে যাঁহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাসি হত্যা না করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করেন না, তাঁহাদের সমাজে এ রোগে লোক কাতর হইতেছেন কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন। যাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এ প্রদেশে আসিয়া ইতর জাতির কদাচার সংশোধন করিবার জন্য রাজাগণ কর্ত্তৃক আনিত হয়েন তাঁহারা আসিয়া এ দেশীয় ইতর জাতির উদ্ধার করিতে গিয়া নিজেরাই তদ্ভাবাপন্ন আচার ব্যবহার অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশীয়গণ বাবার কৃপায় নিজেদের উদ্ধার সাধনে তৎপর একি কম আনন্দের কথা। এখনও শ্রীহট্ট প্রভৃতি প্রদেশে নীচ জাতি উন্নতিকল্পে বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ যাইয়া নীচ জাতির উন্নতি সাধন করিতেছেন। এই সময়ে ঝরিয়া নিবাসী শ্রীকুঞ্জবিহারী মিশ্র এবং ঝরিয়া রাজবাটীর আমলা শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ সিং ক্রিয়া পান। এই বারারি কয়লা কুঠির সারভেয়ার লোধনা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ কাননগুই ক্রিয়া পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁহাকে আত্ম কার্য্যের উপদেশ দান করি। ভাগা রেল ষ্টেশনের সহকারী ওজন বাবু শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায় এবং ভজুতি ষ্টেশনের তাঁর বাবু শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ রায় ক্রিয়া প্রাপ্ত হয়েন। ভজুতি ষ্টেশনের প্রধান ওজন বাবু ৺বৈদ্যনাথ হইতে সপরিবারে ক্রিয়া লইয়া আইসেন। এই সময় হইতে প্রতি রবিবারে সর্ব্বস্থানের ক্রিয়াবানগণ বারারি আসিতে লাগিলেন এবং গীতার চর্চ্চা হইতে লাগিল। উল্লিখিত ক্রিয়ান্বিতগণ ক্রমে ক্রমে আত্মকার্য্য করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন। এই সনের ভাদ্র মাসে কতকগুলি গীত রচনা করি, তাহা ভক্তি সঙ্গীত নামে পৃথক পুস্তকে হইয়াছে।

এই ভাদ্র মাসে দুইবার জ্বরে পড়ি। ৭ বৎসর জ্বর হয় নাই সম্ভবত

ক্রিয়ার শৈথিল্যে এবং কর্ম্মফলের ভোগ ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। ৺পূজার সময়ে বলাগড়ে ১২ দিনের ছুটীতে যাওয়া হইল তথায় শ্রীমান জ্যোতিষচন্দ্র, গোপালচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্রের মুখাবলোকন করিয়া এবং প্রাণাধিকা কন্যা রাণীকে দেখিয়া দুর্ব্বল হৃদয় সবল হইল। গত বৈশাখ মাসে আমি শ্রীমান জ্যোতিষচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে বলাগড়ে ১২ দিবসের জন্য আসিয়া বড় আনন্দ ভোগ করিয়া গিয়াছি। নদীয়া জেলান্তর্গত জুনেদার জমিদার শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পঞ্চম কন্যা শ্রীমতি বীণাপানি দেবীর সহিত শ্রীমানের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহাতে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩০০৲ টাকা বর পক্ষে প্রদান করেন, তন্মধ্য হইতে প্রায় হাজার টাকার গহনা আমরা পুত্রবধূকে গড়াইয়া দিই এবং বৌভাতে বলাগড়ের বাঁড়ুয্যেপাড়া ব্যতীত সমস্ত গ্রামীয় ব্রাহ্মণবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং সাধ্যমত তাঁহাদিগকে আহার করান হয়। বলাগড়ের কয়েকজন আত্মীয়সহ বর লইয়া জুনেদায় যাওয়া হয়, মহা আনন্দে তথায় বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। সংসার আশ্রমে সে আনন্দে কয়েক দিবস মাতিয়া ছিলাম।

এবার শরীর অসুস্থ হওয়ায় নিরানন্দে বলাগড় গমন করি ১২ দিবস তথায় অতিবাহিত করিলাম সত্য, কিন্তু পুনরায় তথায় এক দিন জ্বর দেখা দিল, জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম পুত্র আমাকে যত্নের ত্রুটি করে নাই। ছেলেরা জ্ঞানবান হইয়াছে, তাহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হওয়ায় আমার সেবার ত্রুটি করে নাই; ইহাও আমার মহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ কি? পরাৎপর বাবার মহাবিভূতি প্রকাশ সে অতি আশ্চর্য্য। তাঁহার কৃপায় তাঁহার ব্যবস্থা মত ঔষধি সেবন করিয়া জ্বর এবং উপসর্গ হইতে পরিত্রাণ পাই। সেফালিকার পাতা ৭টী, গোলমরিচ ৪টী বাটিয়া প্রাতে সেবন বিধি তাহার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে অর্দ্ধ ছটাক শ্বেতবর্ণ গোবৎসের মূত্র সেবন করি এবং বৈকালে অর্দ্ধ ছটাক থানকুড়ি গাছের পাতার রস; এই তিন প্রকার ঔষধি সেবন করিয়া ঐ ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাই।

বলাগড়ে শরীর দুর্ব্বল এবং অসুস্থ বিধায় সাত দিবসের ছুটী লই। ঐ ছুটী অন্তে ঝরিয়া আসিয়া বারারি খাদের আগুন লাগা সংবাদ পাই এবং ঝরিয়া হইতে প্রকাণ্ড অগ্নিশিখা প্রদর্শন করি। সে ভয়ানক দৃশ্য কখন দেখি নাই। এখানে আসিয়া বাবার ঔষধি সেবন করিতে করিতে আরোগ্য লাভ করি। অগ্রহায়ণ মাসে ঝরিয়ার প্রদেশস্থ ক্রিয়াবানদিগের অনুরোধে পরাৎপর বাবাকে ঝরিয়ায় পদার্পণ করিতে পত্র লিখি বাবা তাহার এই উত্তর প্রদান করেন এক সময়ে আসিবেন। ১৯১১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে মহামান্য ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ দিল্লীতে আসিয়া দরবার করেন। ৩০শে ডিসেম্বর মহামান্য ভারত সম্রাট কলিকাতায় আগমন করিয়া ৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৯১৫ খৃঃ শ্রীমান গোপালচন্দ্রের বিবাহ শীতকালে নির্দ্ধারিত হয়, তৎপূর্ব্বে একটা সামান্য কারণে বারারির সহকারী সাহেবের সহিত বচসা হয়। তিনি মদ্যপানাবস্থায় আমাকে দুই একটী কটু ভাষ্য প্রয়োগ করায় কার্য্যে এস্তাবা দিই। ঐ সাহেব আমার নিকট আসিয়া অশেষ প্রকার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও এবং জেনারেল ম্যানেজার এবং ম্যানেজার সাহেব আমাকে ভূয়োভূয়ো অনুরোধ করেন কার্য্য ত্যাগ করিবেন না, ঐ সাহেবকে রীতিমত দণ্ড দিতেছি মেমেরাও বারম্বার অনুরোধ করিতে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু চাকরীতে বিতৃষ্ণা হওয়ায় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করা একান্ত ইচ্ছুক থাকায় ঐ কার্য্য ত্যাগ করিয়া দেশে আসি। বড় সাহেব আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করেন, অনেকগুলি টাকা প্রভিডেণ্ড ফণ্ড হইতে দিয়া দেন এবং উপযুক্ত প্রশংসা পত্র প্রদান করেন শ্রীমান গোপালের বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া সর্ব্বসমেত দেশে আসিয়া নূতন বাটীতে বাস করিতে থাকি এবং গোপালের বিবাহান্তে কিছু দিনের জন্য ভুনান বারারি কুঠিতে সোত্তর টাকা বেতনে নিযুক্ত হই। সাহেবটী বড়ই মদ্যপানাসক্ত এবং তাঁহার বাবুটীর চরিত্র ভাল নহে, মন ঐরূপ স্থানে থাকিতে চাহিল না, দেশে আসিয়া বাটীতে চিকিৎসালয় খুলিয়া চিকিৎসা ব্যবসা করিতে লাগিলাম।

শ্রীমান জ্যোতিষচন্দ্র পশু বিদ্যালয় হইতে প্রশংসার সহিত পূর্ব্বে পাশ করিয়াছিলেন, সরকারি কার্য্য করিতে লাগিলেন। বেহার প্রদেশে কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়া স্থায়ী কার্য্য না হওয়ায় এবং তাহার চাকরীর পক্ষে সাহেবের সহিত মনের মিল না হওয়ায় সরকারী কার্য্যটী যায়। পরে মধ্য-প্রদেশে এক বৎসরের অধিক কার্য্য করেন, তথায় স্থায়ী কার্য্য না হওয়ায় কার্য্যটী যায়। শ্রীমান জ্যোতিষের ক্রমে ক্রমে দুইটী কন্যা ও দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রথমে কন্যা হয় তাহার নাম গীতা, দ্বিতীয় ক্ষিতিশচন্দ্র পুত্র, তৃতীয় গৌরীবালা কন্যা, চতুর্থ জগদীশচন্দ্র পুত্র। শ্রীমান জ্যোতিষের সুর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র স্বরূপ সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে, ঐরূপ সুন্দর সন্তান তাহার পূর্ব্বে হয় নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় ছয় মাসে অকালে মনোহর পুষ্পটী শুষ্ক হইয়া যাইল, তাহাতে আমার মন মধ্যে কথঞ্চিত অশান্তির আবির্ভাব হয়।

শ্রীমান গোপালের দুইটী পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্র দুইটীর নাম শচীদুলাল ও নন্দদুলাল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দুইটী পুত্র ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ অতি সুন্দরী কন্যা ইন্দুবালা। শ্রীমান গোবিন্দের বিবাহ ১৯২১ খৃীঃ গুপ্তিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রভাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, আমার বাল্য বন্ধুর চতুর্থ কন্যার সহিত সম্পন্ন হয়। শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ কন্যা (ওরফে) রাণীর বিবাহ খুলনা জেলার অন্তর্গত নেহারপুর গ্রামে, শ্রীমান ভবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিরত্ন কাব্যতীর্থের সহিত সম্পন্ন হয়। জামাতাটী স্বনামধন্য কর্ম্মবীর দেশের সৎকার্য্যে সদাই লিপ্ত এবং খুলনাবাসী সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। তিনি অনেকগুলি কার্য্য করিয়া থাকেন, একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, আরও কতকগুলি কার্য্য করিয়া থাকেন।

শ্রীমান গোপাল এম এ, পাশ করিয়া প্রথমে বলাগড় ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া স্কুলকে সজীব করিয়া মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গিপুর মহকুমা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। অবশেষে উপস্থিত তিনি আরা জেলান্তর্গত মহারাজা ডুমরাওনের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। শ্রীমান জ্যোতিষ কলিকাতা মিউনিসিপিলিটিতে ছয় মাস স্বাস্থ্য বিভাগে একশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে সুপারিটেণ্ডেণ্টের কার্য্য করেন, ঐ কার্য্য যাওয়ায় এক্ষণে দেশে দোকান খুলিয়া দোকানের উন্নতি সাধন করিয়াছিল। তিনটী সমবয়স্ক ভদ্রসন্তান মিলিয়া এই দোকান চালাইতেছিলেন। আমি গুরু প্রদর্শিত কার্য্য করিয়া দেশে ডাক্তারি ব্যবসায় জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছিলাম। নলডাঙ্গা ও ঝরিয়াতে বাবার আদেশ মতানুযায়ী কতকগুলি ভদ্র সন্তানকে উপদেশ দিয়াছি।

দাদু আমাকে ক্রিয়া দিবার জন্য জেদ করায় মার্চ্চ মাসে বেহার সরিফের ভ্রাতৃবৃন্দ যথেষ্ট খরচ করিয়া আমাকে তথায় লইয়া যান, তথায় দুই জন মোক্তার এবং দুইজন স্ত্রীলোক ক্রিয়া পান। আমাকে ভ্রাতাগণ রাজগিরি পাহাড়ে লইয়া যান, তাহা দেখিবার জিনিষ, তথায় বুদ্ধদেব অনেক দিন সাধন করেন, এই পাহাড় জরাসিন্ধু রাজার কারাগার ছিল, কয়েকটী গরম জলের ফোয়ারা দেখিলাম। গরম জল পড়িতেছে, তথায় স্নান করিলাম; পাহাড় কতকদূর বেড়াইয়া প্রত্যাগমন কালিন তথায় জৈনদিগের প্রকাণ্ড মন্দির স্বর্ণ রৌপ্য ঘটিত মহামূল্য জিনিষের দ্বারা রচিত সিংহাসন দেখিয়া বৈকালের গাড়ীতে বেহারে সকলের সহিত ফিরি। তৎপর দিন আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান গোপালের কর্ম্মস্থানে ডুমরাওয়ে একটী ভ্রাতাসহ গমন করি তথায় অনেক দেখিবার ছিল, ভোজপুর দেখিলাম বিক্রমাদিত্যের বংশ, ঐ বংশীয় এখানে আসিয়া বাস করেন উহাই পরিণামে ডোমরাও রাজ্যে পরিণত হয়। ইহার তিন শাখা, বক্সার, জগদীশপুর ও কুমারসিং অবস্থিতি করিতেন, পরিণামে সিপাহী বিদ্রোহে ধ্বংশ হয়। আমি বাইশ দিন ডুমরাওয়ে থাকিয়া দেওঘর ও রাণীগঞ্জ হইয়া বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করি।

দুই বৎসর হইল শ্রীমান প্রতাপ ভট্টাচার্য্য পরৈকোরা চট্টগ্রাম নিবাসী তাঁহার বাটীতে রাত্রি একটার সময়ে অগ্নি লাগে, যখন ঘরের উর্দ্ধ পর্য্যন্ত আগুন চারিদিকে ধরিয়া উঠিয়াছে সেই সময়ে অনেক লোক ঘরে অঘোর

নিদ্রায়। তথায় নাকি আমি ঐ ঘরের মধ্যস্থলে প্রতাপের মাতাকে, মা বলিয়া ডাকিতেছিলাম কেহ তাহা না শুনায়, আমি প্রতাপের মাতার মাথায় হস্তস্পর্শ করিয়া ডাকিতে লাগি, তাহার পরে তিনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া আমাকে ঘরের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান দেখিতে পান, আমি বলিলাম—ঘরের উর্দ্ধ পর্য্যন্ত আগুন ধরিয়াছে অথচ অনেকে ইহার ভিতর নিদ্রিত, উঠিয়া পালান, তাহারা উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। প্রতাপের মা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুইখানি পত্র আমাকে লিখেন "কি করিয়া আমাদের জীবনগুলি রক্ষা করিয়া গেলেন বাবা, আপনার কোন কষ্ট হয় নাই ত" ঐ পত্রে লিখিয়াছিলেন, আমি কিন্তু কিছুই জানিনা সকলই গুরুদেবের লীলা।

আনুমানিক ৪ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমান চুণীলাল সরকার ক্রিয়া পাইবার ১০ বৎসর পরে কলিকাতায় কাশীদত্ত ষ্ট্রীটস্থ তাহার বাসাভবনে সকাল নয় ঘটিকার সময় ক্রিয়ায় বসিয়া পঞ্চান্নটী প্রাণায়াম করিবার পর আমি তাহার বাম দিকে বসিয়া আছি, দেখিতে পায় এবং আমি নাকি তাহার প্রাণায়ামের বায়ু পরীক্ষা করিতেছিলাম ; তাহাও সে লক্ষ্য করিয়াছে, কি আশ্চর্য্যের বিষয় আমি কিন্তু জানিনা, সকলই বাবার খেলা ভিন্ন আর কিছুই নয়। শ্রীমান চুণীলাল সরকারের স্ত্রী, এই আত্মকর্ম্মের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, তাঁহার স্বামী তাঁহাকে ক্রিয়া লইবার কথা বলিলেই উভয়ে তুমুল ঝগড়া বাধিত। কিন্তু বাবার মহিমা বলে চুণীলালের স্ত্রী ক্রিয়া লইতে আসেন এবং ক্রিয়া কালীন আপন অন্তর মধ্যে বাবার মুর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হন ও ক্রিয়ায় আসক্ত হন। ক্রিয়া পাইবার আট মাস পরে, তিনি তাঁহার শ্বশুরালয়ে সন্ধ্যাকালীন ক্রিয়ায় বসিয়া পনের সোলটী প্রাণায়াম করিবার পর আমার মূর্ত্তি দেখিতে পান, যেন আমি তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার ক্রিয়া পরীক্ষা করিতেছি। কিন্তু আমাকে দেখিয়া তিনি ভয়ে চিৎকার করায় আমি অন্তঃধ্যান হই। এইরূপ দুই দিন সন্ধ্যা ক্রিয়াকালীন আমায় 'দেখেন' ও দুই দিনই চিৎকার করেন, ইহার পরে আর দেখিতে পান নাই। আমি কিন্তু কিছুই জানিনা, সবই তাঁহার খেলা।

তিন বৎসর পূর্ব্বে গিরিডির নলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতা লিখিতেছেন নলিনীর মাতা নলিনীর ছোট মেয়েটির জ্বর হওয়ায় রাত্রে তাহার মাথায় জলপটি দিতেছিলেন এবং ক্রিয়া করিতেছিলেন। ক্রিয়া করিতে করিতে দেখিতেছেন "আমি তাঁহার বুকের মাঝখানে কাণ দিয়া জপ দেখিতেছি তখন আমি তাঁহাকে বলিতেছি হাঁ মা টানাটা অমন হইতেছে কেন তোমার কি সর্দি হইয়াছে, নলিনের মা বলিতেছেন হাঁ বাবা এখান হইতে আপনি চলিয়া যাইবার পরে আমাদের সকলের অসুখ হয়েছিল। মা সেই জন্যই ত তোমাদের দেখতে এলাম। কেন মা আমার জন্য এত কাঁদ?—আমি যে তোমার পূরক রেচকের মধ্যে সর্ব্বদাই তোমার হৃদয়ে বর্ত্তমান আছি; তবে কেঁদে কষ্ট পাও কেন? এই ঘটনার এক মাস পূর্ব্বে নলিনীর মাতা ক্রিয়া করিতে সন্ধ্যা রাত্রে বসিয়াছেন তিনি দেখিতেছেন সম্মুখে কাশীর বাবা দক্ষিণে আমাদের বাবা বসিয়া আছেন এবং আমি নাকি কাশীর বাবার কাঁধে এক হাত এবং আমাদের বাবার কাঁধে অপর হাত দিয়া তাঁহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছি নলিনীর মাতা যতক্ষণ ক্রিয়া করিয়াছিলেন সেই রাত্রে ঐরূপ দেখিয়াছিলেন। তাহার পরে ক্রিয়ার সময় রাত্রে কয়েকদিন বরাবর কাশীর বাবা এবং আমাকে দেখিয়াছিলেন। যে দিন আমি তথা হইতে দেওঘরে যাই পনের মিনিট সন্ধ্যাকালে আমার কণ্ঠস্বর ও হাসির আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলেন। সকলই দয়াময়ের লীলা!

গত দুই বৎসর হইল চট্টগ্রামের প্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এখানে ক্রিয়া পান তৎপূর্ব্বে তিনি I. Sc. পাশ করিয়া Engineering Cellage শিবপুরে Mining পড়িয়া ধানবাদ 1st Class Mining Managership পরীক্ষা দুইবার দিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ঝরিয়ায় খদ্দর ফেরি করিয়া বেড়াইতেন। গত দুই বৎসর 1st Class Managership পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাকে জানান বাবা ভাল করিয়া পড়ি নাই সত্য তবে আমার মনে হইতেছে আপনার কৃপা হইলে পরীক্ষা দিয়া পাশ করিতে পারি, আপনি আমাকে

অভয় দেন। আমি By Inspiration দ্বারা বাবাকে জানাই তিনি আদেশ দেন পরীক্ষার সময়েও যদি দুই বেলা ক্রিয়া করিতে পারেন তবে ভাল ভাবে প্রফুল্লবাবু পাশ করিতে পারিবেন। সেই আদেশ সংবাদ তাঁহাকে জানাই কি আশ্চর্য্য প্রফুল্লবাবু পরীক্ষা দেন, ১৬ জনের মধ্যে তিনি প্রথমস্থান অধিকার করিয়া পাশ করেন আর ৩টী ইংরেজ দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ হন। প্রফুল্লবাবু উচ্চ আশায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Vice Chancler এর নিকট আবেদনে Estate Scholarship Anual Rs. 2000 পান এবং একটী Science Association Rs. 500 England Burming Ham যাইবার জন্য পাথেয় প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে কলিকাতা হইতে আমাকে লেখেন যে বাবা আমি Mining Collageএ পড়িতে Burming Ham যাইতেছি সত্য কিন্তু আমি গোমাংস গ্রহণ করিব না। আমি ঐ পত্রের উত্তরে গুরুদেবের আভাষ মতে যাহা প্রফুল্লকে লিখি তাহার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে দিলাম যথা—"প্রফুল্ল, তুমি ক্রিয়া লইবার সময়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে? মাংস, ডিম পেঁয়াজ খাইব না এখন বিলাতে যাইতেছ যাহাদের সহিত একত্রে বসবাস করিতে হইবে মাংস না খাইয়া যদি Vegitable খাইতে পার তবে তথায় ক্রিয়া সাত্বিক কর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। দেখ শরীরের মধ্যে তিনটী গুণ আছে তাহা সত্ব, রজ ও তম। সত্বগুণ বিভীষণ অর্থাৎ যাহার মনের ভীষণ অবস্থা কাটিয়া গিয়া স্থির মন প্রাণে তন্ময়ভাবে অর্থাৎ রামগত প্রাণ অর্থাৎ যিনি স্থির মন প্রাণে আছেন তিনিই বিভীষণ। রাবণ রজগুণ যাহার অহঙ্কার দর্প অঙ্গের ভূষণ বোধ হয়, কামনা পরতন্ত্র মনের এত বড় দাম্ভিকতা যে আমার নিকট ঈশ্বর কি, ঈশ্বর নাই, আমিই ঈশ্বর আমি সকল করিতে সক্ষম যাহা রাবণের ছিল, রাবণ তাহার মন্ত্রী মুখসারনকে বলিয়াছিলেন আমি ত্রিলোক বিজয়ী, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল আমার অধিকৃত। মন্ত্রী! তুমি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ও যম, ইহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া লঙ্কাপুরীতে নীচ কার্য্যে নিয়োগ কর। সেই অহঙ্কারী মানবদিগের সংশ্রবে প্রফুল্ল

তোমাকে থাকিতে হইবে তাহাদের তড়িৎ অহরহ গ্রহণ করিতে হইবে তাহাতে তোমার সাত্ত্বিক কার্য্য বন্ধ হইতে পারে, সুতরাং ক্রিয়ার বিঘ্ন নিষ্কাম কর্ম্মের বিঘ্ন হইয়া কামনা পরতন্ত্র হইবে।

তাহার পরে তমগুণ—যাহার মন নাভির নিম্নে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত স্থানে থাকে তাহাকে তমগুণাবলম্বি কহে। কুম্ভকর্ণের প্রিয় ছিল সকল প্রকার মাংস মদ্য ও স্ত্রীলোক উপভোগ, ইহাদিগের ব্যবহারে উপভোগে অহোরাত্র নিদ্রাভিভূত থাকিত। রাবণ রজগুণজাত কাম রিপুর প্রাধান্য দিন দিন নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা একে একে কামনা সকল নিপাৎ হইতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎ অর্থাৎ প্রধান ইন্দ্রিয় ধ্বংস সাধন হইল। তখন রাবণ মন্ত্রীকে বলিলেন,—দেখ মন্ত্রী লঙ্কা বীরশূন্য হইল, একমাত্র আমার মধ্যম ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, তিনি মোহনিদ্রায় শায়িত তাহার নিদ্রাভঙ্গ কর; মন্ত্রী বলিলেন,— মহারাজ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে তাহার উপভোগ জন্য স্তূপাকারে নানা প্রকার মাংস, হাঁড়া হাঁড়া মদ্য এবং অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোক তাঁহার উপভোগের জন্য রাখিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে হয়, সে সকল জোগাড় করি তাহার পরে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করা দরকার, নচেৎ সর্ব্বনাশ হইবে। এখন বুঝিলে প্রফুল্ল তোমাকে বিলাতে সেই কুম্ভকর্ণের আচরণ করিতে হইবে, রাবণ অহঙ্কার এবং কুম্ভকর্ণ মোহ। ইহাদের সংশ্রবে থাকিলে তোমা দ্বারা কি সাত্ত্বিক কর্ম্ম নিষ্কাম ক্রিয়া করা কি সম্ভব হইবে।" তাহার উত্তরে প্রফুল্ল বলেন,—বাবা বিলাত হইতে আসিয়া ভ্রাতাগণকে দেখাইব আমি ধর্ম্ম হইতে কর্ম্ম বর্জ্জিত হই নাই। আমি সন্দেহ করিয়াছিলাম, যদিচ তাহার দুই তিনখানি পত্র বিলাত হইতে পাইয়াছি তাহাতে লিখিয়াছিলেন বার্ম্মিংহাম ভীষণ ঠাণ্ডা স্থান প্রতিদিন বরফ পড়ে তজ্জন্য ডাক্তারগণ বলেন মাংস আহার না করিলে শীত সহ্য করিতে পারিবে না।

আমাদের দেশে রাবণ কুম্ভকর্ণের অভাব নাই বিভীষণ কম দেখিবেন।

পরাৎপর ইষ্টদেবের দেহত্যাগের পূর্ব্বে আমাকে ক্রিয়া প্রচারের সম্পূর্ণ

ভার অর্পণ করিয়া যান। তাঁহার আদেশ মত তাঁহার ক্রিয়া দান করিয়া যাইতেছি। আবার তাঁহার কৃপায় দুই চারি জন ক্রিয়ান্বিত স্থির বায়ুর ক্রিয়াও পাইযাছেন। তাঁহা ভিন্ন গুরু কেহ নাই এবং তাঁহা ভিন্ন কুটস্থ দর্শন করান কাহারও সাধ্য নাই। তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অনেক প্রমাণ দ্বারা তাঁহার সূক্ষ্ম দেহের কার্য্য দেখা যায়, তাহা নিজ বোধরূপ। পরাৎপর ইষ্টদেবের অস্তিত্ব যখন তখন আমি উপলব্ধি করি, যখন তিনি আমাকে দেহত্যাগ অন্তে সপ্তম ক্রিয়া বলাগড়ে আমার ছোট বৈঠকখানায় আসিয়া দিয়া যান, তখনই বলিয়াছিলেন এই সহস্রার ক্রিয়া উদ্‌যাপন হইলে আমাকে অহঃরাত্র হৃদয় গুহা দেখিতে পাইবে, তাহার ফলেই ক্রিয়ান্বিত এবং ক্রিয়ান্বিতাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিয়া নারায়ণের প্রকৃতি সংযুক্ত অখণ্ড মণ্ডলাকার অরূপের রূপ দর্শন করাইতে সক্ষম হইবে তখন "আত্মাই গুরুরেক"ও অনুভূতি হইবে। সুতরাং পাঠক বিশ্বাস করুন আমি কখনই গুরু হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দিই নাই এবং এই দেহ থাকাতক এই নিয়মেই চলিব। গুরু বাবার দেহত্যাগের পরে তিনবার চটগ্রামে ভ্রাতাগণ খরচ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং তথায় বিস্তর পণ্ডিত ও শিক্ষিত লোক ক্রিয়া পাইয়াছেন। একজন জ্ঞানি আচার্য্য আমার জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করেন। আমার বাল্য জীবন হইতে বৃদ্ধ জীবনের ঘটনা ধারাবাহিকভাবে মিল হইয়াছে। কিন্তু ঐ পত্রিকাতে আমার আয়ু ঠিক সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করিয়া অর্থাৎ সত্তর বৎসরে আমার শেষ হয় আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন। এই দিবসেই আমার মৃত্যু লিখিত আছে কিন্তু নিষ্কাম কার্য্য করায় এখন আমার বয়ঃক্রম চোয়াত্তর বৎসর দশ মাস। তবে জীবন মৃত অবস্থায় পতিত হইয়াছি নিজ বোধরূপ গুরুদেব আর কতদিন রাখিবেন তিনিই বলিতে পারেন, বেহার প্রদেশে দুই তিন বার গমন করিয়া উচ্চ সম্ভ্রান্ত স্ত্রীপুরুষ অনেককে বাবার ক্রিয়াদান করিয়াছি। উড়িষ্যাদেশের ব্রাহ্মন বংশীয় স্ত্রীপুরুষ এখানে থাকিয়া উপদেশ লইয়া গিয়াছেন।

১৯২১ খ্রীঃ হইতে আমি বরাবর বলাগড়ে চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া

আসিতেছি। গুরুদেবের আদেশ মত ক্রিয়া প্রচার কার্য্যেও ব্রতি আছি। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জ্যোতিশ বলাগড়ের দোকানের কার্য্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শোদপুরে পিজরাপোলের ডাক্তারের কার্য্য পাইয়া তথায় থাকেন। কাঁচড়াপাড়া হইতে রাত্রের গাড়ীতে শোধপুর আসিবার সময়ে বর্ষাকাল বাসায় যাইতে রেল গাড়ীতে কাটা যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, সকলই অদৃষ্টের লিখন। ক্রিয়া বিতৃষ্ণাই মৃত্যুর কারণ, এমন কি ক্রিয়াবানেরা যাঁহারা আমার নিকট আসিতেন, তাঁহাদিগকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন; ইষ্টদেব ইঁহাকে নিষ্কাম কার্য্যের ক্রিয়া দিয়াছিলেন। বড় হইলে তাহায় হতশ্রদ্ধা এমন কি তাঁহার মাতুলকে পর্য্যন্ত বলেন ইহাতে কিছুই হয় না, অথচ কোন দিনই উপাসনায় বসিতেন না। এইরূপে নিষ্কাম কর্ম্মের বিতৃষ্ণাই অকাল মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুকালে তাঁহার কূটস্থ দর্শন লাভ হওয়ায়, পরধামে মঙ্গল হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। আমরা বলাগড়ে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসা কালিন দেওঘরে পরাৎপর ইষ্টদেব দেহত্যাগ করেন। তাহা বার বৎসর গত হইয়াছে। দেহ ত্যাগের পরে পরাৎপর ইষ্টদেব আমাকে দুই তিনটী স্থির বায়ুর কার্য্য দিয়াছিলেন ইহা সহজ বোধরূপ। পরাৎপর ইষ্টদেবের দেহত্যাগের পরে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ কন্যার পীড়া কালীন প্রার্থনায়, ঐ পৌত্রির শয্যায় বসিয়া তাহার মেরুদণ্ডে হাত বুলাইতে দেখা গিয়াছিল। এক সময় আমার কন্যার সাংঘাতিক পীড়া কালিন গুরুবাবাকে কন্যার শয্যায় বসিয়া থাকিতে আমার পত্নী দেখিয়াছিলেন, আমার স্ত্রীকে মেয়েটীর জীবনের ভয় নাই সংকেত করিয়া অদৃশ্য হইয়া যান। দেহ ত্যাগের পরে অনেক সময়ে তাঁহাকে শুক্ল শরীরে দেখিয়াছি; কল্পনা নহে। আমার ভ্রূর মধ্যস্থানে সদাই বিরাজ করিতেছেন। তিনি ব্যতিত কেহ জ্ঞান চক্ষু দান করিতে পারেন না ইহা আমার বিশ্বাস।

সমাপ্ত

আধ্যাত্মিক মহাভারত
ও
শারীরিক বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম

শ্রীঈশানীতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

৺মহাষ্টমী ২৯শে আশ্বিন
১৩৪১ সাল।

সংক্ষিপ্ত

আধ্যাত্মিক মহাভারত

অন্তর্লক্ষ্যের অর্থ

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ, অর্থাৎ প্রবৃত্তি-পক্ষের সহিত নিবৃত্তি-পক্ষের সংগ্রাম। ইহাই মহাভারত।

প্রবৃত্তি পক্ষ—প্রবৃত্তিসূচক মন ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন এবং আরও ৯৯ জন, মোট ১০০ পুত্র,—ইহার কাম রিপু। মায়িক জীবকে দশ দিক বেষ্টিত করিয়া আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে এবং ইহাদের প্রতাপে জীবকে ন্যায় অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত করাইয়া মহা-অশান্তি প্রদান করিতেছে। ধৃতরাষ্ট্র প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হইতে উৎপন্ন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ,—অর্থাৎ মনও অন্ধ। মনের ধর্ম্ম সকল বিষয় গ্রহণ করে মাত্র, কিন্তু ঐ জিনিষের উপলব্ধি করিবার শক্তি না থাকায় বুদ্ধিকে উহা প্রদান করিলে বুদ্ধির সাহায্যে ঐ জিনিষের জ্ঞান জন্মে।

দুর্য্যোধনাদি একশত ভ্রাতা ভোগীকান্ত বায়ু। যিনি একাকীই একশত ভাগে বিভক্ত ও বিভিন্ন রূপ কামনায় প্রতাপান্বিত। দুর্য্যোধনই শ্রেষ্ঠ, ধৃতরাষ্ট্রের অতি প্রিয় অর্থাৎ মনের প্রিয় হইতেছেন কামনা, কারণ মন দেহরাজ্যে কামনা শূন্য হইয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইলেও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধনও রাজ উপাধিতে ভূষিত। ইনি যখন যাহা করিয়াছেন, ইহার পিতা তাহাই অনুমোদন করিয়াছেন। এদিকে মনরাজ্যের ইনিই প্রধান সেনাপতি। ইহার ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য অর্থাৎ হিংসা।

এই পাঁচটি ইঁহার সহকারী-সেনাপতি রূপে জীবের দেহক্ষেত্রে অতুলনীয় প্রতাপে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। কারণ দুর্য্যোধন-রূপী কাম রিপুর অস্তিত্বে জীবের প্রতি ইহাদের অসহনীয় আক্রমণ। সে আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করা অসম্ভব। তবে ইহাদিগকে বিনাশ করিবার পূর্ব্বে ইহাদের রাজা দুর্য্যোধনকে বিনাশ বা তেজহীন করিতে পারিলে ইহারাও তেজহীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

কামনারূপী দুর্য্যোধন, দশ ইন্দ্রিয় এবং দশ ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি এবং আসুরিক সম্পদ বিশিষ্ট বিস্তর সেনার অধিপতি হইয়া দেহরাজ্য শাসন করিতেছেন। দশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়গুলি যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক ; মুখ, হস্ত, পদ, গুহ্য এবং লিঙ্গ ; দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রান, আস্বাদন এবং স্পর্শন ; চলন, ধারণ, আহার গ্রহণ, বায়ু-মলত্যাগ এবং মুত্রত্যাগ ও মৈথুন এই কুড়ি সৈন্যের সহিত অসংখ্য আসুরিক সম্পদ বিশিষ্ট সেনা মিলিত হইয়া ব্যূহ রচনা করিয়া, পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে অহরহ প্রস্তুত। তৎপূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্যের নিকট পাণ্ডব ও কুরুগণ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। তবে কুরুগণ অপেক্ষা পাণ্ডবগণ যুদ্ধ বিদ্যায় অধিক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে কুরুগণ পাণ্ডবগণকে অতিশয় হিংসার চক্ষে অবলোকন করিতেন। ভীম পবন পুত্র (আত্মানাং জায়তে পুত্র) সুতরাং ভীম পবনস্বরূপ বলবান ছিলেন ; তাহা উপলব্ধি করিয়া হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া ভীমকে নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে বিষ দান, এমন কি, অগ্নিতে দাহ করিয়া মারিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু নিবৃত্তি পক্ষ পঞ্চ পাণ্ডব ধর্ম্মপরায়ণ বিধায় শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অব্যাহতি লাভ করেন। তৎপরে প্রচ্ছন্নভাবে পঞ্চ পাণ্ডব কুন্তীসহ বন গমন করেন।

পাঞ্চাল দেশে ইন্দ্রের পুত্র, যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন

যুদ্ধবিদ্যায় দ্রোণাচার্য্যের নিকট লক্ষ্যভেদ কার্য্যে দক্ষ হওয়ায়; সকল রাজাগণকে পরাস্ত করিয়া লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রুপদ রাজকন্যাকে পঞ্চ ভ্রাতা একত্রে বিবাহ করেন। ইহাতে ইহারা দ্রৌপদী, অর্থাৎ অন্তর্যামিত্ব শক্তি প্রাপ্ত হন। পঞ্চ পাণ্ডব নিবৃত্তি-পক্ষ ধর্ম্মাক্রান্ত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির যিনি ধর্ম্ম পুত্র, মধ্যম ভীম পবন পুত্র, প্রাণস্বরূপ মহা বলবান। অর্জ্জুন ইন্দ্র পুত্র তৃতীয় পাণ্ডব, ইনি ধনুর্বিদ্যায়—শর চালনায় মহাযোদ্ধা। নকুল, সহদেব, অশ্বিনীকুমার হইতে উৎপত্তি—ইহারাও যুদ্ধ বিশারদ। এই পঞ্চ পাণ্ডব শরীরের পঞ্চতত্ত্ব, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। মাটি, জল, তেজ, বায়ু এবং শূন্য।

দেখুন, এই পাঁচটি উপাদানে শরীর গঠিত হইয়াছে। ঈড়া, পিঙ্গলা, চঞ্চল বায়ুর বলে বলীয়ান হইয়া ধৃতরাষ্ট্র অর্থাৎ মন ও কামনারূপী দুর্য্যোধন আসুরিক সম্পদে বলীয়ান হইয়া পাঁচটি সহকারী সেনাপতি,—ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য অর্থাৎ হিংসার সাহায্যে নিবৃত্তি পক্ষীয় পঞ্চ পাণ্ডবকে—ধর্ম্ম-পরায়ণদিগকে কি অত্যাচার না করিতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণ নীরবে অত্যাচার সহ্য করিতেছেন, আত্মীয় বিধায়। কিন্তু ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে।

পাণ্ডবগণের সহায়, দৈবীসম্পদ বিশিষ্ট সেনাগণ; যথা—অভয় বা ভয়শূন্যতা বা চিত্ত প্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানের উপায়ে নিষ্ঠা, আত্ম কর্ম্মে নিষ্ঠা; দান অর্থাৎ সাত্ত্বিক দান, ইন্দ্রিয় সংযম, প্রাণযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা। কারণ প্রাণযজ্ঞ ব্যতীত অপর যজ্ঞ সকল বাহ্যিক যজ্ঞ, আত্মধ্যান, তপস্যা বা তপোলোকে থাকা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত কর্ম্ম, শান্তি অর্থাৎ কর্ম্মের অতীত অবস্থায় স্থিতিরূপ অবস্থা, খলতা শূন্যতা অর্থাৎ অক্রুর-ভাব, সর্ব্বভূতে দয়া, লোভ শূন্যতা, অহঙ্কার রাহিত্য, কুকর্ম্ম প্রবৃত্তিতে লজ্জা, চাপল্য শূন্যতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, এবং

আপনাকে অতি পূজ্য বলিয়া যে অভিমান তাহার অভাব। এই সকল পাণ্ডবদিগের দৈবী সম্পদ বিশিষ্ট সৈন্য, ইহাদের বলে বলীয়ান হইয়া প্রবৃত্তি পক্ষের নেতা দুর্য্যোধনের সকল অত্যাচার সহ্য করিতেছিলেন।

দুর্য্যোধন-রূপী কামরিপু ঈড়া পিঙ্গলার চঞ্চল বায়ুর বলে প্রতাপান্বিত ও হতজ্ঞান হইয়া পঞ্চ পাণ্ডবকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু দুর্য্যোধন ইহা বুঝিতেছেন না, শরীরের আধার পঞ্চতত্ত্বের বিনাশে প্রবৃত্তি পক্ষীয়গণ কোথায় অবস্থিতি করিবেন। প্রবৃত্তির জ্ঞান-শূন্যতার পরাকাষ্ঠা প্রতীয়মান হয় না কি?

ধৃতরাষ্ট্র দেখিলেন উভয় পক্ষীয় অর্থাৎ কুরু ও পাণ্ডব ভ্রাতাগণের অহোরাত্র বিবাদ ভাল নহে, তজ্জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে—যুধিষ্ঠির বড় বিধায়—রাজধানীতে রাজা করিলেন। তথায় তিনি সুন্দর রাজসভা নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। (ইন্দ্র = মন, প্রস্থে = প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি অভিপ্রায়ে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে মনের স্থিতি উদ্দেশ্যে, তথায় জ্যোতির্ম্ময় সভায় বিরাজ করিতে লাগিলেন,) এবং দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতাগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে নিমন্ত্রণ করিলেন। দুর্য্যোধন, ভ্রাতাসহ তথায় গমন করিয়া পাণ্ডবগণের সভা এবং ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলা করিতে আমন্ত্রণ করেন। পাণ্ডবগণ তিন গুণের অধীন, তজ্জন্য মন, গুণে থাকায় ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার পাশা খেলায় কামনার কৌশলে পণে হারিয়া যান এবং বনে গমন করেন। দুর্য্যোধন কামরিপু, তাহার শক্তি ও উদ্ধত ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য অর্থাৎ হিংসা ইহাদের প্রলোভনে পাণ্ডব পক্ষ জর্জ্জরিত।

দ্রৌপদী অর্থাৎ অন্তর্যামিত্ব শক্তিকে কামনা আশ্রিত চঞ্চল বায়ুর প্রতাপে হরণ করিবার প্রকরণ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ; তাহা স্থির বায়ু শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে নিবারণ হয়। তাহার পরে পাণ্ডবগণের

বন্ গমন বানপ্রস্থ কথিত হয়। বানপ্রস্থ অবস্থায় অর্জ্জুনের নানাপ্রকার যোগ-ক্রিয়ার কৌশল লাভ হয়।

পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য গুরুর নিকট অস্ত্ররূপ কৌশল অর্জ্জুন শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং আত্মরাজ্য লাভের জন্য জেদ হয়। তজ্জন্য দৈবী সম্পদে ভূষিত হইয়াছিলেন, এবং আজ্ঞাচক্রে অবস্থিতির জন্য উৎ-যোগ পর্ব্ব অর্থাৎ উপরে অবস্থিতির আয়োজন, তাহাই উদ্‌যোগ পর্ব্ব বলিয়া অভিহিত হয়। দেহরাজ্যে প্রবৃত্তি-সূচক মনের অধীনে ছয়টি রিপুর প্রাধান্য উপলব্ধি করিয়া, নিবৃত্তি-পক্ষ অর্থাৎ পঞ্চ পাণ্ডব নিরুদ্বেগে সাধন সমর করিয়া আজ্ঞাচক্রস্থিত ব্রহ্মযোনীতে শর (আত্মস্বরূপ বানলিঙ্গ প্রাণ) নিম্ন হইতে আজ্ঞাচক্রে মিলিত করিতে পারিবে কিনা, এই সন্দেহে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে প্রবৃত্তি-পক্ষের সেনাপতি দুর্য্যোধন সমীপে প্রেরণ করেন এবং বাচনিক বলিয়া দেন, "আমরা মহারাজ পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র, আমাদের পিতা এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহে অনেক দিন রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহান্তে আমাদের জ্যেষ্ঠতাত নামে মাত্র রাজা, কিন্তু দুর্য্যোধনই প্রকৃত পক্ষে রাজকার্য্যে দেহরাজ্য শাসন করিতেছেন। আমরা অর্দ্ধেক রাজ্যের ন্যায্য অধিকারী তাহা যখন দুর্য্যোধন দিতে অনিচ্ছুক, আর যুদ্ধে কাটাকাটি মারামারি করিতেও আমরা অনিচ্ছুক। তবে আমাদের পঞ্চ ভ্রাতা সস্ত্রীক থাকিবার জন্য আমরা কেবল পাঁচখানি গ্রাম চাহিতেছি, তাহা প্রাপ্ত হইলে এবং নিরুদ্বেগে বসবাস করিতে পারিলে, আমরা যুদ্ধে আত্মীয় বধ করিতে অনিচ্ছুক।"

এই প্রস্তাবনা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের শিবিরে গমন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অভিমত প্রকাশ করিলে দুর্য্যোধন উত্তর করেন, বিনা যুদ্ধে সূচ্যাগ্র ভূমি প্রদান করিবেন না। ইহা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ঐ যে পাঁচখানি গ্রাম চাহিতেছেন তাহা দেহের সম্মুখেও নহে, দেহের পশ্চাতে

মেরুদণ্ডের পশ্চাতে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত এবং বিশুদ্ধাখ্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচখানি গ্রাম। মহারাজ যুধিষ্ঠির ইহাও বলিয়া দিয়াছেন ঐ পাঁচখানি গ্রাম ব্যতীত আমরা কুত্রাপি যাইব না। দুর্য্যোধন এই পাঁচখানি গ্রাম ব্যতীত সর্ব্বত্র শাসন করুন, আমাদের কোনই আপত্তি নাই। তাহাতেও দুর্য্যোধন সম্মত হইলেন না।

কি আশ্চর্য্য! যে দুর্য্যোধন সূতপুত্র কর্ণকে অঙ্গ, বঙ্গ, এবং কলিঙ্গ দেশ দিতে পারিলেন, তিনি কিনা অর্দ্ধেক রাজ্যের অধিকারী পঞ্চ পাণ্ডবকে কেবলমাত্র পাঁচখানি গ্রাম দিতে পারিলেন না। দুর্য্যোধন কি এতই নীচ ছিলেন যাঁহাকে সকলেই মানী দুর্য্যোধন বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

কেন তিনি এই ক্ষুদ্র পাঁচখানি গ্রাম দিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিলেন না, তাহার বিশিষ্ট কারণ এই,—দুর্য্যোধন ভাবিলেন, যদি পঞ্চপাণ্ডব মেরুদণ্ড মধ্যে দ্রৌপদীসহ বসবাস করেন; দ্রৌপদী অন্তর্য্যামিত্ব শক্তি। ভীম পবন পুত্র (আত্মানাং জায়তে পুত্র) সুতরাং মহাবলবান প্রাণ এবং অর্জ্জুন বহ্নিস্বরূপ শক্তিকে আশ্রয় করিয়া, ঐ পঞ্চগ্রামে যাতায়াতরূপ অর্থাৎ দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর নিকট যাতায়াত কর্ম্মকরেন এবং পাণ্ডব দিগের প্রধান সহায় কৃষ্ণচন্দ্র, যিনি তাহাদের নিকটবর্ত্তী আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত রহিয়াছেন, এই ৬টি স্থানে যাতায়াত-রূপ উঠা নামা কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। সুতরাং ৬টি চক্রই পাণ্ডবদের আয়ত্বাধীন হইয়া যে কার্য্য হইবে তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। ঐ নিষ্কামকর্ম্মের ফলে আমি দুর্য্যোধন-রূপী কামনার প্রতাপ বলহীন হইয়া ক্রমে ক্রমে আমার ধ্বংস সাধন হইবে কারণ আমার প্রতাপ তো ঈড়া পিঙ্গলার জোর মাত্র। ঐ নিষ্কাম কার্য্যদ্বারা স্থির প্রাণের উদ্ভবে উক্ত নাসিকা মধ্যস্থিত চঞ্চল বায়ুর গতিহীন হইলেই আমার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী এবং চঞ্চল প্রাণ হইতে আমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রের উৎপত্তি সুতরাং মন নির্ম্মল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দেহ মন কামনা শূন্য হইলে দেহরাজ্য ধ্বংস হইবে।

আমার প্রতাপ নষ্ট হইলে আমার যে পাঁচ জন সহকারী-সেনাপতি ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য অর্থাৎ হিংসা, যাহাদের সাহায্যে দেহরাজ্যে জীবকে মায়ায় আবদ্ধ করাইয়া রাজত্ব করিতেছি; ঐ জীব মায়া হইতে মুক্ত হইলে আত্মরাজ্য প্রাপ্তি সুগম হইবে। এইরূপ ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ঐ ৫ খানি গ্রাম পাণ্ডবগণের বাসের জন্য দেন নাই। দুর্য্যোধন ভাবিলেন, আমিতো বসবাসের জন্য ৫ খানি গ্রাম দিলাম না, তত্রাচ যদি উঁহারা জোর করিয়া ঐ পাঁচখানি গ্রাম অধিকার করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করে, ঐ প্রাণ কর্ম্ম করিবার সময়ে আমি এবং আমার সহকারী-সেনাপতি পঞ্চ-রিপু এবং আসুরিক সম্পদ বিশিষ্ট সেনাগণ, পাণ্ডবদিগের নিষ্কাম কর্ম্ম কালিন আমাদের বল প্রয়োগে তাঁহাদের সাধনে বিঘ্ন করিব, তাহা হইলে তাঁহাদের আত্মরাজ্য স্থাপন হইবেনা।

এই চিন্তা করিয়া, যাহা হইলে কামরূপ দুর্য্যোধনের মৃত্যু সংঘটন হইতে পারে, তাহা অনুমোদন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ঐ ৫ খানি গ্রাম— মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত এবং বিশুদ্ধাখ্য চক্রে বসবাস করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া সন্ধি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া দুর্য্যোধন এই সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়াছেন যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞাপন করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণ দৈবী-সম্পদ বিশিষ্ট সেনা-বূ্যহ রচনা করিয়া যুদ্ধসজ্জায় ব্রতী হইলেন অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্যরূপী কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাপ্তি মানস অর্থাৎ উৎযোগ; আজ্ঞাচক্রে প্রবৃত্তি-সূচক মনের স্থিতির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মরূপ সাধন সমরে ব্রতী হইলেন। গুরু প্রদর্শিত কৌশলরূপ অন্তর্মুখীন প্রাণায়ামরূপ সাধন সমর আরম্ভ করিলেন।

তাহা নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধন-রূপী কামনা উভয় পক্ষের গুরু-রূপী দ্রোণাচার্য্য অর্থাৎ জেদের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, গুরুদেব! আপনি আমাদের সেনাপতি এবং বিশারদ হইলেও আমি

দেখিতেছি আমাদের অর্থাৎ প্রবৃত্তি-পক্ষের সৈন্য নিবৃত্তি-পক্ষের সৈন্য অপেক্ষা অধিক হইলেও, নিবৃত্তি পক্ষে এই যুদ্ধে যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন তাহারা সকলেই বলশালী। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, যুধিষ্ঠির, কাশীরাজ=দীপ্তবান, সাত্যকি=সুমতি, বিরাট=যাহা অভিপ্রায় করে তাহা সমুদয় কূটস্থের সম্মুখে দেখায়, ধৃষ্টকেতু=স্বপ্রকাশ অনুভব, চেকিতান=ওঁকার ধ্বনি; যাহা শ্রবণে আমাদের সৈন্য হতজ্ঞান হইবে, শিখণ্ডি=শক্তির কর্ত্তৃত্ব-পদজ্ঞান, পুরুজিত=অবরোধ সামর্থ, কুন্তিভোজ=আনন্দ, শৈব্য=ব্রহ্মজ্ঞ, যুধামন্যু অর্থাৎ ক্রান্তি, অভিমন্যু অর্থাৎ মনোরথ ধরার পর হওয়া। শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শব্দ অর্থাৎ ভৃঙ্গ, বেণু, বীণ, ঘণ্টা এবং মেঘের শব্দ, যাহা শ্রবণ করিলে আমাদের চঞ্চল প্রাণের নিস্তব্ধ করণ হয়; সুঘোষ, মণি পুষ্পক অর্থাৎ বিমল শব্দ, অর্জ্জুনের গাণ্ডীবধনু, সুষুম্নার উত্থান মেরুদণ্ড হইতে গলার পশ্চাৎ ভাগ পর্য্যন্ত এবং ইহা ভিন্ন ত্রিবিংশ দৈবী সম্পদ সৈন্য সমবেত হইয়াছে।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, পাণ্ডবদের সৈন্য সংখ্যায় কম হইলেও প্রবৃত্তি-পক্ষীয় সৈন্যদিগকে পরাভব করিবার তাঁহাদের সামর্থ কম নহে। তবে যদি আপনারা ব্যূহ প্রবেশ দ্বারে ভীষ্মকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, তবে যুদ্ধে অর্থাৎ সাধন সমরে পাণ্ডবগণ ভীষ্ম-রূপী ভয় ও ভেদ জ্ঞানকে দেখিয়া অর্থাৎ পিতামহ এবং গুরু-রূপী দ্রোণাচার্য্য জেদকে যাহাদিগকে বরাবর মান্য ভক্তি করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে বিনাশ করিতে হইবে চিন্তা করিয়া যুদ্ধ করিতে অপারগ হইবে। যে পর্য্যন্ত ভয় নষ্ট না হইবে, তাহাদের মনে আমি-তুমি আত্মীয় স্বজনের মায়া দূরীভূত না হইবে, ভীষ্মবধ হইলে অর্থাৎ ভেদজ্ঞান নষ্ট হইলে সাধন সমরে আমাদিগকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া প্রবৃত্তি-পক্ষকে পরাজয় করিয়া দেহ রাজ্য ধ্বংস করিয়া আত্মরাজ্য স্থাপন অর্থাৎ

আজ্ঞা চক্রে প্রাণের স্থিতি করিলে ঈড়া পিঙ্গলারূপী চঞ্চল বায়ুর নাশ করিয়া সাধন সমরে জয়লাভ সুগম হইবে।

অতএব যাহাতে ভীষ্ম বধ না হয় প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। দেখুন, ভীম অর্থাৎ স্থির প্রাণ দেহকে রক্ষা করিতেছে, সুতরাং মহা বলবান এবং অর্জ্জুন তেজস্তত্ব, যাহার শক্তিতে তেজ সঞ্চার করিয়া দেহের জীবনী শক্তি দ্বারা, প্রাণের সহিত সংমিলিত হইয়া অন্তর্মুখীন প্রাণায়াম অর্থাৎ সাধন সমর করিতেছে, তাহার ফলে চঞ্চল প্রাণের স্থিরত্ব হয়, আমার পিতা মন এবং আমরা একশত ভ্রাতা ভোগীকান্ত বায়ু চঞ্চল প্রাণ হইতে উৎপন্ন। ভীম অর্জ্জুনের স্থির বায়ুর সাধনে আমাদের জীবের উপর যে প্রতাপ অক্ষুন্ন রহিয়াছে তাহা অর্থাৎ আমাদের আধিপত্য হীন হইবে এবং তৎসহ স্থির বায়ুর উদ্ভব হওয়ায় আমরা পিতা পুত্র দিন দিন দুর্ব্বল অবস্থা প্রাপ্ত হইব। সুতরাং পাণ্ডবগণ স্থির প্রাণের বলে বলীয়ান হইয়া পরিণামে আমাদের দেহরাজ্য ধ্বংস করিবে এবং আত্মরাজ্য স্থাপন করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে। তজ্জন্য বলিতেছি, যাহাতে পাণ্ডবগণের মনে ভয় নষ্ট না হয় তাহাই করুন, অর্থাৎ ভীষ্মকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া পাণ্ডবগণের মনে ভয় সঞ্চার করিয়া রাখুন। তাহা হইলে আর যুদ্ধে অগ্রসর হইবে না, অর্থাৎ সাধন-সমর করিবে না। এই কথা বলিয়া দুর্য্যোধন সমরে ব্রতী হইলেন, অর্থাৎ আসুরিক সম্পদে বিভূষিত হইয়া—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যকে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক ও পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়কে মিলন করাইয়া নিবৃত্তি-পক্ষকে আক্রমন করিলেন।

পাণ্ডব পক্ষের সেনাপতি গাণ্ডীব-ধারী অর্জ্জুন,—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং মনের শতপুত্র ও তাহাদের আত্মীয় স্বজনকে নিরীক্ষণ করিয়া, 'তাহাদিগকে এই যুদ্ধে নিধন করিতে হইবে' এই ভেদ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া অবসন্ন মনে সাধন সমর করিতে নিবৃত্ত হইলেন। পরে সাধনা

দ্বারা আত্মা-নারায়ণের দর্শন করিয়া তজ্জনিত তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রথম পূর্ব্ব সংস্কার বশে মায়িক জীবের এইরূপ বিষাদ হইয়া থাকে—যে ইন্দ্রিয়গণকে অর্থাৎ কামনার দ্বারা কত আনন্দ উপভোগ করিয়া সংসার ক্ষেত্রে সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়াছি এবং তাহার অধীনস্থ রিপুগণকে আশ্রয় করিয়া কত সুখে বিভোর ছিলাম। তাহাদিগকে এই সাধন-সমরে বিনাশ করিলে ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইয়া যাইবে এবং আমরা জড়ে পরিণত হইব। ইন্দ্রিয় বৃত্তিগণ ধ্বংস হইলে শরীর রক্ষা ও বংশ রক্ষার ব্যাঘাত ঘটিবে; তাহা হইলে আত্মরাজ্য পাইয়া আমাদের কি সুখ হইবে। এই ভাবিয়া গুরুজন ও আত্মীয় দিগকে বধ করিতে পারিব না চিন্তা করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া সাধন-সমর বন্ধ করিলেন।

কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের সাধন সুকৃতি বলে হয় এবং প্রাণায়াম ত্যাগ না করিয়া যথাযথ ভাবে করিয়া চলিলে মন উল্লাসিত হইয়া উৎসাহিত হয় এবং চঞ্চল প্রাণের স্থিরতা উপলব্ধি হওয়ায় সাধন-সমর বন্ধ করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু তাহা করিতে করিতে মনে ভয়ের সঞ্চার হয় অর্থাৎ ভীষ্মের আক্রমন উপলব্ধি হয়। প্রবৃত্তিপক্ষের কামনারূপ দুর্য্যোধন সাধন বিঘ্ন উদ্দেশ্যে নানারূপ বিভীষিকা হৃদয়ে প্রকাশ করে,—হয়ত এই ক্রিয়ার ফলে প্রাণের উল্টা গতিতে মৃত্যু হইবে। সাধন কালিন মনের প্রতারণায় ভয়ানক আকৃতির মূর্ত্তি হৃদয় পটে উদয় হয়, তাহাতে সাধক ভীত হয়, প্রকাণ্ড অস্বাভাবিক মুখ দেখিয়া আতঙ্কে অভিভূত হয়. সর্প প্রভৃতি আসনের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দৃষ্টিগোচর হয়। কখনও কখনও চক্ষু কটমট করিয়া পুচ্ছ আস্ফালন করিয়া ভয়ঙ্কর কেশর-যুক্ত সিংহ যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে অনুভূত হয়।

কখনও কখনও ভূতযোনী আকারে কাতারে কাতারে সম্মুখে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছে দৃষ্টিগোচর হয়।

কিন্তু যে সাধক গুরু আদেশ মত, শরে মন্ত্রপূত করিয়া কুটস্থে লক্ষ্য করিয়া অন্তর্মুখীন প্রাণায়াম করিতে পারেন, প্রাণমন চক্রছাড়া না করিয়া সমর করেন, তিনি ঐ সকল বিভীষিকা তুচ্ছ করিয়া অর্থাৎ ভীত না হইয়া, সাধন বন্ধ না করিয়া গুরুপদে মতি রাখিয়া সাধন-সমর হইতে বিচ্যুত হন না। তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম ত্যাগ না করায় আনন্দই পাইয়া থাকেন, হৃদয়ের ভয় অর্থাৎ ভীষ্মের আক্রমণকে তুচ্ছ করেন এবং আজ্ঞা চক্রস্থ কুটস্থ দর্শনে আনন্দ প্রাপ্ত হন। প্রাণায়াম-রূপ সমর করিয়া চঞ্চল প্রাণের স্থিরত্ব হইলে, কুটস্থে সম্মিলিত হওয়ায় সাধকের মনপ্রাণ এক হইয়া যায়, তৎকালিন সর্ব্বং ব্রহ্ম ময়ং জগৎ জ্ঞান হওয়ায় অদ্বৈত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং আমি, তুমি, আত্মীয়-স্বজন ভেদজ্ঞান নষ্ট হয়। সুতরাং তখন ভীষ্ম অর্থাৎ ভেদজ্ঞানের বিনাশ হয়; ইহাই ভীষ্ম বধ।

ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুর কথা শাস্ত্রে লিখিত আছে। ভীষ্ম প্রবৃত্তি পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রবৃত্তিপক্ষের অন্যায় সমরের জন্য অনেকবার ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন; কেহই সে কথায় কর্ণপাত না করায় ম্রিয়মান ছিলেন। তজ্জন্য আপনা হইতে অনিচ্ছার ইচ্ছায় অর্জ্জুনের শরে দেহরূপ রথ হইতে পতিত হন। যদি কাহারও ভয় হয়, তাহা হইলে অপরে কেহ ভীতব্যক্তির ভয় ভাঙ্গাইতে পারে না, আপনা হইতেই ভয় তিরোহিত হয়। ইনি ভীষ্ম-রূপী ভয়,—প্রবৃত্তি-পক্ষের প্রধান সেনাপতি—অর্জ্জুনের শরে নিপতিত হন।

দুর্যোধন দেখিলেন, পিতামহ ভীষ্ম যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন; তজ্জন্য দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন। দ্রোণাচার্য্য—ভেদ, কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের গুরু; সুতরাং উভয় পক্ষই ভেদের

শিষ্য। কুরুদিগের জেদ—প্রবৃত্তির আক্রমন দ্বারা নিবৃত্তি-পক্ষের পরাজয় করিব, আর নিবৃত্তি-পক্ষের জেদ নিষ্কাম-কর্ম্ম-রূপ সাধন-সমরে প্রবৃত্তি পক্ষকে পরাজিত করিয়া আত্মরাজ্য স্থাপন করিব।

দ্রোণাচার্য্য বলেন,—"কুরুদিগের মতাবলম্বী হইয়া, যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহাই চলুক।" "সাধন না করিয়া কুলগুরুর মন্ত্র জপ করিলেই হয়"—ইহাই দুর্য্যোধন ও তাহার ভ্রাতাগণের ইচ্ছা; দ্রোণাচার্য্যও সেই মত পোষণ করিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য ভাবিলেন না, শিশুকালে বালকগণ অ-আ-ক-খ আবৃত্তি করে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উর্দ্ধ শ্রেণীতে যখন বড় বড় গ্রন্থ পাঠ করে, তখন কি ঐরূপ বাল্যকালের স্বর-ব্যঞ্জন-বর্ণ আবৃত্তি করিয়া উচ্চ শ্রেণীতে পাঠের আবশ্যকতা হয়?

মুখে কুলগুরুর মন্ত্র আওড়াইলে কি তাহার ফলে উদ্ধার হয়? পিপাসায় কাতর হইয়া মুখে জল জল বলিয়া উচ্চারণ করিলে কোন ক্রমেই পিপাসার শান্তি হয় না, চীৎকার করায় আরও পিপাসা বৃদ্ধি হয়।

সুতরাং কুলগুরুর মন্ত্র উচ্চারণে এবং ঐ মন্ত্র পাঠ কালে মন বাহ্যবিষয়ে থাকায় অন্যান্য কার্য্যে মন যায়। মন সংযম না করিয়া মুখে মন্ত্র পাঠে কোনই ফল হয় না। কুলগুরুর বীজ মন্ত্রের অর্থ করিলে তাহাতে নিষ্কাম কর্ম্মের যোগ ক্রিয়া নিহিত আছে বুঝা যায়। সেই কার্য্যের গুরু অভাবে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম মেকিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা!

দ্রোণাচার্য্য কর্ণের পোষকতা করিয়া, ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্য্যোধনের এই অন্যায় সমরে কত বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন-রূপী কাম এবং মোহে আক্রান্ত হইয়া নিবৃত্তি-পক্ষের বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হয়েন। দ্রোণাচার্য্য প্রবৃত্তি পক্ষের আশ্রয়ে থাকায় এবং কামনা কর্ত্তৃক হতজ্ঞান হইয়া পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে জেদ বজায় রাখিবার জন্য যুদ্ধ করেন।

কিন্তু মনে মনে তিনি অর্জ্জুনকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তিনি যুদ্ধে বিশারদ থাকায় তাঁহার যুদ্ধে পাণ্ডবগণ অস্থির হইয়া পড়েন।

সমরে ক্লান্ত হইয়া অর্জ্জুন নিজ রথ হইতে নামিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হন এবং কাতরে তাঁহাকে মিনতি করিয়া তাঁহার অন্তর্দ্ধানের জন্য প্রার্থনা করেন। তখন গুরুর আদেশ মত একগুঁয়ে ভাবকে নষ্ট করিবার জন্য তাঁহার প্রণব ধনুতে আত্মা স্বরূপ শর যোজনা করিয়া, সাধনে চঞ্চল প্রাণের স্থিরত্ব-করণ কার্য্যদ্বারা জেদ বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

দ্রোণের যে কামনা প্রসূত জেদ ছিল, নিষ্কাম শরে দ্রোণাচার্য্যের জেদ অন্তর্দ্ধান হইল। দ্রোণাচার্য্য ভাবিলেন, নিবৃত্তি-পক্ষের অন্তর্মুখীন নিষ্কাম সমরে প্রবৃত্তি-পক্ষের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আমি কামনার বশে কতদিন থাকিতে পারিব? সুতরাং স্ব-ইচ্ছায় যাওয়াই প্রশস্ত। দ্রোণাচার্য্য নিজের পুত্র অশ্বত্থামার অলীক মৃত্যু সংবাদে মায়ার বশতাপন্ন হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ধনু-শর ত্যাগ করেন, সেই অবসরে অর্জ্জুনের গাণ্ডীব সংযোজিত শরে বিনাশ প্রাপ্ত হন।

দ্রোণাচার্য্য অর্থাৎ জেদকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া কাম-রূপী দুর্য্যোধন কর্ণকে সেনাপতি পদে বরণ করেন। কর্ণ=কানে শুনিয়া বিশ্বাস; সে বিশ্বাস কতদিন থাকিতে পারে। কর্ণের নিজের কোন ক্ষমতা নাই, প্রবৃত্তি-পক্ষের মনের সহায়ক মাত্র। তবে কানে শুনিয়া জগতে অনেকে অনেক কার্য্য করিয়া থকে। মন চঞ্চল বায়ু হইতে জাত সুতরাং কর্ণের নিজের ক্ষমতা নাই, কানে শুনিয়াই কোন কার্য্য করিতে চাহে। সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া যদি ঐ কার্য্য করিত তবে তাহার ফলে জগতে অনেক কার্য্য হইতে পারিত। ক্ষণভঙ্গুর বিধায় সে বিশ্বাস স্থায়ী হয় না; হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যে কার্য্য করা যায়, তাহাই স্থায়ী হয়।

মনে করুন, কোন ধর্ম্মপ্রাণ লোক কোন সাধু পুরুষের অনুসন্ধান পাইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য তাঁহার আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইল। ঐ সাধু-পুরুষ ঐ সময়ে তাঁহার আশ্রমে আছেন কিনা, দুই একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল। লোকগুলি বলিল, হাঁ মহাশয় তিনি এখন তাঁহার আশ্রমে আছেন। দেখিতেছি আপনি অনেক দূর হইতে আসিতেছেন, কিন্তু যাঁহার নিকট যাইতেছেন তাঁহার বিষয়ে সমস্ত অবগত আছেন ত? তিনিত একজন মস্তবড় বুজরুক, কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করিতেছেন তাহার ইয়ত্বা নাই।

আপনি এতদূর হইতে এত টাকা খরচ করিয়া আসিলেন এবং মনে বিশ্বাস করিয়া আসিলেন, আমাদের বলা অন্যায়,—তত্রাচ আপনার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি,—সে দিন মহাশয় আমরা তাঁহাকে মদ্যপানে উন্মত্ত অবস্থায় একটী বেশ্যালয় হইতে বাহির হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এই কথা শুনিয়া ঐ ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি ঐ সাধুর আশ্রমের নিকট আসিয়াও ফিরিয়া যাইলেন।

তজ্জন্য বলিতেছি, কাহারও কথা শুনিয়া যে বিশ্বাস হয় তাহা প্রায়ই মনে দৃঢ় হয় না। সুতরাং, ঐ কর্ণের ক্ষমতা কম নহে। তাহার কার্য্যে ন্যায় অন্যায় বিচার শূন্য হইয়া লোকে কার্য্য করিয়া থাকে, সেজন্য অনেক স্থলে অপদস্থও হয়।

যে পর্য্যন্ত মায়িক জীবের বিগত শ্বাস না হয়, তাবৎকাল নিজেকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। যখন প্রকৃত বিশ্বাস হইবে, সাধন-সমর দ্বারা দুই নাসিকার শ্বাস প্রশ্বাস বিনা অবরোধে স্থির হইবে, তখন সেই বি-শ্বাসে ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হওয়া যায়। যখন সে বিশ্বাস হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখন বিনা কর্ণের সাহায্যে প্রণব-ধ্বনি শ্রুতিগোচর অর্থাৎ অনুভূত হইবে।

সাধনরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের সমরে অর্জ্জুন-রূপ তেজস্তত্ত্ব অর্জ্জুন ও

প্রাণের স্থিতি-করণ কার্য্যে প্রবৃত্তিপক্ষের সেনাপতির বিনাশ সাধন হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ অন্তর্মুখীন প্রাণায়াম দ্বারা নাসিকার চঞ্চল প্রাণের গতিরোধ করিয়া বিগত-শ্বাস হয়, তাহার ফলে প্রবৃত্তি-পক্ষের যোদ্ধা কর্ণের বধ হয়।

ইহার পরে কামরূপী দুর্য্যোধন শল্যরাজকে সেনাপতি পদে বরণ করেন। শল্যরাজ নকুল সহদেবের মাতুল। তিনি নিবৃত্তি-পক্ষের সাহায্যার্থে আগমন করেন, কিন্তু কামনাক্রান্ত হইয়া প্রবৃত্তি-পক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশেষে যুধিষ্ঠিরের অর্থাৎ ব্যোমতত্ত্বের বাণাঘাতে বিনাশ প্রাপ্ত হন।

দুর্য্যোধন প্রায় সকল সেনাপতি বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, নিজেই সেনাপতি হইয়া তাঁহার আসুরিক সম্পদে বিভূষিত হইয়া; যথা,—দম্ভ, দর্প, অভিমান, অতি-পূজ্যত্বাভিমান, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, অহঙ্কার, ইচ্ছা, হিংসা, দ্বেষ, তৃষ্ণা, প্রভৃতি সম্পদে বিভূষিত হইয়া নিবৃত্তি-পক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

ইহাদিগের সাহায্যে জীবের দেব-ভাবকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। তমগুণ আলস্য, নিদ্রায় অভিভূত করাইয়া, আবদ্ধ করাইয়া কামনাক্রান্ত করে এবং নিষ্কাম ধর্ম্মে অনাস্থা জন্মাইয়া দিয়া থাকে।

দুর্য্যোধন-রূপী কামরিপু, ভীম-রূপী প্রাণ (যে রুদ্রাস্তে খলু প্রাণা * * *) প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। প্রাণের সাধনে অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্ম্ম-রূপ অন্তর্মুখীন প্রাণায়ামে (প্রাণের আয়াম অর্থাৎ বিস্তার হইয়া) সাধক প্রাণের স্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হন। তাহার ফলে চঞ্চল প্রাণ হইতে উৎপত্তি প্রবৃত্তি-সূচক মন এবং চঞ্চল প্রাণ হইতে জাত কামরিপু শতভাগে বিভক্ত হইয়া, সম্মুখে—কাম যিনি অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি তাঁহার চঞ্চল বায়ুর শক্তি দান করায় দশ ইন্দ্রিয় কার্য্য করিতেছে।

এখন বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, কামনা কত বলশালী হইয়া মায়িক জীবকে ধ্বংসের পথে ধাবিত করাইতেছে। এই দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে হীনবল করিয়া ধ্বংস করা সহজ সাধ্য কি ?

মহাভারতে দেখিবেন ভীমের অর্থাৎ প্রাণের কৌশলেই শতভাই-সহ দুর্য্যোধন নিহত হন। নিবৃত্তি-পক্ষের ভীম ভিন্ন আরও বড় বড় সেনাপতি ছিলেন। কাশীরাজ, বিরাট, সাত্যকি, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু ইত্যাদি অনেক সেনাপতি ছিলেন। কোন সেনাপতি কি দুর্য্যোধনের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও বিনাশ করিতে পারিলেন না?

অন্তর্লক্ষ্যে এই হৃদয়ঙ্গম হয়—কামরিপু একশত ভাগে বিভক্ত হইয়া মায়িক জীবের দশ দশ দিকে আক্রমণ করিয়া কার্য্য করায়, জীব সদা ব্যতিব্যস্ত হইতেছে। ইহাদিগের হস্ত হইতে মায়িক জীব ভীম অর্থাৎ প্রাণের সাহায্যে অন্তর্মুখীন প্রাণায়াম ব্যতীত নিস্তার পাইবার অন্য কোন উপায় নাই।

চণ্ডীতে রক্তবীজ বধের উপায় লিখিত আছে। রক্ত অর্থে অনুরক্ত অর্থাৎ আসক্তি, তাহাই কামরূপী দুর্য্যোধন, তাহাকে কি উপায়ে কালী-রূপী শক্তি বিনাশ করিয়াছিলেন। জীব মাত্রেই শিব ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রে লেখা আছে। প্রাণের সাধন মূলাধার হইতে বিশুদ্ধাখ্য-চক্র পর্য্যন্ত, যাহা রজঃ ও তমগুণের স্থান। কাম, রজতম-গুণ আশ্রয় করিয়া জীব হৃদয়ে বাস করে, ভীমরূপী নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থাৎ অন্তর্মুখীন প্রাণায়াম সাধনের ফলে মূলাধার হইতে বিশুদ্ধাখ্য-চক্র পর্য্যন্ত স্থিরকরণের সঙ্কেত—কালীর একপদ ঊরুর উপরে, ঊরু মূলাধারের অন্তর্গত (বৈজ্ঞানিক যোগ-ক্রিয়া দ্রষ্টব্য) কালীর অন্যপদ কণ্ঠদেশে সংলগ্ন দেখা যায়। অর্থাৎ জীবের চঞ্চল প্রাণ স্থির হইয়া যখন উভয় পদের মধ্যে চঞ্চল বায়ু অপসারিত করিয়া স্থিরত্ব

সম্পাদন করা যায় এবং জিহ্বাগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া তালু গহ্বরে রক্ষা করা যায়; ঐ প্রক্রিয়ার বিষয় কালীর জিহ্বা বাহিরে লম্বমান দেখান হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা বাহিরে নহে—ভিতরে। ভিতরে জিহ্বা রাখিলে লোকে বুঝিতে অক্ষম, তজ্জন্য বাহিরে লম্বমান দেখান হয়। তালু গহ্বরে জিহ্বা প্রবিষ্ট হইলে কামনার হ্রাস হয় সত্য, কিন্তু যে পর্য্যন্ত হৃদয়গ্রন্থি ভেদ না হয়, তাবৎ কামনার অসহনীয় প্রতাপ একেবারে নষ্ট হয় না। (সৎগুরু উপদেশ গম্য)

এখন পাঠক ভাবিয়া দেখুন,—কামরূপী দুর্য্যোধনের সহিত প্রতিদ্বন্দী রূপে ভীমরূপী প্রাণ যুদ্ধে ব্রতী হইলেন। ভীমের অস্ত্র প্রভঞ্জন-রূপ গদা; (চঞ্চল প্রাণের আধার নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থাৎ অন্তর্মুখীন প্রাণায়ামের ফলে স্থির প্রাণের উদ্ভব হয়, তাহার দ্বারা প্রবৃত্তি-সূচক মনের স্থির ভাব হয়।) কাম কণ্ঠের নিম্নে অবস্থিতি করে, সাধক প্রাণের গদাঘাত বারম্বার হৃদয়ে করিতে থাকে। [গুরু উপদেশ গম্য]

স্থিরবায়ু সাহায্যে বজ্র-স্বরূপ গদার আঘাতে ঈড়া পিঙ্গলার চঞ্চল বায়ুর প্রতাপে রজঃ তমগুণের উৎপত্তি। তাহার বলে বলীয়ান হইয়া জীব হৃদয়ের কামনায় জর্জ্জরিত ছিল; সুতরাং দুর্য্যোধনের যাহা কিছু শক্তি ঐ ঈড়া পিঙ্গলার চঞ্চল বায়ুর সঞ্চালন, ঐ দুইটি পদ ভীমের প্রভঞ্জন-রূপ গদার আঘাতে ভগ্ন হয়; ইহা প্রাণের স্থির ভাব হইতে উৎপত্তি।

সুতরাং ইড়া পিঙ্গলার চঞ্চল বায়ুর বিনা অবরোধে স্থির হয় তাহাতে দুর্য্যোধনের হৃদয়ে যন্ত্রনা ও পদদ্বয়ের অকর্ম্মণ্যতায় দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় লন, ঐ হ্রদ মেরুদণ্ডের মধ্যে সংশ্রিত, তাহাতে লুক্কায়িত হন। এতবড় যোদ্ধার এই দুর্দ্দশা শুনিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যাঁহার মান সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার, যাঁহার প্রভাবে জীব-জগৎ থরহরি কম্পমান,

যিনি ভূমণ্ডলের প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে বিরাজ-মান থাকিয়া নাকে রজ্জু লাগাইয়া জীব-জগতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন; তিনি কি না ভীমের গদাঘাতে ভূতলে পতিত হইলেন।

ঈড়া পিঙ্গলা নাসিকা ছিদ্রদ্বয়ের চঞ্চল বায়ুর প্রভাবে ন্যায় অন্যায় সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন। এখন ঐ পদদ্বয় অকর্ম্মণ্য হওয়ার সকল প্রতাপ হারাইলেন। ইহার পূর্ব্বে ভীমের অর্থাৎ অন্তর্ম্মুখীন প্রাণায়াম স্বরূপ প্রভঞ্জনের আঘাতে দুর্য্যোধনের অপর নিরানব্বই জন ভ্রাতা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

স্থির বায়ুই বিষ্ণু ("প্রাণঃ বিষ্ণু পিতামহ, প্রাণেন ধার্য্যতে জগৎ * *)।" সুতরাং ভীমরূপী প্রাণই সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশ; যে রুদ্রাস্তে খলুঃ প্রাণা—ইহা ঋষি বাক্য,—শাস্ত্রে লিখিত আছে। এই সংবাদ শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র রূপী অন্ধমন নিদারুণ যন্ত্রনায় কম্পমান হইয়া মূর্চ্ছিত হন।

কামরূপী দুর্য্যোধন সকাম কর্ম্মের ফলাকাঙ্খায় মোহিত করাইয়া, চঞ্চল বায়ুর সাহায্যে জগতের মায়িক জীবকে প্রতিমূহুর্ত্তে আয়ু ধ্বংস করিয়া কামনার আশ্রয়ে রাখিতেন। মায়িক জীব সংগুরু কৃপায় আত্মকর্ম্মের উপদেশ পাইয়া কামের সহচর মোহকে বিদূরিত করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের আশ্রয় লইয়া, ঐ কামনার প্রতাপকে নষ্ট করিয়া স্থির প্রাণে তন্ময় লইয়া, ভগবৎ ভাবাপন্ন হইতে পারেন। সাধক কামকে অর্দ্ধমৃত করিয়া রাখেন, তবে তখনও তাহার জীবন শেষ হয় নাই। শর-স্বরূপ প্রাণকে সাধন কৌশলে ব্রহ্মযোনীতে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতি করিতে পারিলে, সাধক ভগবানের অবস্থাপন্ন হইতে পারেন। এ সম্বন্ধে উপনিষদে একটী শ্লোক আছে,—"প্রণবো ধনু শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমূচ্যতে—" পূর্ব্বকালে সমস্ত ঋষিগণ ভগবান উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। যিনি সাধন-সময়ে বাণলিঙ্গ শিবকে

ব্রহ্মযোনী অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতি করিতে পারিয়াছিলেন, তিনিই ভগবান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কণ্ঠস্থিত ভোগীকান্ত বায়ুকে অর্থাৎ দুর্য্যোধনকে, স্থির বায়ু—যাহা সাধনের ফল, তাহার দ্বারা ধ্বংস করিবার উপায়ই, মন্ত্রপূত করিয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া বাণক্ষেপ করিতে হয়। (গুরু উপদেশ গম্য)

অশ্বথামা—দ্রোণপুত্র, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গে ভূতলে পতন নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন যুদ্ধশেষে দ্বৈপায়ন হ্রদমধ্যে যন্ত্রনায় কাতর হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া লুক্কায়িত ছিলেন। অশ্বথামা দুর্য্যোধনকে বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, মহারাজ, আমাকে ত কখনও এইযুদ্ধে সেনাপতি পদ দেন নাই, উত্থিত হইয়া আমাকে সেনাপতি পদে বরণ করুন, আমি অদ্য রাত্রেই পাণ্ডব শিবিরে গমন করিয়া আপনার চিরশত্রু পঞ্চ পাণ্ডবের মস্তক ছিন্ন করিয়া আপনাকে উপহার দিব। তাহা হইলে আপনার অসহনীয় জ্বালা নিবারণ হইবে। দেখুন, আমি আপনার গুরুপুত্র, আমার প্রতাপ পরীক্ষা করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি,—সে কার্য্য সাধনে বিঘ্ন হইবে না।

জলমধ্য হইতে অশ্বথামার এই আশ্বাস বাক্য শুনিয়া দুর্য্যোধনের হতাশ চিত্তের যন্ত্রনার কথঞ্চিৎ লাঘব হইল। তখন তিনি হ্রদ হইতে উঠিয়া আনন্দ চিত্তে হ্রদের বারি দ্বারা অশ্বথামাকে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন।

অশ্বথামা কল্পবৃক্ষ স্বরূপ, কল্পনা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে; পাণ্ডবগণের শিরচ্ছেদন করিবেন কল্পনা করিয়া, খড়্গ লইয়া পাণ্ডব শিবিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শিবির মধ্যে দ্রৌপদীর পুত্রগণ শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন, ইহারা দেখিতে ঠিক পঞ্চ পাণ্ডবের ন্যায়, অশ্বথামা অন্ধকারে শিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে

পঞ্চ পাণ্ডব কল্পনা করিয়া তাহাদের শিরচ্ছেদন করিলেন এবং উক্ত ছিন্নমুণ্ড হস্তে লইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঐ পাঁচটি মুণ্ড দুর্য্যোধনকে উপহার দিয়া আনন্দ চিত্তে কহিলেন,—"কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, এই পঞ্চ পাণ্ডবের মাথা লউন।" কিন্তু অশ্বত্থামার কি ভ্রম—ঐ দিবস যুদ্ধ অন্তে পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতায় মিলিয়া অন্যত্র গিয়াছিলেন। অশ্বত্থামা কল্পনায় কি সর্ব্বনাশ করিলেন।

মুণ্ডগুলি অন্ধকারে দৃষ্টিগোচর করিয়া দুর্য্যোধন অশ্বত্থামাকে কহিলেন,—"আমার প্রধান প্রতিদ্বন্দী ভীমের মস্তকটি দিন।" ঐ মস্তক পাইয়া মহানন্দে যেমন তিনি চূর্ণ করিলেন, তাহা সহজেই চূর্ণ হওয়ায় আর্ত্তনাদ করিয়া শোকে বিহ্বল হইলেন এবং অশ্বত্থামাকে বলিলেন,—"গুরুপুত্র, সর্ব্বনাশ করিলেন? পূর্ব্বেই আমার বংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আবার খুল্লতাতের বংশও ধ্বংস করিলেন? এখন বুঝিতে পারিতেছি এ পঞ্চমুণ্ড পাণ্ডবদিগের নহে, ইহা তাঁহাদের বংশধরদিগের।" "কি করিলেন, গুরুপুত্র?" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া জীবন শূন্য অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, হরিষে বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু হয়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, হরিষে বিষাদের অবস্থা কিরূপ? তাহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে, প্রথমে হরিষে অর্থাৎ আনন্দে দুর্য্যোধন রূপ কামনা উৎফুল্ল হন; তৎপরে যখন কামনার ধারণা হয়, ঐ মুণ্ডটি ভীমের নহে, তখন ভয়ানক বিষাদ হইল অর্থাৎ তখন আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল অর্থাৎ সুখ দুঃখ প্রবৃত্তি-সূচক মনের সমজ্ঞান হইল। ইহাতে সাধকের যখন এই অবস্থা হয়, সাধক মহা গরিব হইলেও হঠাৎ ধন প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হয় না এবং একমাত্র জ্ঞানবান পুত্রের নিধন সংবাদ শুনিয়াও কাতর হন না। অথচ সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্তভাবে যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকেন; ইহা নিজবোধ রূপ অবস্থা। মহা

মহা ঋষিগণ, ব্যাস বশিষ্ঠ যোগীগণ এবং জনক রাজা এইরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন।

দুর্য্যোধন-রূপ কামনার বিনাশে, তাহা হইতে উদ্ভূত ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য অর্থাৎ হিংসার বিনাশ সাধন হয়। দুর্য্যোধনের নিধনের পূর্ব্বে তাঁহার নিরানব্বই জন ভ্রাতা ভীমের প্রভঞ্জনস্বরূপ গদায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রক্ত বীজের অর্থাৎ আসক্তির ধ্বংস যেরূপ চঞ্চল বায়ুর অন্তর্দ্ধানে নিধন প্রাপ্ত হয়, কালী প্রতিমায় দেখান হয় তাহাই সংঘটন হইল। চণ্ডীতে রক্তবীজের এবং মহাভারতে দুর্য্যোধন-রূপী কামের বিনাশ একই ভাবাপন্ন। ইহার পরে সাধকের মন কামনা শূন্য হওয়ায় পবিত্র হইল।

প্রবৃত্তি-সূচক মনরূপী ধৃতরাষ্ট্র বীতরাগ প্রাপ্ত হইলেন। এত সাধের তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, যাহার মন্ত্রনায় মায়িক জীবের নাসিকায় রজ্জু সংলগ্ন করিয়া এবং প্রতি মূহুর্ত্তে জীবের আয়ু ধ্বংস করাইয়া এই বিশাল দেহরাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তাহার বিনাশে শোকমগ্ন হইলেন।

দুর্য্যোধনাদি একশত ভ্রাতার পত্নী-গণ স্বামীগণের মৃত্যু সংবাদে মহাশোকে বিভোর হইলেন। তাহা শ্রবণে ভগবান ব্যাসদেব তাঁহাদিগের ললাটে স্বামীগণের সূক্ষ্ম-দেহ যোগবল প্রভাবে প্রদর্শন করান এবং বুঝাইয়া দেন, তাঁহাদের বিনাশ হয় নাই—ভগবানে মিলিত হইয়া রহিয়াছেন। কুরুমহিলাগণ শ্রাদ্ধ অন্তে সহগামিনী হইলেন।

যাঁহারা সাধন সমরে জয়ী হন এবং ক্ষিতিতত্ত্ব অর্থাৎ মূলাধার গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া তথা হইতে স্থির বায়ুকে আজ্ঞাচক্রে নীত করেন অর্থাৎ "পিণ্ডং কুণ্ডলিনী শক্তি" উর্দ্ধে স্থিত হয়; শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিষ্ণু পাদ-পদ্মে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে অর্পণ করিলে, ঐ সাধকের উর্দ্ধতন এবং অধতন সপ্ত-পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হন। ঈড়া, পিঙ্গলা—রজঃ ও তমগুণ, যাহা উভয় নাসিকছিদ্র হইতে চঞ্চল বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহা সাধন

দ্বারা আজ্ঞাচক্রে স্থিত হইলে প্রবোধ রূপ পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। কামজ পুত্রের দ্বারা পিতা মাতার মুখে অগ্নি প্রদানে উদ্ধার হয় না, তাহা যদি হইত তাহা হইলে লোক সংখ্যা কেন বৃদ্ধি হইতেছে।

সৃষ্টিকৌশল হৃদয়ঙ্গম করিলে বুঝিতে পারা যায়, পিতার কূটস্থ হইতে একটু সূক্ষ্ম অংশ শুক্ররূপে—"শুক্র ধাতু ভবেৎ প্রাণঃ" সেই স্থির প্রাণ পিতার কূটস্থ হইতে শুক্রাকারে মাতৃ-জরায়ুতে সংস্থিত হয়; তজ্জন্য মাতাকে জায়া বলা হয় অর্থাৎ পিতাই পুত্ররূপে স্ত্রীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করেন। সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে, প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, পুনরায় ধার্ম্মিকগণ পুত্র কন্যা উৎপাদন করিতেন না। এখন দেশে নিষ্কাম ধর্ম্মের অবনতি হওয়ায় তাহা প্রতিপালিত হয় না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, "মাতৃগর্ভে যে মুহূর্ত্তে শিশু ভ্রূণরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রতিদিন জরায়ুতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহা কোন শক্তিতে?" তাহার উত্তর এই—তাহা স্থির প্রাণের সাহায্যে হয়, যাহা শুক্রের মধ্যে অবস্থিত ছিল। ঐ স্থির প্রাণ ভ্রূণের মেরুদণ্ডে ৬টি চক্রদ্বারা উর্দ্ধ নিম্ন ভাবে অর্থাৎ পূরক রেচক দ্বারা সঞ্চালিত হওয়ায়, মাতার শরীরস্থ রক্ত—যাহা ফুলের দ্বারা ভ্রূণ প্রাপ্ত হয়; তাহা মেরুদণ্ডস্থ স্থির প্রাণের সঞ্চালনে ভ্রূণের সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হওয়ায়, ভ্রূণ দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জরায়ু কোনে চঞ্চল বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ থাকে। ভ্রূণের নাসিকাছিদ্র হয় ও মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হইলেও, বাহিরের চঞ্চল বায়ুর অভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য বন্ধ থাকে। মেরুদণ্ডের মধ্যে সুষুম্না দ্বারা ভিতরে নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থাৎ স্থির প্রাণের কার্য্য বরাবরই হয়, ভ্রূণ মাতৃগর্ভে 'যোগে' তন্ময় হইয়া আনন্দে অতিবাহিত করে। তাই রামপ্রসাদ সেন লিখিয়া গিয়াছেন, "গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটী। এ সংসার ধোঁকার টাটী॥"

ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র, ধাত্রী ভ্রূণের গলার ঘড়ঘড়ি ভাঙ্গিয়া দেয়, অর্থাৎ ভ্রূণের জিহ্বা তালুমূলে—উর্দ্ধে সংলগ্ন থাকে, তাহাকে নামাইয়া দিলে, শিশু মাতৃ-গর্ভ-পথ হারা হইয়া অস্থির হইয়া পড়ে। ধাত্রী জলে মুখ ধৌত করাইলে, তখন চঞ্চল বায়ু নাসিকা দ্বারা প্রবাহিত হওয়ায় কাঁদিয়া উঠে; তাহার একটু পরে ক্ষুধা বোধ করে। কারণ নাসিকা দ্বারা বাহিরের কার্য্য হওয়ায় তখন মনের উৎপত্তি হয়, সেই জন্য মন ক্ষুধা বোধ করায় কাঁদিতে থাকে; পলিতার দ্বারা দুগ্ধ পান করাইলে কান্না নিবৃত্তি হয়।

এতদিন মাতৃগর্ভে ক্ষুধা কোথায় ছিল? বাহিরের এই চঞ্চল বায়ু হইতে মন ও কামনার উৎপত্তি হয় এবং কামনা গত হইয়া মায়ায় আবদ্ধ হওয়ায় যত দুঃখ কষ্ট। দুঃখ কথার অর্থ—দুঃ শব্দে দূরে এবং খ শব্দে খং স্বরূপ ব্রহ্ম, মন খং স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে দূরে থাকিলেই দুঃখ। সৎগুরু কৃপায় যখন মাতৃগর্ভের রাস্তা জীব প্রাপ্ত হয়, যে পথ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র হারাইয়া যায়, তাহা পাইয়া অন্তরের স্থির প্রাণের অর্থাৎ সুষুম্নার রাস্তায় প্রাণের গতি হয়। চঞ্চল বায়ু হইতেই মন ও কামনার উৎপত্তি, অন্তর্মুখীন প্রাণায়ামের সাহায্যে কামনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, মূলাধারস্থ স্থির প্রাণকে উর্দ্ধে আজ্ঞাচক্রে—ব্রহ্মযোনীতে সংমিলিত করিয়া ভগবান পদ বাচ্য হইতে পারা যায়। এই নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা পূর্ব্বকালের ঋষিগণের মধ্যে অনেকেই ভগবান উপাধিতে ভূষিত হইতেন।

কুরুগণ মায়িক জীবকে কামনার আশ্রয়ে রাখিয়া, বিষয়মদে মত্ত করাইয়া কতই সাংসারিক আনন্দ প্রদান করিত। ঐ রিপুগণের বিনাশে অর্থাৎ তাহাদের অন্তর্দ্ধ্যানে প্রথম প্রথম কষ্ট হইবার কথা, যাহা সংস্কার গত। কিন্তু চঞ্চল মন কামনা হীন হওয়ায়, মন নিবৃত্তি ভাবাপন্ন এবং নির্ম্মল হওয়ায় আজ্ঞাচক্রস্থ কুটস্থ চৈতন্যে স্থিতি হইল। চঞ্চল বায়ু

হইতেই মায়া, তাহার অভাবে স্থির প্রাণের কার্য্যে—"মনস্থিরঃ যস্য বিনাবলম্বনম্, বায়ুস্থিরঃ যস্য বিনাবরোধনম্, চক্ষুস্থিরঃ যস্য বিনাবলোকনম্" এই খেচরীসিদ্ধ 'অবস্থা প্রাপ্ত' হওয়ায়, উদ্বোধিনী শক্তিতে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হওয়ায় সাধনার পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

পূর্ব্বে সাধক ঈড়া পিঙ্গলার মোহে আচ্ছন্ন ছিল, এখন তাহারা উর্দ্ধে লগ্ন হওয়ায় মায়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। সে অবস্থা সুখজনক, সু অর্থে সুলভ, খ অর্থে ব্রহ্ম; মন নিবৃত্তি উপাধী প্রাপ্ত হওয়ায় ব্রহ্মে অবস্থিত হইল। প্রাণের চঞ্চল গতির তিরোভাব হওয়ায় মন সুখে স্থিতিলাভ করিল। তখনও কিন্তু সত্বগুণে মন রহিয়াছে, রজ তমগুণে নামিতেছে না, কারণ ঈড়া তম ও পিঙ্গলা রজগুণ, তাহারা যে উর্দ্ধে স্থিতিলাভ করিয়াছে। ঐ সময়ে মন সুষুম্নায় স্থিতিলাভ করিয়াছে, সুষুম্নার স্থান বিশুদ্ধাখ্য চক্র হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আজ্ঞাচক্রে বিষ্ণুর অবস্থিতি, সুতরাং মন সত্বগুণাবলম্বী, তৎকালিন সংসারের সমস্ত কার্য্য করিয়াও আশক্তি শূন্যতা; আশক্তি কামনার অংশ, তাহাত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং শান্ত ভাবে অবস্থিত। মন, প্রাণ, চক্ষু, কৃষ্ণচন্দ্রে অর্থাৎ কুটস্থে সংমিলিত, সে অবস্থায় অহঙ্কারযুক্ত মনের অস্তিত্ব বর্জ্জিত। সমস্ত কার্য্য—যাহা দেহ দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা নিজস্ব বলিয়া জ্ঞান থাকে না; মন ভগবানে মিলিত রহিয়াছে সুতরাং যত কিছু কার্য্য ভগবানই করিতেছেন, সুতরাং সাধক দায়িত্ব শূন্য হন।

এই অবস্থাই প্রকৃত শান্তি। এই অবস্থা পাণ্ডবগণ প্রাপ্ত হইলেন। সদাই ভাবে তন্ময়, তজ্জন্য এই অবস্থায় অভাব থাকে না; যখন যাহা প্রয়োজন, তৎপূর্ব্বেই তাহা প্রাপ্ত হন। যাঁহার এই অবস্থা হয়, তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, সুতরাং নিজবোধরূপ। সদা ব্রহ্মানন্দে কালাতিপাত করেন, সহস্রার পদ্ম হইতে চ্যুত অমৃত পানে মুখ মিষ্ট আস্বাদ যুক্ত, সে অবস্থায় ক্ষুধা বোধ থাকে না, তবে যৎকিঞ্চিৎ খাইতে

হয়, তাই ভোজন করেন। সদা কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করেন, অনাহত-ধ্বনি শ্রবণ করেন, যাহা দৃষ্টিগোচর করেন, আজ্ঞাচক্র হইতে দর্শন করেন।

ঈড়া পিঙ্গলার আশ্রয়ে যখন ছিলেন, তখন বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দে প্রবৃত্তি-সূচক মনের আগ্রহ ছিল। এখন মনের বীতরাগ হওয়ায় দেহের অভ্যন্তরস্থিত রূপ অর্থাৎ সর্ব্বদা কৃষ্ণচন্দ্র দর্শন, সহস্রাব চ্যুত অমৃত রস পানে ব্রহ্মানন্দ নেশায় বিভোর, দূরস্থিত গন্ধের আঘ্রান, ব্রহ্মানন্দে পুলক শিহরণ, এবং অনাহত-ধ্বনি শ্রবণ করেন। মন এই সকল বিষয় অন্তরে প্রাপ্ত হইলে বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দে কেন মোহিত হইবে। সে এক পরমানন্দের অবস্থা, এই অবস্থা—সাধন সময়ে কামনাকে পরাজয় করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ সাধকের ভক্তিডোরে সদা বদ্ধ থাকেন।

এই নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার উদ্দেশ্যে পাণ্ডবগণ অর্থাৎ নিবৃত্তি-পক্ষীয় ধর্ম্মপরায়ন গণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। অশ্ব অর্থে ব্যাপৃত, অর্থাৎ প্রাণই সর্ব্বত্র ব্যাপৃত। সেই প্রাণের সাধন প্রচার করিয়া বিধর্ম্মীগণকে এই নিষ্কাম-ধর্ম্মাবলম্বী করা হয়। ইহাই অশ্বমেধ যজ্ঞ।

দুর্য্যোধন-রূপী রজগুণ-জাত কামরিপু, যাহার অবস্থিতি মনুষ্যের কণ্ঠদেশে, যাহাকে ভোগীকান্ত বায়ু বলে, তাহার বিনাশ হইলে অর্থাৎ স্থির প্রাণ মূলাধার হইতে বিশুদ্ধাখ্যচক্র পর্য্যন্ত স্থির হইলে, সাধকের মন সত্বগুণে অবস্থিতি করায় নির্ম্মল হয়। তখন বিশুদ্ধাখ্য-চক্র হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত প্রাণ চঞ্চলতা শূন্য হওয়ায়, মন্দাকিনী-রূপে ধীরভাবে ঊর্দ্ধে যাতায়াত হয়। তৎকালিন কূটস্থ হইতে কামরাগ হীন কামদেবের উৎপত্তি হয়, যাঁহাকে মদন কহে; তাঁহা হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মতম গতি সৃষ্টি হয় অর্থাৎ অনুভূতি হয়।

বিশুদ্ধাখ্য হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত দৈব ভাব, পূর্ব্বে যাহা উল্লেখ

করা হইয়াছে। কামদেব এবং দ্বারকাপুরী অর্থাৎ পরাস্বর্গ, যাহাকে সহস্রার পদ্ম বলা হয়, তাহার দ্বারকে দ্বারকাপুরী কহে। সেইস্থানে দৈবী-সম্পদ-জাত যদু বংশ, যাঁহারা প্রবল প্রতাপে সত্ত্বগুণে কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সংকর্ষণ-রূপী বলরাম, যাঁহার হস্তে লাঙ্গল দেখা যায়, যাঁহার দ্বারা কর্ষণ-রূপে দেহরূপ ক্ষেত্রে প্রাণায়াম রূপ কার্য্য হইতেছিল। প্রাণের চঞ্চলতা বিনাশে গুরুপ্রদত্ত একটী ক্রিয়াদ্বারা আজ্ঞাচক্র হইতে মুষল আকারে, (তাহা স্থিরপ্রাণে গঠিত) সহস্রারে ঊর্দ্ধগত হইল। নিবৃত্তি-মন-জাত যে সকল স্ত্রী পুরুষ উপাধিধারী, কূটস্থ চৈতন্যের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া দাক্ষিণ্য এবং ভক্তিমান্ দ্বারকাবাসী ও ভক্তিমতি দ্বারকাবাসিনীগণ ছিলেন, বলরামের দেহত্যাগ অর্থাৎ সংকর্ষণের কার্য্য বন্ধ হওয়ায়, (প্রাণের সাধন বন্ধ হওয়ায়) যদুবংশ শূন্য হইল। স্থির প্রাণের চলায়মান অবস্থার অন্তর্দ্ধ্যান অর্থাৎ বলরামের অন্তর্দ্ধানে যদুবংশ শূন্য হইল।

সংকর্ষণের অন্তর্দ্ধ্যানে, কৃষ্ণ অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্য, (কৃষ ধাতু কর্ষণ করা ন নিবৃত্তি বাচক,) শ্বাস প্রশ্বাস রূপে প্রাণের যে কর্ষণ ক্রিয়া হইতেছে, ইহার নিবৃত্তি রূপ স্থির অবস্থাকে, স্থির-প্রাণ-রূপ কৃষ্ণ কহে। ঐ কৃষ্ণচন্দ্র, যাহাতে তন্ময় হইয়া সাধনার প্রথম অবস্থা হইতে সাধক জ্যোতির্ম্ময়ী পরা প্রকৃতি সহ, নবঘনশ্যাম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মহা আনন্দে নিমগ্ন ছিলেন, ঐ কৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্দ্ধ্যান হইলেন।

ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধক দ্বৈতভাবে ছিলেন, এখন আমি তুমি ভেদজ্ঞান শূন্য হওয়ায়, আর কূটস্থকে দেখিতে পাইলেন না; অর্থাৎ মহাভারতের মতে কৃষ্ণচন্দ্র দেহরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষে শরে সংযোজিত হইলেন। কারণ; মুষল-রূপী সুষুম্না আজ্ঞাচক্রের মধ্য দিয়া সহস্রারে অর্থাৎ স্থির সমুদ্রে মিলিতেছে; চক্ষের দৃষ্টিহীন অবস্থা হওয়ায়, আভাস মাত্র কূটস্থের দৃষ্টিগোচর হয়। "দৃষ্টিস্থিরঃ যস্য বিনাবলোকনম্" অবস্থা সাধকের হয়।

সাধকের তখন কি প্রকার অবস্থা হয়? যথা,—"ন তদ্ভাষয়তে সূর্য্য, ন শশাঙ্ক, ন পাবক। যদ্ বর্ত্তা নিবর্ত্তন্তে তদ্‌ধাম পরমং মনঃ॥" সাধকের এই অবস্থায় এইরূপ কুটস্থ দর্শন হয়, তাহা অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয়। আজ্ঞাচক্রের উপর স্থিরবায়ুর ক্রিয়া আছে, তাহা সমাধা হইলে কৃষ্ণচন্দ্রের সদৃশ হয়। সাধক কৃষ্ণচন্দ্রে মিলিত হইয়া জীবন্মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং অহোরাত্র ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, অকাম স্বরূপ কামদেবই নিবৃত্তি-মাগের প্রবোধ রূপ পুত্র; তাহা দ্বারাই সাধক উদ্ধার প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রিয়ে আসক্ত থাকাই পাপ, তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই সাধনার উদ্দেশ্য সফল হইল। বাহিরের চঞ্চল বায়ু, যাহা দুই নাসিকা দ্বারা সঞ্চালিত হওয়ায় জীব মায়ায় আবদ্ধ হয়, তাহার কার্য্য ঊর্দ্ধে লয় হওয়ায়, কৃষ্ণচন্দ্রে বিলীন হয়; তাহাতেই রজগুণ-জাত কামরূপী দুর্য্যোধনের বিনাশ সাধন হয়। তাহার পরে সত্ত্বগুণাশ্রিত অকাম অন্তর্হিত হওয়ায়, সহস্রারে মনের সংমিলনে, আমিহারা অবস্থায় অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অহোরাত্র উপভোগ করেন; তখনই জীবন্মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় সূক্ষ্ম শরীরে সাধক অনেক স্থানে জীবের মঙ্গল উদ্দেশ্যে বিচরণ করেন।

দ্বারকাপুরী স্নায়ু মণ্ডলের আধার সহস্রারে সমুদ্রে প্লাবিত হয়। জ্যোতির্ম্ময় শত শত সূর্য্যের প্রকাশ, যাহা সাধনার প্রথম অবস্থা হইতে কুটস্থ চৈতন্যের দীপ্তি দৃষ্টিগোচর করিতেন। এখন ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না সহস্রারে মিলিত হওয়ায় অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নির অভাবে, চন্দ্রকে ঈড়া কহে, যাহা বাম নাসিকায় প্রবাহিত হয়; সূর্য্যকে পিঙ্গলা কহে, যাহা দক্ষিণ নাসিকায় প্রবাহিত হয়; উক্ত উভয় নাসিকার মিলন স্থানে সুষুম্না-রূপিনী স্থিরবায়ু যাহাকে অগ্নি কহে। এই তিনটী নাড়ীর ঊর্দ্ধে মিলন হওয়ায়, সাধক গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন।

ঈড়া তমগুণ, পিঙ্গলার কার্য্য রজগুণ এবং সুষুম্নার কার্য্য সত্বগুণ।

এই তিনটি কার্য্য রহিত হইলে কৃষ্ণচন্দ্রের অদর্শন হয়, আত্মবিষয়িনী জ্ঞান দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হয়। মায়ার কার্য্য ঈড়া পিঙ্গলা হইতে উৎপত্তি, ঐ রজ-তমগুণের অন্তর্দ্ধ্যানে পিতা, মাতা, দারা, পুত্র, পৌত্র, আত্মীয় স্বজনগণের সুখে দুঃখে মনের যে বিচলিত ভাবের অনুভূতি ছিল, মান অপমানে পূর্ব্বে মনে আঘাত লাগিত। এখন যে মন কৃষ্ণচন্দ্রে সংমিলিত হইয়াছে, সুতরাং আর বিচলিত হইবার কিছুই নাই। সাধক এখন নির্লিপ্ত, অদ্বৈত ভাবে সংমিলিত, সুতরাং সুখ দুঃখ বোধ করিবার ক্ষমতা বর্জ্জিত হন।

যাহা নাই, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করার নাম মায়া, সেই মায়া অন্তর্দ্দশা প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় সমজ্ঞান প্রাপ্ত, ভালমন্দ বিচার করিবে কে? এই অবস্থায় সাধক অনিচ্ছার ইচ্ছায় ভারী জিনিষ স্বরূপ নিজের দেহ, ত্যাগ করিতেও পারেন অথবা কিছুদিন রাখিতেও পারেন। এই সম্বন্ধে একটা কথা প্রচলিত আছে, যথা—"বিনা সে কেশব, আঁধার এসব, হ'লাম শব প্রায়। কি ছার রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, সুখেতে কার্য্য নাই।" এই অবস্থা প্রাপ্তিতে ক্ষিতিতত্ত্ব অর্থাৎ মূলাধার ভেদ হইয়া, কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইয়া বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলে উদ্ধার প্রাপ্ত হন।

এখন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ শত্রু শূন্য হইয়াছে, সাধক নারায়ণে মিলিত হইয়াছেন, এত বিমল আনন্দ ভোগ করা স্বত্বেও সশরীরে স্বর্গে যাইতে অভিলাষী হইলেন। মন কামনা হীন হইয়া নিষ্কাম হইল, পূর্ব্বে মন কামনা সহবাসে নানা খেয়ালে জড়িত হইত, এখন কামনা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া পূর্ণ নিষ্কাম হওয়ায় স্বর্গগামী হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। সাধক পঞ্চতত্ত্ব ও শক্তিসহ উর্দ্ধগামী হইতে উদ্যোগী হইল। মূলাধারস্থ সহদেব, স্বাধিষ্ঠানস্থিত নকুল, মণিপুরস্থিত অর্জ্জুন, অনাহতস্থিত ভীম এবং বিশুদ্ধাখ্যস্থিত যুধিষ্ঠির স্বর্গে অর্থাৎ সহস্রার পদ্মে অবস্থিতির জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তৎকালিন সাধক মহা স্থির বায়ুর একটি ক্রিয়া সৎগুরু কৃপায় প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জীবিত থাকিয়া মৃত্যু লক্ষণগুলি উপলব্ধি করেন। দ্রৌপদী—শক্তি অন্তর্হিত হয়, মূলাধারস্থিত সহদেব সাধিষ্ঠান চক্রে মিলিত হওয়ায়—সহদেবের প্রাণ উর্দ্ধগত হওয়ায় জীবন শূন্য হইল। সাধিষ্ঠানে নকুল বিদ্যমান ছিলেন, তথাকার জীবনী শক্তি মণিপুরে সংমিলিত হওয়ায় নকুল বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। মণিপুর চক্রস্থিত অর্জ্জুন, অনাহত চক্রে উর্দ্ধগত হওয়ায় জীবনী শক্তি নষ্ট হইল। অনাহত চক্রস্থিত ভীম মহাবলবান প্রাণশক্তি, বিশুদ্ধাখ্য-চক্রস্থিত যুধিষ্ঠিরে সম্মিলিত হওয়ায় জীবন শূন্য হইলেন।

উল্লিখিত চারিটি ভ্রাতা এবং দ্রৌপদীর প্রবল কার্য্যকারিতা শক্তির তেজ হীন হইল। মূলাধার হইতে স্থির বায়ু পরস্পর শূন্যাভিমুখে বিষ্ণুর পাদপদ্মে—আজ্ঞাচক্রে পিণ্ডরূপে অর্পিত হয়। এখন যুধিষ্ঠির—শূন্যতত্ত্ব পরাস্বর্গে অর্থাৎ সহস্রার-চক্রে সশরীরে অর্থাৎ দেহ থাকা অবস্থায় মিলিত হইয়া লয় হইলেন। সে অবস্থা নিজবোধরূপ।

এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই যে দেহত্যাগ করিতে হয় এমত নহে, অনিচ্ছার ইচ্ছায় অনেক দিন তথায় ব্রহ্মানন্দে অব্যক্ত-ব্রহ্মে মিলিয়া থাকিতে পারেন। মৃত্যু নিজের আয়ত্বাধীন থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মৃত্যুভয় তিরোহিত হয়, যখন অনিচ্ছার ইচ্ছা হয়, সর্পের খোলসের মত দেহত্যাগ করেন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে দেহান্তর প্রাপ্ত হয় না, প্রকৃত পক্ষে ইহাকেই জীবন্মৃত্যু অবস্থা কহে। এই অবস্থায় সাধক বিমল আনন্দে থাকিয়া, নির্লিপ্ত অবস্থায় সংসারে থাকিয়া সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য করিতে পারেন। ইহাকে চৈতন্য সমাধি কহে।

পূর্ব্বকালে জনক, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহা মহা আর্য্য ঋষিগণ এই অবস্থায়

অবস্থিতি করিতেন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বি-দেহ অর্থাৎ বিগত দেহ, যেন তাঁহার দেহ নহে, অপরের দেহ বলিয়া ধারণা হয়। যেমন একজন লোক অপরের দেহ স্পর্শ করিবামাত্র অপরের দেহ বলিয়া উপলব্ধি করেন, বিদেহ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নিজের হস্ত দ্বারা নিজের শরীরের যে কোন অঙ্গ স্পর্শনে অপরের দেহ বলিয়া অনুভূত হয়, ইহাকেই বিদেহ লক্ষণ কহে। ইহা অব্যক্ত, নিজবোধ-রূপ। এই অবস্থায় সাধক নারায়ণ স্বরূপ অদ্বৈত অবস্থা প্রাপ্ত হন, এবং সূক্ষ্ম দেহ লইয়া স্থূলদেহে বিরাজমান। সে অবস্থায় অনিচ্ছার ইচ্ছায় যথা তথা বিচরণ করিয়া, জগতের মঙ্গলের জন্য শ্রদ্ধাবান ভক্তের হৃদয়ে উদিত হইয়া, তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। ইহাই স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব, নিজবোধ-রূপ।

এইরূপ মহাভারতের ভাবার্থ, যাহা গুরু কৃপায় লিখিত হইল, ইহা শরীরস্থ নিবৃত্তি-পক্ষের সহিত প্রবৃত্তি-পক্ষের সংগ্রাম। মানবগণের দেহরূপ ক্ষেত্রে অহোরাত্র এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে, যাহা সাধন করিলে জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি হয়। কখনও একটা মন্দকার্য্যের বিষয় হৃদ-পটে উদিত হইল, আবার সেই মুহূর্ত্তে বিবেকের সাহায্যে নিবৃত্তি-সূচক মন, কামনাকে মন্দকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিল। কিন্তু মন যদি রজ-তমগুণে দৃঢ় হয়, তাহা হইলে সত্বগুণকে পরাস্ত করিয়া মন্দ কার্য্য করিয়া বসে। আর নিষ্কাম কর্ম্ম করণে মন যদি সত্বগুণে স্থিতিলাভ করে, তাহার ফলে রজ-তমগুণের মন্দ কার্য্যকে অপসারিত করিয়া সমরে জয়লাভ করে। এইরূপ তিনগুণে মন অহোরাত্র বিচরণ করিতেছে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে যত অনর্থের মূল কামনা, তাহাকে পরাস্ত করিয়া সৎকার্য্যে মনের ধারণা হয়।

মহাভারতে রহিল বাক্যে লিখিত আছে, যখন সাধকরূপী অর্জ্জুন যুদ্ধে ব্যাপৃত, শত্রুগণ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিতেছে, তৎকালিন কি না

শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে যোগী হইতে উপদেশ দিতেছেন। ইহা কি সঙ্গত কথা? শ্রীকৃষ্ণ অনেক সময়ই অর্জ্জুনের নিকট অবস্থিতি করিতেন, যুদ্ধের পূর্ব্বে কি তিনি পার্থকে যোগী হইবার কথা বলিতে পারিতেন না। যখন অর্জ্জুন মহাব্যস্ত, তখনই কি শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিবার প্রশস্ত সময় নির্ণয় করিলেন। গীতাতে লিখিত আছে, ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন,—"তস্মাৎ যোগী ভবার্জ্জুন।" ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়, এই যুদ্ধ সাধন সমর ভিন্ন বাহিরের সংগ্রাম নহে। সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত, একটী অন্তর্লক্ষ্য অপরটি বহির্লক্ষ্য।

অর্জ্জুন দেহরূপ রথে গাণ্ডীব ধারণ করিয়া আছেন, "প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।" যাহার শরক্ষেপে শরীরস্থ রিপুগণ বলহীন হইয়া মৃত্যুতুল্য হয়, শ্রীকৃষ্ণ দুই ভ্রূদেশের ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ঈড়া পিঙ্গলা, চঞ্চল বায়বীয় শক্তিকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া, অশ্ব অর্থে ব্যাপৃত, "বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্" ঐ চঞ্চল বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া, দেহরূপ রথ চালনা কবিতেছেন। ঈড়া পিঙ্গলা, যাহা রজ-তমগুণের প্রবাহ, তাহাদিগকে সংযত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সাধকরূপী—জীবাত্মরূপী অর্জ্জুনকে, দেহরূপ ক্ষেত্রে সমর করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় সংমিলন করাইয়া যোগী হইতে বলিতেছেন।

যে পর্য্যন্ত শরীরস্থ রিপু এবং ইন্দ্রিয়গণের প্রতাপ নষ্ট না হয়, তাবৎকাল এই সাধন সমর করিতে হয়। তাহার ফলে ইন্দ্রিয়গণ বিক্রমহীন হওয়ায় সাধকের আজ্ঞাধীন হয়। এই কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-পক্ষের সমরে, প্রবৃত্তি-পক্ষ যে হত হইয়াছিল তাহা নহে, তাহাদের প্রতাপ নষ্ট হইয়াছিল, প্রতাপ নষ্ট হইলে মৃত্যুতুল্য অবস্থাই হয়।

সমাপ্ত

শারীরিক বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম

নিষ্কাম বা অন্তর্মুখীন প্রাণায়াম ক্রিয়া

মেরুদণ্ডের মধ্যে ছয়টী চক্র আছে, তাহাদিগকে "প্লেক্সাস্" বলে। তান্ত্রিকগণও তাহা বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা চক্রের স্থলে পদ্ম বলিয়া বর্ণনা করেন।

শব ব্যবচ্ছেদে প্রতীয়মান হয়, মেরুদণ্ডের শেষ অংশ, যাহা মস্তিষ্ক গহ্বরে মিলিত হইয়াছে, ঐ মিলন স্থানে "মেডুলা অফ লঙ্গেটা" বিদ্যমান। ঐ "মেডুলা অফ লঙ্গেটা" একটি ত্রিকোণাকার স্নায়ু কেন্দ্র। দেখা যায়, তথা হইতে স্নায়ু-সূত্র বহির্গত হইয়া, দুইটী চক্ষে, দুইটি কর্ণে, দুইটি নাসিকা ছিদ্রে, একটি জিহ্বাতে এবং একটি সূত্র ত্বকে সঞ্চালিত হইয়াছে। তন্নিম্নে আর একটি প্লেক্সাস্ বা স্নায়ুকেন্দ্র গোলাকার দৃষ্টিগোচর হয়, যাহা ঘাড়ে বিদ্যমান। তন্নিম্নে বক্ষের মধ্যস্থলের সমসূত্রে পশ্চাৎ ভাগে মেরুদণ্ডের মধ্যে একটি, তন্নিম্নে অর্থাৎ নাভির সমসূত্রে পশ্চাৎ ভাগে মেরুদণ্ডের মধ্যে একটি, তন্নিম্নে লিঙ্গের উৎপত্তি স্থলের সমসূত্রে পশ্চাৎ ভাগে মেরুদণ্ডের মধ্যে একটি এবং আর একটি প্লেক্সাস্ বা স্নায়ুকেন্দ্র, গুহ্যদ্বারের এক ইঞ্চি ঊর্দ্ধে পশ্চাতে মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। সর্ব্ব ঊর্দ্ধ কেন্দ্র ত্রিকোণাকার, নিম্নের পাঁচটি কেন্দ্র গোলাকার দেখা যায়। মেডুলা অফ লঙ্গেটা হইতে একটি মজ্জা, সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট নলাকারে বহির্গত হইয়া নিম্নের পাঁচটি কেন্দ্রকে ভেদ করিয়া সর্ব্বনিম্নের কেন্দ্রে শেষ হইয়াছে। এই ছয়টি স্নায়ুকেন্দ্রই ষট্‌চক্র বলিয়া যোগীগণ নাম দিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ মতে স্নায়ুকে বায়ু বা প্রাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে।

তাহার কারণ, স্নায়ুর কার্য্য শক্তি ও স্পর্শশক্তি, ইহা চিকিৎসা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। মনে করুন, সমস্ত শরীরে জালের মত স্নায়ুমণ্ডলী রহিয়াছে অথচ জীবের মৃত্যু ঘটিল, তাহা হইলে কি তখন মৃত ব্যক্তির জীবন ফিরাইয়া আনিতে পারা যায়? তাহা কখনই নহে। প্রাণের সঞ্চালন প্রভাবে স্নায়ু কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, সেই নিমিত্ত স্নায়ুগণকে আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতগণ বায়ু বা প্রাণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যোগ বা তন্ত্রশাস্ত্রে ঐ ছয়টি চক্র বা পদ্মকে মেরুদণ্ডের নিম্ন হইতে মূলাধার, সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য এবং সকলের ঊর্দ্ধে ত্রিকোণাকার ব্রহ্মযোনীকে আজ্ঞাচক্র নাম দিয়াছেন। আর দুইটি স্নায়ু বা বায়বীয় শক্তি, মেরুদণ্ডের মধ্যে নলাকারে মূলাধার পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে। উহা মধ্যপ্রবাহ বা স্থির বায়বীয় শক্তির দুই পার্শ্ব দিয়া ঊর্দ্ধে প্রবাহিত হইতেছে। বাম দিক দিয়া যাহা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে তাহাকে ঈড়া নাড়ী কহে এবং দক্ষিণ দিক দিয়া যাহা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহাকে পিঙ্গলা নাড়ী কহে। প্রথমে মেডুলা অফ লঙ্গেটা হইতে নলাকার মজ্জা, যাহা ষট্চক্র ভেদ করিয়া মূলাধারে শেষ হইয়াছে, তাহাকে সুষুম্না নাড়ী কহে।

এই তিনটি স্নায়ু বা প্রাণশক্তির কার্য্যে জীবের দেহ ধৃত রহিয়াছে এবং জীব দেহের প্রত্যেক কার্য্যই সম্পাদিত হইতেছে। ঈড়া ও পিঙ্গলার কার্য্য দ্বারা বাহিরের চঞ্চল বায়ুর প্রবাহ নাসিকা দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে, সুষুম্নার—স্থির বায়ুর কার্য্যকরণ শক্তি। জীবদেহে যত প্রকার বায়ুর কার্য্য হয়, এই তিন বায়ু ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না শক্তি-দায়িনীরূপে মেরুর মধ্যে অবস্থিত। ইহাদের শক্তি নষ্ট হইলে জীব শবে পরিণত হয়।

এই যে ছয়টি চক্র বা কেন্দ্র, ইহার মধ্য দিয়া পূর্ব্বলিখিত সুষুম্না নাড়ী, মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। দুইটি

নাসিকার দ্বারা অর্থাৎ ঈড়া পিঙ্গলা দ্বারা যে বাহিরের চঞ্চল বায়ু, যদ্দ্বারা আগম নিগম কার্য্য হয়, ঐ বায়ু প্রবাহের দ্বারা মন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্যের উৎপত্তি। ইহারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মুখ, হস্ত, পদ, গুহ্য ও লিঙ্গ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ইহাদের পাঁচটি বিষয় যথা,—চক্ষের বিষয় দর্শন, কর্ণের বিষয় শ্রবণ, নাসিকার বিষয় ঘ্রাণ, জিহ্বার বিষয় আস্বাদন, ত্বকের বিষয় স্পর্শন, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এই পাঁচটি বিষয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয় যথা;—মুখের দ্বারা আহার, হস্তের বিষয় ধারণ, পদের বিষয় চলন, গুহ্যের বিষয় মলত্যাগ ও বায়ু নিঃসরণ এবং লিঙ্গের মুত্রত্যাগ ও মৈথুন, দশ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জীব এই সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়ের রাজা মন, তিনি অন্ধ। তাঁহা হইতে উৎপন্ন কাম বা কামনা, ইনি একশত ভাগে দশদিকে ধাবিত হইয়া মায়িক জীবকে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ধাবিত করাইয়া সদসৎ কার্য্যে প্রলোভিত করিয়া বিষয়মদে মত্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার মূলে ঈড়া ও পিঙ্গলাস্থিত চঞ্চল বায়ুর কার্য্যের প্রতাপে জীবকে প্রতি মুহূর্ত্তে ময়লা জিনিষের সংশ্রবে রাখিয়া, আয়ু কমাইয়া রোগ শোকে জর্জ্জরিত করিতেছে; সেই নিমিত্ত মায়িক জীব অকালে ধ্বংসের পথে ধাবিত হইতেছে। ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রটি হাপর বিশেষ, যতগুলি চঞ্চল বায়ুর শ্বাস প্রশ্বাস উহাতে থাকিতে পারে, তাহারা সকলে বাহিরে যাইয়া জীবদেহকে দুর্ব্বলতায় পরিণত করিতেছে।

যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে, জীবসৃষ্টি কালিন প্রজাপতি স্থির বায়ুরূপী রেতঃ দ্বারা পিতার কুটস্থ অংশসহ মাতৃগর্ভে প্রদত্ত হয়। উহা দিন দিন সঞ্চালন দ্বারা, ভ্রূণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া গঠিত হয়। মাতার প্রদত্ত রক্ত, যাহা প্রতি মুহূর্ত্তে ভ্রূণের নাভিদেশে দেওয়া হয়, তাহা

যদি মাতার শারীরিক অবস্থা সুস্থ থাকে, তবে ঐ রক্ত ভ্রূণের মধ্যস্থিত স্থিরবায়ুর সঞ্চালনে দিন দিন ভ্রূণদেহের লাবণ্য বৃদ্ধি হইয়া শারীরিক গঠন অতি স্বাস্থ্যযুক্ত হয়। মাতার শরীরস্থ রক্তের ব্যতিক্রম হইলেও ভ্রূণের মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত স্থিরবায়ু, যাঁহা পিতার রেতঃসহ জন্ম হইয়াছিল, তাহা পূরক দ্বারা ঐ দূষিত রক্ত শিশুর মস্তিষ্কে নীত হয় এবং প্রশ্বাস রূপে মেরুর মধ্যে মস্তিষ্ক হইতে রেচক কালিন ঐ দূষিত রক্ত পরিশুদ্ধ হওয়ায় ভ্রূণের শরীর নিরাময় হয় এবং দশম মাসে ভূমিষ্ঠ কালিন লাবণ্যযুক্ত দেহ দেখা যায়।

এখন বিচার করিয়া দেখুন, মেরুমধ্যে স্থিরবায়ুর উঠা নামা রূপ কার্য্যে অর্থাৎ অন্তর্মুখীন প্রাণায়াম শক্তিতে নিরোগ দেহে ভূমিষ্ঠ হয়। চঞ্চল বায়ু, যাহা বহিঃপ্রাণায়ামে জীব দক্ষিণ ও বাম নাসিকা দ্বারা প্রবাহিত করে, তাহাতে জীবের প্রতি মূহূর্ত্তে আয়ুশক্তির ধ্বংস সাধন করাইয়া, অকালে জীবদেহ হইতে প্রাণ নির্গত করে অর্থাৎ দেহান্তর ঘটাইয়া থাকে। যদি অন্তর্মুখীন প্রাণায়াম করা যায়, তাহার ফলে উর্দ্ধে আজ্ঞাচক্রে চঞ্চল প্রাণের স্থিতি হয়। স্থির প্রাণই বিষ্ণু,—
"প্রাণ বিষ্ণু পিতামহ, প্রাণেন ধার্য্যতে জগত।"

যেমন বহির্জগতে পৃথিবী হইতে একক্রোশ উর্দ্ধে স্থির বায়ু আছে এবং স্থিরবায়ুর আধারে চঞ্চল বায়ুর কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তেমনই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ জীবের দেহের উপরে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে স্থিরবায়ু রূপে ভগবান বিরাজ করিতেছেন। তিনি মেরুদণ্ডের মধ্যে মূলাধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছেন, পুরুষ রূপে অর্থাৎ শয়ন করিয়া আছেন। সেই স্থিরবায়ুর সাধনই অন্তর্মুখীন প্রাণায়াম।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, গুহ্যদ্বারের এক ইঞ্চি উপরে মেরুর মধ্যে মূলাধার পদ্ম যাহার কার্য্য,—বায়বীয় শক্তি বা স্নায়ু-সূত্র তথা হইতে নির্গত হইয়া গুহ্যদেশ ও তন্নিকটবর্ত্তী মাংসপেশী, উরুদেশ, পদ,

পদাঙ্গুলি ও উভয় পদের নখ পর্য্যন্ত বল প্রদান করিতেছে এবং তাহার বলে জীব চলৎশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

মূলাধার-পদ্মের উর্দ্ধে স্বাধিষ্ঠান-পদ্ম, যাহা লিঙ্গের পশ্চাতে মেরু-দণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। তাহার বায়বীয় শক্তিতে স্নায়ুসূত্র নির্গত হইয়া লিঙ্গ, অণ্ডকোষ, মূত্রাশয়, জরায়ুকোষ এবং মূত্রপিণ্ডদ্বয়কে কার্য্য-কারিতা শক্তি প্রদান করিতেছে এবং তন্নিকটবর্ত্তী অস্থি, মাংস ও চর্ম্মকে শক্তি প্রদান করিতেছে।

সাধিষ্ঠান-পদ্ম বা চক্রের উর্দ্ধে মণিপুর-পদ্ম বা চক্র। তথা হইতে বায়বীয় শক্তিতে স্নায়ুসূত্র নির্গত হইয়া পাকস্থলী, পাকনালী, যকৃত, প্লীহা, প্যাংক্রিয়াস প্রভৃতি অন্ত্রগুলিকে কার্য্যকারিতা শক্তি প্রদান করিতেছে।

মণিপুর-চক্র বা পদ্মের উর্দ্ধে অনাহত-চক্র। যাহার বায়বীয় শক্তিতে স্নায়ুসূত্র নির্গত হইয়া দুইটী ফুস্ফুস্ যন্ত্র, তাহার আবরণ, হৃৎপিণ্ড ও তাহার আবরণ এবং তন্নিকটবর্ত্তী মাংস, চর্ম্ম, অস্থিকে কার্য্যকারিতা শক্তি প্রদান করিতেছে।

অনাহত-চক্রের উর্দ্ধে মেরুর মধ্যে, কণ্ঠকূপের পশ্চাতে আর একটি বায়বীয় কেন্দ্র আছে, তাহার নাম বিশুদ্ধাখ্য-চক্র বা পদ্ম। যাহার বায়বীয় শক্তিতে স্নায়ু-সূত্র নির্গত হইয়া গলমধ্যস্থ যন্ত্রকে এবং তাহার নিকটবর্ত্তী মাংস, চর্ম্ম, অস্থিকে এবং দুইখানি হস্ত, তাহার অস্থি, মাংস এবং অঙ্গুলিগুলিকে কার্য্যকারিতা শক্তি প্রদান করিতেছে।

বিশুদ্ধাখ্য-চক্রের উর্দ্ধে মস্তকের পশ্চাদ্দেশে যে স্থানে মেরুদণ্ড শেষ হইয়াছে তথায় ত্রিকোণাকার একটি স্নায়ুকেন্দ্র বিদ্যমান আছে, যাহার নাম আজ্ঞা-চক্র বা পদ্ম। এই পদ্ম হইতে বায়বীয় শক্তিতে স্নায়ুসূত্র নির্গত হইয়া, দুইটি সূত্র দুই নাসিকায়, দুইটি দুই কর্ণে, দুইটি দুই চক্ষুতে, একটি জিহ্বাতে এবং একগুচ্ছ সূত্র সমস্ত ত্বকে কার্য্যকারিতা শক্তি প্রদান করিতেছে।

আজ্ঞা-চক্রের ঊর্দ্ধে সহস্রার-চক্র বা পদ্ম, যাহা মস্তকের শীর্ষদেশের স্নায়ু-মণ্ডল, সচরাচর যাহাকে মাথার ‘ঘি’ বলে। মূলাধার হইতে আজ্ঞা-চক্র পর্য্যন্ত এই ছয়টি পদ্মের সর্ব্বসমেত ঊনপঞ্চাশটি দল আছে। প্রত্যেক দলে ভিন্ন ভিন্ন নামীয় বায়ু বিদ্যমান আছে।

এখন বিচার্য্য যে, দুই নাসিকার সাহায্যে আগম নিগম কার্য্যে মায়িক জীব ঈড়া পিঙ্গলার চঞ্চল বায়ুর প্রতাপে, (গর্ভাবস্থায় ভ্রূণ, বিনা ঈড়া পিঙ্গলার সাহায্যে কেবল স্থির বায়ুর অর্থাৎ সুষুম্নার স্থির বায়ুর সঞ্চালনে, বায়ুর বিকারহীন অবস্থায় নিরাময় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্থির থাকিত। ভূমিষ্ঠ হইয়া ঈড়া পিঙ্গলার চঞ্চল বায়ুর প্রতাপে) আগম নিগমে বহির্বিষয়ে আবদ্ধ করাইয়া, জীবকে মায়ায় মুগ্ধ করাইয়া ধ্বংস পথে লইয়া যাইতেছে। তাহা হইতে জীব উদ্ধার পায় কোন্ উপায় দ্বারা? জীবের আয়ু বৃদ্ধি কিরূপে হয় এবং রোগ শোক হইতে কি প্রকারে অব্যাহতি লাভ করে? তাহা “বৈজ্ঞানিক যোগক্রিয়া”।

অন্তর্মুখীন প্রাণায়ামে অর্থাৎ মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত সুষুম্নার ঊর্দ্ধগতি পূরক রেচক কার্য্য, যাহা সংগুরু কৃপায় প্রাপ্য, ঐ কার্য্যের ফলে ঈড়া পিঙ্গলার যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যে উঠা নামা রূপ কার্য্যের ফলে ক্রমে ক্রমে বাহিরের বায়ু লইবার আবশ্যক হয় না। এই ক্রিয়া করিতে করিতে, ঈড়া পিঙ্গলার কার্য্য বন্ধ হইয়া, তাহাতে অবস্থিত চন্দ্র সূর্য্যের কার্য্য রহিত হয়। তখন প্রাণ স্থিরবায়ুর সুষুম্নায় গতি হয়, তজ্জন্য একটা তৃপ্তি ও আনন্দে সাধক ভাসিতে থাকে।

যোগশাস্ত্রে বলে, এই প্রাণায়াম-রূপ যোগ সাধনে সর্ব্ব রোগ নাশ হয়, শরীরে লাবণ্য ও জ্যোতিঃ প্রকাশ হয়। “প্রাণায়াম সর্ব্বরোগ নাশনম্” এইরূপ ঋষিগণ কর্ত্তৃক লিখিত আছে। পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে মেরুদণ্ড মধ্যে ছয়টি প্লেক্সাস্ বা চক্র আছে, যাহার নাম পদ্ম। নিম্নের প্লেক্সাস্ অর্থাৎ মূলাধার হইতে প্রাণশক্তি বা স্নায়বীয় শক্তিতে উভয়

পদের অঙ্গুলি হইতে কোমর পর্য্যন্ত এবং গুহ্যদেশ ও তন্নিকটবর্ত্তী মাংসপেশী, অস্থি প্রভৃতিকে কার্য্যকারিতা শক্তি প্রদান করিতেছে। কিন্তু স্বভাবের বশে প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ সকল স্থান বিকারপ্রাপ্ত হইয়া শক্তিহীন হইতেছে। অন্তর্মুখীন প্রাণায়াম কৌশলের পূরকের আকর্ষণে পদাঙ্গুলি হইতে বিকৃত জিনিষ, কোমর ও গুহ্যদেশ দিয়া মূলাধার চক্রে আনাইয়া উর্দ্ধদিকে গমন করাইতেছে।

মূলাধারের ঊর্দ্ধে সাধিষ্ঠান-চক্র, যাহা হইতে প্রাণ শক্তির সাহায্যে স্নায়ু নির্গত হইয়া লিঙ্গ, অণ্ডকোষদ্বয়, জরায়ু-কোষ, মূত্রাশয়, মূত্রপিণ্ডদ্বয় এবং তন্নিকটবর্ত্তী মাংস, অস্থিকে কার্য্যকারিতা শক্তি প্রদান করিতেছে। কিন্তু স্বভাবের নিয়মে প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ সকল যন্ত্র ও স্থান বিকৃত ও হীনবল হইতেছে। একমাত্র পূরকের সাহায্যে ঐ সকল বিষয় পরিশুদ্ধ উদ্দেশ্যে স্নায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিলে বিকৃত অংশকে সংশোধিত করা যাইতে পারে।

মণিপুর-চক্র—যাহা মেরুমধ্যস্থিত সাধিষ্ঠানের ঊর্দ্ধে অবস্থিত, তাহা হইতে বায়বীয় বা স্নায়বীয় শক্তি প্রভাবে সমস্ত অন্ত্রগুলি এবং লিভার, প্লীহা, পিত্তাশয়, পাকস্থলি এবং তাহার পশ্চাৎস্থিত প্যাংক্রিয়াস্ যন্ত্র ও অন্যান্য সমস্ত যন্ত্রগুলির আবরণকে কার্য্যকারিতা শক্তি প্রদান করিতেছে। স্বভাবের নিয়মে ঐ সকল যন্ত্র প্রতি মুহূর্ত্তে বিকৃত ও হীনবল হইতেছে, কিন্তু পূরকের আকর্ষণী শক্তিতে ঐ সকল যন্ত্রের বিকৃত অবস্থার সংশোধন হইয়া পরিশুদ্ধ হইতেছে।

মণিপুর-চক্রের উর্দ্ধস্থিত প্লেক্সাস্ বা পদ্ম, যাহার নাম অনাহত চক্র; উহার বারটি দলে স্থিরবায়ু আছে। তথা হইতে বায়বীয় শক্তি সঞ্চালিত হইয়া দুইটি ফুস্ফুস্, তাহার আবরণ, হৃদ্‌পিণ্ড ও তাহার আবরণ, উদর ও বক্ষগহ্বর-স্থিত মাংসকে কার্য্যকারিতা শক্তি প্রদান করিতেছে। বাহিরের দূষিত বস্তুর সংস্পর্শে ঐ সকল যন্ত্র বিকৃত হইয়া

ধ্বংস পথে ধাবিত হইতেছে, কিন্তু পুরকের আকর্ষণে পুনরায় সংশোধিত হইতেছে।

অনাহত-চক্রের উর্দ্ধে বিশুদ্ধাখ্য-চক্র; ইহা ষোড়শ দল বিশিষ্ট। তাহা হইতে বায়বীয় শক্তি সঞ্চালিত হইয়া দুইখানি হস্ত, পৃষ্ঠদেশ, গলদেশ, গ্রীবা, স্বরযন্ত্র এবং তন্নিকটবর্ত্তী মাংস ও অস্থিকে কার্য্যকারিতা শক্তি প্রদান করিতেছে। স্বভাবের নিয়মে প্রতিনিয়ত ঐ সকল যন্ত্র বিকৃত হইয়া হীনবল হইতেছে, ঐ সকল যন্ত্রকে নব বল প্রদান উদ্দেশ্যে পুরক কার্য্য দ্বারা উর্দ্ধগত করিতে হয়।

এই প্লেক্সাসের উর্দ্ধে আর একটী ত্রিকোণাকার প্লেক্সাস্ আছে, যাহাকে মেডুলা অফ লঙ্গেটা বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা দুইটি দল যুক্ত পদ্ম, এখান হইতে প্রাণ-শক্তির প্রভাবে কয়েকগুচ্ছ স্নায়ুসূত্র নির্গত হইয়া দুইটি দুই চক্ষুকে, দুইটি দুই কর্ণকে, দুইটি দুই নাসিকা ছিদ্রকে, একটি জিহ্বাকে এবং কতকগুলি স্নায়ুসূত্র সমস্ত ত্বককে কার্য্যকারিতা শক্তি প্রদান করিতেছে। স্বভাবের নিয়মে ঐ সকল যন্ত্র প্রতি মুহূর্ত্তে বিকৃত হইয়া হীনবল হইতেছে, কিন্তু পুরকের আকর্ষণে উহা সংশোধিত হইতেছে।

উক্ত ছয়টি চক্র বা পদ্মের বায়বীয় শক্তিতে উল্লিখিত দেহের সমস্ত অংশ, মাংস, অস্থি ও যন্ত্রগুলিকে কার্য্যকরণের শক্তি, প্রাণের প্রভাবে পরিচালিত করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ সকল যন্ত্র প্রতি নিয়ত কার্য্য করার ফলে স্বভাবের নিয়মে Wastage of Tissue অর্থাৎ ধ্বংস পথে ধাবিত হইতেছে। ঐ ধ্বংস যত নিবারণ করা যায়, ততই আয়ু বৃদ্ধি হয়। ইহা কেবল মাত্র অন্তর্মুখীন প্রাণায়ামের সাহায্যে সম্ভব হয়।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, পুরক দ্বারা প্রত্যেক চক্রস্থ ধ্বংস-বিশিষ্ট অণু পরমাণুকে সংশোধন উদ্দেশ্যে আজ্ঞাচক্রে লওয়া হয়। তাহা

স্নায়ুমণ্ডলে প্রদান করিয়া স্থিরপ্রাণের শক্তিতে সংশোধিত হইয়া, স্নায়ুমণ্ডল হইতে নবশক্তি দ্বারা রেচক করিলে অর্থাৎ অন্তর্ম্মুখীন প্রাণায়াম করিয়া প্রত্যেক চক্রে নিম্নদিকে সঞ্চালন করিলে প্রত্যেক চক্রস্থ যন্ত্র, মাংস ও অস্থিকে নববল দ্বারা অর্থাৎ স্থিরবায়ু দ্বারা সিক্ত করিলে ধ্বংস অণু পরমাণুগুলি নবশক্তিতে সতেজ হইয়া নিরাময় হয়। ইহা দ্বারা অর্থাৎ মাংস, চর্ম্ম ও অস্থি প্রভৃতি নিরাময় হইয়া সতেজ হওয়ায় আয়ুর্বৃদ্ধি হয় এবং মনে শান্তি ও চঞ্চল প্রাণের স্থিরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

এই অন্তর্ম্মুখীন প্রাণায়ামে চঞ্চল প্রাণ দ্বারা বিকার হইয়া যে রোগ শোকে মায়িক জীব কাতর হইত, তাহা নিবারণ হয়। প্রাণের স্থিতিতে শরীরে লাবণ্য প্রকাশ হয়, অহোরাত্র ভগবৎ নেশায় বিমল আনন্দে থাকিয়া এই নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা প্রত্যেক কার্য্য করিয়াও আশক্তি শূন্যতা হয়। ইহা নিজ বোধরূপ।

কেবলমাত্র এই অন্তর্ম্মুখীন প্রাণায়াম করায়, যন্ত্র সকলের ময়লা—যাহা হইতে ব্যাধির উৎপত্তি হয়, তাহা পরিশুদ্ধ হইয়া অসাধ্য রোগাক্রান্ত জীব সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যে ক্ষয়কাশ এবং যক্ষা কোন চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই; এমন কি "ঐ রোগগ্রস্ত রোগী ৭ দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।" কলিকাতা মেডিকেল কলেজে বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারগণ রোগীকে বাটিতে পাঠাইয়া দেন। ঐ রোগী কেবলমাত্র এই ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া, আমাকে বক্ষস্থল পরীক্ষা করাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বি, টি, পাঠ করিতে কলিকাতায় যান। যিনি জীবনে হতাশ হইয়াছিলেন—আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, তাঁহার বক্ষস্থল পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এবং দেহ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

এই ব্যাধিগ্রস্ত তিনজন লোক এই কার্য্য করায় আরোগ্য হইয়া-

ছেন। একজন এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হন নাই, তবে শীঘ্রই যে আরোগ্য হইবেন সে বিষয়ে আশা আছে এবং রোগীরও দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। ইনি যে রোগমুক্ত হইবেন, পূর্ব্বে সে আশাই ছিল না।

যে এ্যাপেণ্ডিস্-সাইটিস্ দুরারোগ্য, তাহা একজন খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ বি, এ, এম, ডি, এই কর্ম্মের জন্য জীবন পাইয়াছেন। সিভিল সার্জ্জন এই ডাক্তার বাবুর এ্যাপেণ্ডিস্ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, এখন পাকে নাই, তবে পাকিবে। পাকিলে, তাহা অস্ত্রপ্রয়োগ ভিন্ন উপায় নাই এবং তাহার ফলাফল বলা সুকঠিন। তিনি উক্ত স্থানে যন্ত্রণাসহ জ্বরে শয্যাগত অবস্থায় আমাকে রোগ বৃত্তান্ত লিখেন। আমি তাঁহাকে তাঁহার গুরু-প্রদত্ত এই অন্তর্মুখীন প্রাণায়াম, যাহা তিনি পাইয়াছেন, শয়ন অবস্থাতেই সাধন করিতে লিখি। আমার উপদেশ মত কার্য্য করিয়া এবং অন্য কোন ঔষধ সেবন না করিয়া সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হন।

শরীরের কোন স্থানে স্ফোটক হইবার পূর্ব্বে সেই স্থান রসের আধিক্যে স্ফীত হয়, তৎপরে পুঁজে পরিণত হইলে পাকিয়া যায়। এই প্রাণায়ামে নাভিপদ্ম হইতে মণিপুর চক্র হইতে (যাহা তেজের আধার) এবং স্থির বায়ুর সঞ্চালনে ঐ রোগাক্রান্ত স্থান পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়ায়, ফোমেনটেশনের ন্যায় কার্য্য দ্বারা পক্কাবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া শোধন ক্রিয়া দ্বারা নিরাময় হইয়া যায়।

সাধারণ লোকের ধারণা অক্সিজেন ভিন্ন জীব দেহের রক্ত পরিশুদ্ধ হয় না। শ্বাস গ্রহণে অক্সিজেন লওয়া হয়, তদ্দ্বারা ফুস্ফুসে রক্ত পরিষ্কার হইয়া ঐ রক্ত সর্ব্ব শরীরে সঞ্চালিত হওয়ায় জীব জীবিত থাকে এবং শরীর মধ্যস্থ কার্ব্বলিক এসিড্ বাষ্প প্রশ্বাসরূপে বিষাক্ত জিনিষ নির্গত হওয়ায় বিষশূন্য হইয়া জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু একথা আমি বিশ্বাস করি না, ভারতে অনেক সাধু খুঁজিলে পাওয়া যাইবে,

যাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস নাই অথচ দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া লাবণ্যযুক্ত দেহ লইয়া সুখে বসবাস করিতেছেন। (সু অর্থে সুলভ, খ অর্থে ব্রহ্ম, ব্রহ্মে সদা অবস্থিতি করিতেছেন)।

মন, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শন শক্তির আক্রমণ দ্বারা বহির্বিষয়ে ধাবিত করাইয়া মায়িক জীবকে অহোরাত্র প্রলোভিত করাইতেছে। কিন্তু এই অন্তর্মুখীন নিষ্কাম কর্ম্ম সদ্গুরুর আদেশ মত যদি সাধক বিধিপূর্ব্বক করেন, তাহার ফলে মন বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ এবং স্পর্শে আসক্ত হয় না। প্রবৃত্তিসূচক মনের ধর্ম্ম, যদি অন্তরে ঐ রূপ, রস, গন্ধ শব্দ এবং স্পর্শ-গুণ বিশিষ্ট জিনিষ উপভোগ করিতে পায়, তাহা হইলে মন বহির্বিষয়ে ধাবিত না হইয়া শরীর অভ্যন্তরস্থ বিষয়ে মুগ্ধ হয় এবং তজ্জন্য মন বাহিরের বিষয় লালসায় ধাবিত হইতে পারে না। ভিতরে মন পরমানন্দে অবস্থিতি করে। উপসংহারে বিচারে এই স্থিরীকৃত হইল।

এই বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মে আয়ুক্ষয় নিবারণ এবং ব্রহ্মানন্দে সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্তভাবে অতিবাহিত করা যায়। পূর্ব্বকালের ঋষিগণ এই বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া সিদ্ধমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আমাদের ন্যায় অজ্ঞানী মানবের মঙ্গলের জন্য রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপনিষদ, দর্শন, বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি এবং শ্রুতি প্রভৃতি মহান্ ধর্ম্মগ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থগুলির আধ্যাত্মিক অর্থ, কিন্তু আধ্যাত্মিক কর্ম্ম অভাবে গল্পে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। কারণ ঐ সকল গ্রন্থের লিখিত বিষয়গুলি যোগান্তর্গত।

ঋষিগণের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে এবং তাহার অনুশীলন করিলে, তাহার ফলে যে যে অবস্থা অনুভূতি হয়, সাধকের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য উল্লিখিত গ্রন্থগুলি অবস্থার মত পাঠ করিলে আত্মকর্ম্মের অবস্থাগুলির সহিত মিলিয়া যাইবে এবং তাহাতে মনের আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে। এই

উদ্দেশ্যে ধর্ম্মগ্রন্থগুলি লিখিত হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া তাহা হইতে উদ্ভূত অবস্থাগুলি হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি ঋষিগণের ধর্ম্মগ্রন্থে ঠিক ঐরূপ অবস্থাগুলি লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা অনুধাবন করিয়া সাধকের কি বিমল আনন্দ হয়, এমন কি তাহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য অপরের নিকট যাইতে হয় না।

যেমন ডাক্তারি "শরীর বিদ্যা" গ্রন্থে যে সকল চিত্রাদি দৃষ্ট হয়, শবচ্ছেদ কালিন মৃতের অঙ্গ কর্ত্তন করিয়া ঐ এ্যানাটমি গ্রন্থস্থিত চিত্রের এবং মনুষ্য দেহস্থিত শির, ধমনী, মাংসপেশী, অস্থি ইত্যাদি কোথা হইতে আরম্ভ হইয়া কোথায় শেষ হইয়াছে সামঞ্জস্য করিয়া মিলাইয়া লইলে কত সুবিধা হয় এবং মনেও দৃঢ় ধারণা হইয়া যায়। তদ্রূপ সাধন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগুলি যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহা পুরাণ, উপনিষদ, স্মৃতি, শ্রুতি ইত্যাদি গ্রন্থে লিখিত আছে, তাহা অনায়াসে মিলাইয়া লইতে পারা যায়। এখন ঋষিগণের এই নিষ্কাম যোগক্রিয়া —যাহা উপদেষ্টা অভাবে মেকিতে পরিণত হইয়া প্রকৃত প্রাণধর্ম্মের এই দুরবস্থা হইয়াছে। ঋষিগণের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম মহাজ্ঞানী উপদেষ্টা অর্থাৎ সৎগুরুর অভাবে সকাম ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে।

সকলেই যে নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন তাহা নহে, কারণ পূর্ব্ব জন্মের কিছু সংস্কার না থাকিলে এই নিষ্কাম যোগক্রিয়া পাওয়া যায় না। ফলাকাজ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম বা নিষ্কাম ধর্ম্ম অবিধি নহে, কারণ এই ধর্ম্ম অনুশীলনে চিত্তশুদ্ধি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, যাহা মনে ধারণা হয়, তাহা মন্দের ভাল। সকাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ ভগবানকে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করেন। তাঁহার যে অংশই নাই, তাহা কয়জন অনুধাবন করেন। তাঁহার কি মূর্ত্তি আছে? যদি তাহা থাকিত, তবে ভগবান ব্যাসদেব মহাভারত গ্রন্থ শেষ করিয়া চারি চরণযুক্ত একটি শ্লোক রচনা করিতেন না। যথা :—

রূপং রূপ-বিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং,
স্তুত্যানির্ব্বচনিয়তাখিলগুরো দূরিকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতঞ্চ ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্‌বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

এই শ্লোকে প্রমাণ হইতেছে, তাঁহার হস্তপদ বিশিষ্ট কোন রূপ নাই। তবে যে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া, মূর্ত্তি গঠন করিয়া সকাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ পূজা করিয়া থাকেন, তাহা গৌণ পূজা, মুখ্য পূজা নহে।

মনে করুন, একজন সামান্য মানবের কত উপাধি হইতে পারে। সেই একই ব্যক্তি পিতা, খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শ্যালক; ভগ্নীপতি, শ্বশুর, স্বামী, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, মেসো, পিসে, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, চেয়ারম্যান প্রভৃতি নানা উপাধিতে ভূষিত হন। যিনি বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বর, তাঁহার তো অনন্ত প্রকার উপাধি হইবার কথা। শিব, কৃষ্ণ, ব্রহ্মা, ব্রহ্ম, কালী, জগদ্ধাত্রী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক গণেশ, মনসা, শীতলা ইত্যাদি অনন্ত উপাধি ধারণ করিয়া, "প্রাণ বিষ্ণু পিতামহ, প্রাণেন ধার্য্যতে জগৎ; সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ।" সেই স্থির প্রাণ আধার স্বরূপ হইয়া সর্ব্ব মূর্ত্তি উপাধিতে বিরাজমান রহিয়াছেন। সকাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা দ্বারা অবিধি পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। পূজা শব্দের অর্থ প্রকৃতি পুরুষের সংমিলন। সে পূজা কয়জন লোক করেন?

চঞ্চল প্রাণ দ্বারা স্থির প্রাণের মিলন প্রকরণই যোগক্রিয়া। একটি জিনিষ এবং আর একটি জিনিষ একত্রিত করিলেই যোগ হয় অর্থাৎ যুক্ত হয়। তবে যাঁহারা সৎগুরু প্রদত্ত কার্য্য না পান, তাঁহাদের পক্ষে এই মূর্ত্তি গঠন করিয়া গৌণ পূজা অকরণীয় নহে। ইহা হইতে সময়ে সৎগুরু লাভ করিয়া সিদ্ধমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। কোন না কোন জন্মে এই নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বারম্বার দেহান্তর

প্রাপ্তি না হইয়া সিদ্ধ মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত মৃত্যুর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। তাহা সাধন সাপেক্ষ। প্রকৃত মৃত্যু—যাহা হইলে সংসারে যাতায়াত বন্ধ হয়, তাহা দশ হাজারের মধ্যে একজনের হয় কিনা সন্দেহ। তখন সাধকের বিজ্ঞান অবস্থা হয়।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সকাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ নানা দেবদেবী মূর্ত্তি গঠন করিয়া তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বে মূর্ত্তি পূজার প্রকরণ ছিল না, ঋষিগণের নিষ্কাম ধর্ম্মেরই প্রচলন ছিল। তাহার পরে বঙ্গদেশে সুবিখ্যাত মহাপণ্ডিত আগম-বাগীশ প্রথমে কালীমূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করেন ; তাহার পরে নবদ্বীপের রাজবাটিতে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা হয়।

কালী যে তাঁহার স্বামীর বুকের উপর বুঝিতে না পারিয়া দুইখানি পদ দ্বারা চাপিয়া পরে জ্ঞান হইলে লজ্জায় জিহ্বা বাহির করিয়াছিলেন, ইহা কি সম্ভব ! কালী মহাশক্তি, কালেতে ঈকার শক্তি সংযোজনায় 'কালী' কথার উৎপত্তি। সেই শক্তির অন্তর্দ্ধ্যানে মহাপ্রলয় সংঘটন হয়। আবার 'জীব মাত্রেই শিব" শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। তাহা হইলে কালীর এইরূপ আচরণ, ইহা কি সম্ভবপর ? ইহার গূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ আছে। (মৎপ্রণীত 'ভক্তি-সঙ্গীত' দ্রষ্টব্য)। কালীপূজা সম্পূর্ণ যোগান্তর্গত। যতপ্রকার মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করা হইয়া থাকে, তাহার উদ্দেশ্য মহান্ ; সকলই নিষ্কাম কর্ম্ম প্রসূত।

এই নিষ্কাম কর্ম্ম রত্নাকর দস্যু প্রাপ্ত হইয়া গুরু উপদেশ মত উল্টা রাম নাম জপ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছিলেন, অর্থাৎ মরা মরা অজপা জপ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'ম' মণিপুর চক্রের সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং 'র' আজ্ঞাচক্রের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। মণিপুর চক্রস্থিত প্রাণকে আকর্ষণ করিয়া আজ্ঞাচক্রে লইলে মরা কথা হয়। সেই জন্য কথিত হয়,—"উল্টা নাম জপত জগ জানা, বাল্মিকী হয়া ব্রহ্ম সমানা।"

এই প্রক্রিয়া গুরু উপদেশ গম্য। গুরু উপদেশ-মত প্রাণের কৌশল মত কার্য্য অর্থাৎ যোগকর্ম্ম কৌশলম্। কৌশল্যা হইতে রামের জন্ম হয়, রাম শব্দের অর্থ "স্থির প্রাণ"। বারম্বার মরা মরা করিলে অর্থাৎ প্রাণের সহিত অন্তর্মুখীন প্রাণায়াম করিলে, প্রাণ আজ্ঞাচক্রে স্থিতি লাভ করে। সমস্তই গুরু উপদেশ গম্য, সাধনায় প্রাপ্তব্য।

উপনিষদের একটি শ্লোকে লিখিত আছে,—"প্রণবোধনু শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে ইত্যাদি"। প্রণব ওঁ কারের ন্যায় কিঞ্চিৎ বক্র আকার বিশিষ্ট মেরুদণ্ড। শরই আত্মা, শরকে বাণ কহা যায়, অর্থাৎ বাণলিঙ্গ স্বরূপ প্রাণ, যাহা মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রস্থিত ব্রহ্মযোনী পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এই বাণস্বরূপ শিবলিঙ্গ নিম্ন হইতে, ব্রহ্মযোনীতে প্রবেশ করিতেছে এবং ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে মূলাধারে নামিতেছে। যখন এই প্রাণের ঊর্দ্ধে গতি হয়, তখন তাহাকে পুরক কহে এবং ঐ স্থির প্রাণ যখন নিম্নে মূলাধারে নামে, তখন তাহাকে রেচক কহে। এই আত্ম-মৈথুন করিতে করিতে নিম্নস্থ প্রাণ ব্রহ্মযোনীতে স্থিতি লাভ করে, তাহার ফলে প্রকৃষ্ট জ্ঞানরূপ পুত্রলাভ হয়। ইহা মুখে উচ্চারণ করিলে হয় না, সম্পূর্ণ সৎগুরুর উপদেশ সাপেক্ষ।

পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখুন, এই বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম অনুশীলন করিলে ভগবান উপাধিতে ভূষিত হওয়া যায়। ভগ অর্থে ব্রহ্মযোনী, বান অর্থে বাণলিঙ্গ শিব—প্রাণ। সেই প্রাণ ব্রহ্মযোনীতে সংমিলিত অবস্থাপন্ন সাধকই ভগবান ভাবাপন্ন। আজকাল আবার অনেকে বলিয়া থাকেন, প্রাণের কর্ম্ম অর্থাৎ যোগকর্ম্ম করিলে বায়ু বিকৃত হইয়া অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহা কি সঙ্গত কথা? অহোরাত্র-বহিঃপ্রাণের কার্য্যে বায়ু বিকৃত হইয়া রোগ-শোকে জীবের আয়ু ধ্বংস হইতেছে। যাহা আহার করে তদ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তে জীবের আয়ুক্ষয় হইতেছে, ক্ষতির পূরণ হয় না। প্রতিদিন জীবের ২১৬০০

বার প্রাণ বহির্গত হইয়া যাইতেছে, যদি আহার দ্বারা তাহার পুরণ্ হইত, তাহা হইলে অকালমৃত্যু ঘটিত না। শাস্ত্রে ঋষিগণ লিখিয়া গিয়াছেন,—"প্রাণায়াম সর্ব্বরোগনাশনম্ ইত্যাদি"।

অতএব প্রতিপন্ন হইল, এই বৈজ্ঞানিক যোগক্রিয়া গুরুর উপদেশ মত বিধি পূর্ব্বক করিতে পারিলে, দীর্ঘায়ু লাভ এবং আনন্দে নিমগ্ন থাকিয়া সাংসারিক সমস্ত কার্য্য নির্লিপ্তভাবে করা যায় এবং রোগ-শোক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়।

আরতি

আ = অ, রতি = কামনা

যদ্দ্বারা নিষ্কাম অবস্থা লাভ হয়, তাহাকে আরতি কহে। প্রত্যেক পূজায় প্রায় আরতি করা হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্রহ্ম-গায়ত্রীর কার্য্য করা হয়; তাহা অন্তর্মুখীন প্রাণায়ামের কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। আজকাল পুরোহিতগণ ঐ কার্য্যে অনভিজ্ঞ; তজ্জন্য পুষ্প, জল, পঞ্চপ্রদীপ, চামর এবং শঙ্খের দ্বারা আরতি করেন। তবে উহা ব্রহ্ম-গায়ত্রী জানিবেন।

যে কার্য্য করিলে আ-রতি হয়, অর্থাৎ নিষ্কাম অবস্থা হৃদয়ঙ্গম হয় অর্থাৎ মনোরতি নষ্ট হয়, তাহাই প্রকৃত আরতি জানিবেন। মূলাধার অর্থাৎ ক্ষিতি-তত্ত্ব, ক্ষিতির বিষয় গন্ধ; সাধিষ্ঠান = জলতত্ত্ব, যাহার গুণ রস বা জল; মণিপুর, যাহার গুণ তেজ; অনাহত, যাহার গুণ বায়ুদ্বারা স্পর্শ এবং বিশুদ্ধাখ্য, যাহার গুণ শব্দ। এই কয়টি দ্বারা উঠা নামা করিলে অর্থাৎ রেচক পুরক করিলে প্রাণায়াম হয়।

পুরোহিত মহাশয়গণ না জানার জন্য, ধারাবাহিকরূপে পঞ্চতত্ত্বের বিষয়গুলির সঞ্চালন করেন না। হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির সাহায্যে মূলাধারস্থ পদ্ম হইতে—পুষ্প, যাহা মূলাধারের বিষয় গন্ধ; সাধিষ্ঠানের বিষয়—যাহা শঙ্খের মধ্যস্থিত জল; মণিপুরের বিষয়—পঞ্চ প্রদীপস্থ তেজ অর্থাৎ আলোক; অনাহতের বিষয়—স্পর্শ, যাহা চামররূপে বায়ু এবং বিশুদ্ধাখ্যের বিষয় শব্দ, যাহা শঙ্খ বা ঘণ্টার নিনাদ। ইহাদিগকে লইয়া হস্তের সাহায্যে একবার ঊর্দ্ধদিকে, একবার নিম্নদিকে

সঞ্চালন করা হয়। এইরূপ করিলেই আরতি হয় অর্থাৎ মনের রতি অর্থাৎ ইচ্ছার নাশ হয় বা আ-রতি হয়!

পুরোহিতগণ অনভিজ্ঞতার জন্য এইরূপ করিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বকালে ঋষিগণ মূলাধারস্থিত স্থিরপ্রাণকে প্রতি চক্রের বিষয়গুলিকে আকর্ষণ করিয়া উর্দ্ধে লইয়া অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে লইয়া গিয়া পূরক করিতেন এবং ঐ সকলকে প্রতিচক্রে মন সংযত করিয়া নামিতেন অর্থাৎ রেচক করিতেন। এই প্রকরণ একবার দুইবার করিলে আরতি হয় না, অনেকক্ষণ এই ভিতরের আরতির প্রকরণ করিয়া, প্রাণ মনের স্থিরতা সম্পাদন করিয়া আনন্দে নিমগ্ন থাকিতেন।

পুরোহিতগণ যদি সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বাহিরের প্রকরণ ত্যাগ করিয়া ঠিকপথে প্রাণের গমনাগমন করিয়া প্রকৃত আ-রতির অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতেন এবং বিমল আনন্দে মুগ্ধ হইতেন। ব্রহ্ম-গায়ত্রী যথা—মেরুমধ্যে স্থিরবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ; এই ষটচক্র ভেদ করিয়া তপোলোকে থাকিতে পারিতেন। ইহাই প্রকৃত আ-রতি অর্থাৎ নিষ্কাম অবস্থা প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট সোপান।

গীতাতে—"ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্য ভবার্জ্জুন।" এই শ্লোকটি লিখিত আছে। এখন বিচার করিলে এই বুঝা যায় যে তিনগুণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, গুণে মন থাকিলে ঐ মন প্রবৃত্তি-বাচক হয়। তিনগুণ যথা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইঁহারা তিন দেবতা; সকাম ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রবৃত্তি-সূচক মন দ্বারা বিষয়ে আবদ্ধ হয়। এই তিন গুণের উর্দ্ধে না যাইলে পূর্ণ নিষ্কাম অবস্থা হইবার উপায় নাই। কারণ, গুণের মধ্যে প্রবৃত্তি-সূচক মন বিচরণ করে, সুতরাং কামনা মনের প্রধান সহচর। আবার শাস্ত্রে কথিত আছে, সত্বগুণ বিষ্ণু, রজগুণ ব্রহ্মা এবং তমোগুণ মহেশ্বর। যোগশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সত্বগুণ—সুষুম্না নাড়ীতে

যখন প্রাণের গতি হয় তখন বুঝিতে হইবে মন সত্ত্বগুণে আছে; রজোগুণ, পিঙ্গলা নাড়ীতে মনের গতি থাকিলে রজোগুণের প্রকাশ এবং ঈড়ানাড়ীতে মনের গতিতে, তমগুণে মন, রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই তিন গুণের উর্দ্ধে মনের স্থিতি বা প্রাণের স্থিতি না হইলে মনুষ্য বিষয় হইতে অব্যাহতি পায় না।

এখন দেখা যাউক তমগুণ শরীরের মধ্যে কোন স্থান অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তাহার উত্তর এই যে, মেরুদণ্ডের মধ্যে ছয়টি চক্র বা পদ্ম আছে; তমগুণের স্থান মূলাধার-চক্র হইতে মণিপুর-চক্রের নিম্ন পর্য্যন্ত। ইহাতে মন থাকিলে নীচ কার্য্যের প্রতি মনের আশক্তি হয়, যথা—মৈথুন, অখাদ্য ভোজন, চৌরকার্য্য, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি। জীব এই সকল কার্য্যে ব্যাপৃত হয় এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

মণিপুর-চক্র হইতে বিশুদ্ধাখ্য-চক্রের নিম্ন পর্য্যন্ত রজগুণের স্থান। যখন মন এই গুণের মধ্যে প্রাণের সহিত বিচরণ করে, তখন মায়িক জীব অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়, যেন নিজেই সর্ব্বময় কর্ত্তা। রজগুণের আহার মাংস, মৎস্য, পেঁয়াজ প্রভৃতি; এতদ্ব্যতীত কাম-রিপুর প্রাবল্য খুব বেশী হয়। তখন মনে হয়,—"খাও দাও উড়াও কম্বল, মরে যাবার সময় ঘোড়ার ডিম সম্বল।" সর্ব্বদা পরের অনিষ্ট কামনা, মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া প্রতিবাসীর সর্ব্বনাশ, পরস্ত্রী হরণ প্রভৃতি দুষ্কার্য্যে রত হয় এবং অর্থকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার বলে লোকের অনিষ্ট সাধন করে।

বিশুদ্ধাখ্য-চক্র হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত সত্ত্বগুণের স্থান। যখন মন ও প্রাণ বিশুদ্ধাখ্য-চক্র হইতে আজ্ঞাচক্রে গমন করে তখন সৎ-কামনার আবির্ভাব হয়, কোন প্রকার দুষ্কর্ম্মে মতি না হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। ভাল মন্দের বিচার-শক্তি হয়, বিনয়ী হয় এবং

ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হয়। কিন্তু সত্বগুণে মনের অবস্থিতি হইলেও তখন সৎকাম বর্ত্তমান থাকে, নিষ্কাম হয় না। আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে অর্থাৎ সহস্রারে মনের স্থিতি হইলে, ঠিক নিষ্কাম অবস্থা হয়। নিজের কর্ত্তৃত্ব নষ্ট হয়, তখন যত কিছু কার্য্য হউক না কেন, ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে আমি কূটস্থ চৈতন্যে আছি, ঐ সকল কার্য্যের জন্য আমি দায়ী নহি, এইরূপ ভাব হয়। ভগবৎ নেশায় আনন্দে সময় অতিবাহিত হয়, সে অতি দুর্লভ অবস্থা; চক্ষু বাহিরে যাহা দর্শন করে তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, কূটস্থ যে দেখিতেছি—আমি নহি, এইরূপ বোধ হয়। কিন্তু তখনও মন থাকে, তবে সত্বগুণের ঊর্দ্ধে থাকায় গুণের অতীত অবস্থায় অবস্থিত হয় বলিয়া গুণাতীত অবস্থা বলিয়া বর্ণিত হয়। তখন মেরুদণ্ডের মধ্যে স্থিরভাবে প্রাণের গতিবিধি হয়, তাহা না হইলে জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তমগুণ ছাড়িয়া রজগুণে থাকিলে তাহার লক্ষণ কিরূপ হয়? তাহার উত্তর এই, তখন ভিতরে প্রাণের সঞ্চার নাভিদেশ হইতে ঊর্দ্ধদিকে যাতায়াত করে, তাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। যখন মন প্রাণ রজ হইতে সত্বগুণে অবস্থিতি করে, তখন প্রাণ মন কণ্ঠের ঊর্দ্ধে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত গমন করে এবং তখন বিশুদ্ধাখ্য-চক্র হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত টান থাকে, ইহা নিজ বোধরূপ। তাহার প্রমান,—কালী বা প্রাণ শক্তি; মূলাধার-চক্রে কালীর এক পা এবং অপর পা কণ্ঠের নিম্নে রক্ষিত হয়, ইহা কালীমূর্ত্তিতে দেখান হইয়াছে। ইহার অর্থ—মূলাধার হইতে বিশুদ্ধাখ্য-চক্র পর্য্যন্ত প্রাণের ধারণা দেখান হইয়াছে।

জীব মাত্রেই শিব—তখন ঊর্দ্ধনেত্র হয়। সহস্রার হইতে সুধাক্ষরণ বশতঃ নেশায় ভোর হইয়া আছেন; নিম্নস্থ শিবমূর্ত্তিতে তাহা দেখান হইয়াছে। তখন মন প্রাণ আনন্দে নিমগ্ন; এই অবস্থা হইলে শ্বাস

প্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়ায়, জীব উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ঈড়া পিঙ্গলার উর্দ্ধে ধারণ হয়। সুষুম্না সহস্রারে মিলিত হইয়া যোগের চরম অবস্থায় উপস্থিত হয়। তখন জীবাত্মা পরমাত্মায় সংমিলিত হয়, ইহাই "নিস্ত্রৈগুণ্য" অবস্থা। ইহাতে দৃষ্টির স্থিরতা হয়, তজ্জন্য চক্ষের পলক পড়েনা।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অর্থাৎ "শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কি?" তাহার নির্ণয়, যথা—"প্রাণ বিষ্ণু পিতামহ, প্রাণেন ধার্য্যতে জগৎ।" বিষ্ণু অর্থে প্রাণ, সেই প্রাণ নিষ্কাম, সেই নিষ্কাম কর্ম্মই যোগ কর্ম্ম। তাহার প্রচার, কৃষ্ণচন্দ্র নামধারী, যিনি অবতার হইয়া আত্মধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, যিনি মথুরা হইতে বৃন্দাবনে শিশু অবস্থায় তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক আনীত হন। ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাখাল বালকগণের সহিত মিলিত হইয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেন এবং সময়ে এক মুনির নিকট আত্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কালিয় দমন অর্থাৎ কাল-রূপ নাগ, যাহা শরীরের মধ্যে অহোরাত্র ফোঁস ফোঁস করিয়া বহিঃ-প্রাণের আলোড়ন অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসরূপে জীব দেহে থাকিয়া জীবের আয়ু কমাইয়া থাকে।

যে চঞ্চল বায়ু-রূপী শ্বাস, কালীয় দহ-রূপী মেরুদণ্ডের ভিতরের গহ্বরে অবস্থিতি করে, তাহাকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণের বহির্মুখী গতিকে অন্তর্মুখী করিয়া (প্রাণায়াম সাধন করিয়া) চঞ্চল বায়ুকে হীনবল করিয়াছিলেন এবং মানবের শত্রুরূপী কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যকে সাম্যকরণ উদ্দেশ্যে কাল-স্বরূপ নাগকে মর্দ্দন করিয়া, মস্তকে অন্তরের কৃষ্ণচন্দ্রকে তাহার উপর দণ্ডায়মান

করেন। তাহাই কালিয়-দমন। কালিয় নাগের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাহার সমস্ত সঙ্গি-নাগগণ কৃষ্ণচন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার করেন, অর্থাৎ অবশিষ্ট ৪৮ বায়ুর স্থিরাবস্থা হয়। ইহাই প্রাণায়ামের ফল।

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, নন্দ ও উপানন্দ ইন্দ্রদেবের পূজা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে বলেন,—"আপনারা ইন্দ্রের পূজা করিবেন না।" তদুত্তরে নন্দ ও উপানন্দ বল্লেন,—"আমরা গোপ জাতি, গোগণকে রক্ষা করাই আমাদের ধর্ম্ম; ইন্দ্রের বৃষ্টিপাতে গোগণ ভাসিয়া যায় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহা নিবারণ উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের পূজা করিলে ঐ বিপদ হইতে গোগণ রক্ষা পাইয়া থাকে, তজ্জন্য আমরা ইন্দ্রের পূজা করিয়া থাকি।" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "কোন চিন্তা নাই, আমি গোবর্দ্ধন ধারণ করিলে গো রক্ষা হইবে।" অতঃপর বৃন্দাবনে ইন্দ্রের পূজা বন্ধ হয়। ইন্দ্র, বরুণ, বায়ুর পূজা সকাম ধর্ম্ম, ইহা কামনা প্রসূত, শ্রীকৃষ্ণ এই বৈদিক ধর্ম্ম বন্ধ করিয়া দেন।

এখন দেখা যাউক শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া গো রক্ষা করেন। গোবর্দ্ধন ধারণ, গো=জিহ্বা, বর্দ্ধন=যদ্দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ধারণ= তালু গহ্বরে ধরা, অর্থাৎ তালু গহ্বরে জিহ্বার প্রবেশ লাভ। এই কার্য্যের দ্বারা, গো অর্থাৎ জিহ্বা বাহিরে থাকিয়া নানা কথা বলায় জীব নানা কামনায় ভাসিয়া বেড়াইত, তালুমূলে প্রবেশ করায় অনেক সময় মৌন থাকায় বাক্যস্রোতে নানা কামনা হইতে অব্যাহতি লাভ করে। এই গোবর্দ্ধন ধারণে কামনা কমিয়া যায়, জিহ্বার সংযম হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বৈদিক ধর্ম্ম বন্ধ করেন। ঐ সময়ে তথায় তান্ত্রিক ধর্ম্মও প্রবলরূপে অনুশীলন হইত। আয়ান ঘোষের বাটীতে কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, আয়ান ঘোষ, তাহার স্ত্রী জটিলা এবং তাহাদের মাতা কুটিলা কালীর উপাসনা করিয়া পশুবলি দিতেন।

কিন্তু আয়ানের পত্নী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিষ্কাম ধর্ম্মের পোষকতা করিয়া তাঁহার নিকট গোপনে দীক্ষিতা হইয়া নির্জ্জনে তাহা সাধন করিতেন। তজ্জন্য আয়ানের ভগ্নী ও মাতা শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মে হতশ্রদ্ধ হইয়া রাধিকার কলঙ্ক প্রচার করেন এবং যে সমস্ত গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন, তাহাদের সকলকে ব্যাভিচারিণী আখ্যা দিয়া জনসমাজে তাহাদের কুৎসা করিয়া বেড়াইতেন।

শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে জটিল ও কুটিল বুদ্ধি বিশিষ্টা জটিলা ও কুটিলাকে দেখাইয়াছিলেন কালী কৃষ্ণ বিভিন্ন নহে। সেইজন্য আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধিকা একদিন শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেছিলেন, আয়ান ঘোষ বাটি আসিবামাত্র তাহার ভগ্নী ও মাতা বলেন, "দেখ, তোমার স্ত্রীর বিষয় আমাদের কথায় বিশ্বাস করিতে না, এখন দেখ, রাধিকা কালীর উপাসনা না করিয়া কৃষ্ণের উপাসনা করিতেছে।" তখন আয়ান দেখিলেন, কালী কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন, রাধিকা তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ভজনা করিতেছেন। সেই জন্য কথায় বলে,—"কালী হল মা রাসবিহারী।" এখনও বঙ্গদেশের অনেক স্থলে ঐ মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে।

যখনই জীবের মঙ্গলার্থ কোন ধর্ম্ম প্রচারকের আবির্ভাব হইয়া থাকে, এমন কি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগেও ধর্ম্মবিদ্বেষীগণ ধর্ম্ম প্রচারকের কুৎসা করিয়া আসিতেছেন, এখনও ঐরূপ হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখুন, শ্রীকৃষ্ণ ১৩ বৎসর বয়স্ক বালক, বৃন্দাবনে ধর্ম্মপ্রচার শেষ করিয়া মথুরা গমন করেন। তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ অস্বাভাবিক নহে কি? তিনি যখন দেহত্যাগ করেন, তাঁহার প্রপৌত্র বজ্রকে রাখিয়া ৭৫ বৎসর বয়ক্রম কালে দেহত্যাগ করেন।

বৃন্দাবনের স্ত্রী পুরুষ গোপ জাতিয় নহেন। গোরক্ষা অর্থাৎ সাধন দ্বারা জিহ্বাকে তালুমূলে রাখিতেন এবং গোপনে আত্মধর্ম্মের উৎকর্ষ

করিতেন। তজ্জন্য বিধর্ম্মীগণ অর্থাৎ বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মাবলম্বিগণ কলঙ্ক ও কুৎসা করিতেন।

১৩ বৎসরের বালক কৃষ্ণ হয়ত সাধিকাগণকে গোপন স্থানে লইয়া গিয়া ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন তাহাতে বিধর্ম্মীগণ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনীগণের চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের একটি বংশী ছিল, কোন স্থান হইতে ঐ বংশীধ্বনি করিলে গোপীগণ স্বামী পুত্র নিজ ভবনে রাখিয়া কৃষ্ণ সমীপে গমন করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের স্বামী কেন আপত্তি করিতেন না, ইহা ভাবিবার বিষয় নহে কি? মন্দ অভিপ্রায়ে যাইলে স্বামী নিশ্চয়ই বাধা দিতেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া মথুরায় গমন করিয়া কংশ বধ করেন। তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

ছিন্নমস্তা

নিম্নে পুরুষ অর্থাৎ বাণলিঙ্গ প্রাণ, ঊর্দ্ধমুখে ব্রহ্মযোনীতে অর্থাৎ স্ত্রী লিঙ্গের মৈথুন কারণ ইহাই বিপরীত বিহার, যখন মৈথুন করিতে করিতে ব্রহ্মযোনীতে বীর্য্য পতন হয় অর্থাৎ সহবাসের উদ্দেশ্য সমাপন হয়, তখন পরমানন্দে ব্রহ্মযোনীতে প্রাণের স্থিতি হয়; তখন ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্নাস্বরূপ সাধকের রক্ত—অনুরক্ত ঊর্দ্ধগত ভাবে ত্রিধারায় সহস্রারের নিম্নে ঈড়া পিঙ্গলার কার্য্যে যোগিনী পান করিয়া থাকে, সুষুম্না স্বরূপ মধ্য রক্তপ্রবাহ কালী স্বরূপ সাধকের মস্তকের সহস্রারে ঊর্দ্ধগত হয়, তজ্জন্য নিজে পান করিয়া থাকে। মস্তক বলিয়া কিছুই থাকে না, মস্তকই সকল খেয়ালের যন্ত্র, তখন মস্তক থাকিয়াও মস্তক হীন হয় অর্থাৎ মনের বিলয় হয় ইহাই ছিন্নমস্তার উদ্দেশ্য।

কালিয় দমন

কালিয় সর্প স্বরূপ, যাহা নরদেহে চঞ্চল রূপে জীবকে সদা দংশন

করিতেছে। প্রাণের বিশেষ আলোড়ন হইলে মন ভীষণ ভাবে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়। প্রাণের চঞ্চলতা হইতে মনের উৎপত্তি। সেই প্রাণ স্বরূপ কাল—কালকে যম কহা যায়, সেই কাল স্বরূপ প্রাণ জীবদেহে মিনিটে ১৫ বার গড়ে সঞ্চালিত হয়, সেই প্রাণের চঞ্চলতার আধিক্যে হিতাহিত শূন্য করাইয়া যথেচ্ছাচার করাইয়া থাকে এমন কি তাহার প্রভাবে ক্রোধ, সংমোহ, বুদ্ধিনাশ—এমন কি মৃত তুল্য হয়, পশুবৎ আচরণ, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটন করাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ সেইজন্য ঐ চঞ্চল প্রাণের মর্দ্দন করিয়া অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা তাহার দমন করিয়া তাহার মস্তকের উপর আরোহন করিয়া তাহাকে মর্দ্দন করিয়া তাহাকে স্থিতি করিয়া তদূর্দ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার দর্পচূর্ণ করিয়া তাহার ফণার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া সাধকের মুক্তি কামনায় প্রাণায়াম প্রকরণের উপায় দেখাইয়াছিলেন। ইহাই কালিয় দমন। তাহার অন্যান্য সঙ্গিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট করজোড়ে উপাসনা করিয়াছিল। (গুরু-বক্ত্রগম্য।)

গোবর্দ্ধন ধারণ

শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন নন্দালয়ে নন্দ উপানন্দ ইন্দ্রের পূজা করিতেছেন কারণ তৎকালে বৃন্দাবনে বৈদিকধর্ম্মের প্রচলন। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণের পূজা বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্গত, যাহা সকাম ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, পিতা! ইন্দ্রের পূজা করিবেন না। তদুত্তরে নন্দ কহিলেন, ইন্দ্রের পূজা না করিলে অতিশয় বৃষ্টিপাতের দ্বারা গোগণ ভাসিয়া যাইবে। আমরা গোপ, গরু আমাদের প্রধান অবলম্বন। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তজ্জন্য চিন্তা নাই, আমি গোবর্দ্ধন ধারণ করিলে গোরক্ষা হইবে; অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত জিহ্বা অর্থাৎ গো তালুমূলে—ত্রিকূটে স্থাপিত না হয় তৎপূর্ব্বে জীব কামনার অধীন থাকে. গো তালমূলে স্থিতি করিতে

পারিলে অর্থাৎ গো=জিহ্বা, বর্দ্ধন=ক্রিয়ার দ্বারা লম্বমান করা, ধারণ= ত্রিকুট পর্ব্বতে রাখা। এই গো-বর্দ্ধন ধারণ হইলে গোরক্ষা পায়। অনবরত জিহ্বা সঞ্চালনে কামনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, জিহ্বা তালুমূলে প্রবেশ করিলে তখন সাধকের কামনা সকল কমিয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে সাধক সাধিকাগণের ইঙ্গিৎ ছলে কালী প্রতিমায় তাহার জিহ্বা বহির্ভাগে লম্বমানা দেখান হইয়াছে। তালুমূলে উহা লম্বমানা করিয়া রাখিলে সাধক সাধিকা বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া বাহিরে লম্বমানা দেখান হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ক্রিয়ার দ্বারা জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ করেন। ইহার বহির্লক্ষ্যে গোবর্দ্ধন ধারণ, অন্তর্লক্ষ্য উপরে লিখিত হইল।

যজ্ঞোপবীত ধারণ

যিনি ঈড়া পিঙ্গলা আদিত্য হৃদয়ে ক্রিয়ার অতীতাবস্থায় ধারণ করেন, তিনি প্রাণ, মন, হৃদয়, এই তিন দণ্ড ধারণ করেন, তখন তিনি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হন। এই ব্রহ্মসূত্র ধারণই পৈতাধারণ তখনই প্রকৃত পবিত্র হন অর্থাৎ ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হন।

শিখা ধারণ

মস্তকের পশ্চাৎভাগে যে স্থানে শিখা রাখা হয়, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ঠিক মস্তকের পশ্চাতে একটা অনুভব করেন, সেই স্থানে মনে হয় একটা Sensation বোধ হয়। ব্রাহ্মণের মস্তক মুণ্ডন করিয়া শিখা ধারণের ব্যবস্থা আছে, সেই শিখায় গাঁট দিয়া ঝুলাইয়া রাখার ব্যবস্থা আছে। সেই গাঁটটি কূটস্থে বা আজ্ঞা-য় যেন স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা তথায় মন

থাকে। এখন আর স্পর্শ হয় না, সমস্ত মাথায় চুল রাখার জন্য তাহা এখন লোপ পাইয়াছে।

রাধার মান ভঞ্জন

রাধা পরা-প্রকৃতি অর্থাৎ শ্বাসের বহির্ভাগে আগম নিগমের কার্য্য ইনিই রাধা বাচ্য। এই রাধা অর্থাৎ স্থির প্রাণের অধীন। এই রাধার সম্বর্দ্ধনা দ্বারা অর্থাৎ প্রাণের বৃদ্ধিকরণ-রূপ অন্তর্মুখীন প্রাণায়াম দ্বারা নির্ব্বাণ অর্থাৎ শরই বাণ বাণলিঙ্গ আত্মা, চঞ্চল প্রাণবায়ু যাহা বাহিরে চলে, তাহা স্থিরপ্রাণে ব্রহ্মযোনীতে মিলন হয়। ইহাই নির্ব্বাণ অর্থাৎ বাণ থাকে না। বাহিরের প্রাণের আগম নিগম রহিত হয়, রাধিকার পদদ্বয় ঈড়া পিঙ্গলা স্থির প্রাণই শ্রীকৃষ্ণ ধারণ করেন। ইহাই মান ভঞ্জন, কারণ রাধার পদ ধারণ করা হইল।

গোপিনীর বস্ত্র হরণ

বস্ত্র স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; স্ত্রী পুরুষের ধর্ম্মই প্রাণশক্তি। যখন সেই প্রাণ সাধন দ্বারা নিস্প্রাণ অর্থাৎ প্রাণহীন অবস্থা হয় তখনই ধর্ম্ম থাকে না। শরীরের প্রত্যেক কার্য্যই বহিঃপ্রাণ শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হইযা থাকে। তাহার অভাবে অর্থাৎ ঐ প্রাণ বাহিরে না পড়িয়া ভিতরে ভিতরে কার্য্য হইতে থাকে, তাহাতে মনুষ্য মৃত্যুমুখে পতিত না হইয়া অন্তর শক্তির দ্বারা সকল কার্য্যই সম্পাদন অনাশক্ত ভাবে হয়। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, কদম্ব বৃক্ষের উপরে গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশী ধ্বনি করিতেছিলেন। গোপিনীগণ জল বিহার করিতেছিলেন। বিহার অন্তে নদীকুলে বস্ত্র না দেখিয়া যমুনার কুলে কদম্ব বৃক্ষের উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, বস্ত্রগুলি শ্রীকৃষ্ণ হরণ করিয়া লইয়া বসিয়া বংশী বাজাইতেছেন। গোপিনীগণ জলে

দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট বস্ত্র চাহিতেছেন। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, বৃক্ষতলে আসিয়া বস্ত্র চাহ, আমি তবে দিব। উলঙ্গ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ সমীপে যাইতে লজ্জিত, যাইতে পারিতেছে না। শ্রীকৃষ্ণ দেহের উপরে দৃষ্টিগোচর হইতেছে, মন ইন্দ্রিয়াদির বিষয়ভূত থাকায় মোহাচ্ছন্ন। তখনও গোপিনী অর্থাৎ সাধিকাগণ ভেদজ্ঞান কাটাইতে পারেন নাই। তাহার পরে এক ভাবাপন্না হইলে বস্ত্র প্রদান করেন।

কংস বধ

কংস শব্দে কামকে বুঝায়। মন, কামনা গত হইয়া ভোগিকান্ত বায়ুর সাহায্যে জীবদেহে কর্ত্তা সাজিয়া রাজত্ব করিতেছে। সাধক সৎগুরু প্রদত্ত নিষ্কাম কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া কামনাকে বিনাশ করিবার জন্য কূটস্থ অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্যে প্রাণায়াম পরতন্ত্র হইয়া মন-রাজ্য উচ্ছেদ করা হয়। কামনা তিন গুণের অন্তর্গত। প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হইতে জাত, আবার প্রাণের চঞ্চলতা হইতে মনের উৎপত্তি। পূর্ব্ববর্ণিত সাধক কালীয়দমন অর্থাৎ প্রাণায়াম করিয়া এবং গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া কংস অর্থাৎ কামকে সাধক হতবল করিলে কামনা আশ্রিত মন চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণকে দেখিতে পায় অর্থাৎ যখন কামনা শূন্য মনের অবস্থা সাধকের ঘটে তখন সাধকের মন চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণকে অর্থাৎ কূটস্থকে দেখিতে পান। বাহিরে কংস বধের সময় কংসের ঐ রূপ অবস্থা হইয়াছিল। শেষে কৃষ্ণ বাহু দ্বারা কংসকে বধ করেন। বাহু নামক বায়ু দ্বারা কামনা সংযুক্ত মনের বিশেষ সংঘটন হয় এবং কূটস্থে লীন হয়, তখন কামনা থাকা না থাকা সমান হয়। যেমন দুর্য্যোধন অর্থাৎ কামনা সুখ দুঃখের মধ্যগত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হরিষে বিষাদের সন্ধিক্ষণে।

জগদ্ধাত্রী পূজা

কুণ্ডলিনী—যিনি প্রাণ শক্তির আধার—কমলে বিরাজিতা; তাঁহার চৈতন্য—সাধন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সেই কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইলে কূটস্থ পুরুষে সংযোজন হয়। তাহা হইলেই সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রামায়ণ রহস্য

দশরথ—আদিত্য, তাহা হইতে স্থির প্রাণ অর্থাৎ রাম। যে লক্ষণ হইলে রাম ভাব হয়—যে লক্ষ্মণ রামের ছায়া স্বরূপ। মন, জনক অর্থাৎ মায়িক জীবের ধারণা দেহের ঠিক রাজা বা কর্ত্তা মন। ঐ মন সৎ-গুরুদত্ত নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ পাইয়া দেহরূপ কৃষিক্ষেত্র ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সাহায্যে ইড়া পিঙ্গলা দুইটি বলদ ও সুষুম্না লাঙ্গল স্বরূপ ও গুরুমন্ত্র ফালের সাহায্যে উঠা নামা রূপ কর্ষণ করিতে করিতে জ্যোতির্ম্ময়ী পরাপ্রকৃতি স্বরূপিনী সীতা, দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে উদয় হয়। তৎপরে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন অবস্থায় নানারূপ ক্রিয়া সাহায্যে আগম নিগম শক্তি স্থির হয়। ঐ সীতাদেবী স্থিরপ্রাণে সংমিলিত, তাহার অর্থই রাম। সীতার বিবাহ—বহ নামক বায়ুর সাহায্যে ব্রহ্মযোনীতে স্থির বায়ুর সহিত মিলন, ইহাই রামের বিবাহ। সাধক প্রতিদিন কৌশলরূপ ক্রিয়ার দ্বারা জ্ঞানরূপী সীতাকে সন্দর্শন লাভ হয়। প্রতিদিন দৃষ্টিগোচর হওয়ায় মোহ হয়। সহজ উপায়ে যখন দর্শন হয়; ইহাতো আমার হস্তগত। এই অহং যুক্ত মোহ রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ হয় অর্থাৎ জ্ঞান হারায়। তাহার পরে যে কৌশলে দর্শন হইতে ছিল তাহা দ্বারা আর কিছু মাত্র দর্শন হয় না, পুনরায় আত্মবিস্মৃতি

হইয়া যাইলে সীতান্বেষণ ও সাধকের নানারূপ মনকষ্ট, তৎপরে উদ্যমের সহিত সাধনায় মেরুশিখরে পঞ্চ বানরের সহিত মিলন। তন্মধ্যে প্রধান বায়ুরূপী হনুমান ও সুগ্রীব। তাহাদের সাহায্যে ক্রুর বায়ু বালীবধ, লঙ্কাপুরে এই দেহের হনুমান কর্ত্তৃক সীতার উদ্দেশ। সেতু পার হইয়া যুদ্ধ উদ্যোগ। রাক্ষস অর্থাৎ প্রবৃত্তিপক্ষের সহিত যুদ্ধ। ইন্দ্রজিত অর্থাৎ মনের দুর্ব্বল করণ। কুম্ভকর্ণ অর্থাৎ তমোগুণের বিনাশ সাধন। সর্ব্বশেষে মোহরূপ রাবণ অর্থাৎ রজগুণের উচ্ছেদ, যাহা সুষুম্নার পূজা ক্রমান্বয়ে ৩ দিন ৩ রাত্র সাধনের দ্বারা অর্থাৎ মন্ত্রপূত করিয়া লক্ষ্য করিয়া শর-দ্বারা মোহের হৃদয় ভেদ করণ। মোহ রূপ রাবণ যখন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখনই প্রকৃত পক্ষে বিজয় হয়। মোহ কাটিয়া যাইলে "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" জ্ঞান হয় তখন শত্রু মিত্র ইতর ভদ্র এক ভাবাপন্ন বলিয়া সাধকের জ্ঞান হয়। সেই মোহ বিনাশের পরে দুর্গার নিরঞ্জন হইলে কোলাকুলি করিয়া সকল একাকার দেখায়। তখন সাধকের ভগবৎ নেশা ও মুখ মিষ্ট বোধ হয়। তৎপরিবর্ত্তে আজ-কাল বিজয়ায় দিনে কোলাকুলি, সিদ্ধি খাওয়া, মিষ্টান্ন দান হয়। কিন্তু প্রকৃত বিজয় হয় না। কোলাকুলির সময়ে শত্রু মিত্র খুবই জ্ঞান থাকে। ইহার পরে সীতা উদ্ধার অর্থাৎ সাধকের উপরে, আজ্ঞাচক্রে জোতির্ম্ময়ী পরা প্রকৃতির দর্শন লাভ, পুরুষের সহিত একত্রিভূত দর্শন হওয়ায় ব্রহ্মানন্দে নিমগন।

কুণ্ডলিনী

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে—বাসুকি পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। তাহার মর্ম্ম এই যে—দেহরূপ-ব্রহ্মাণ্ডই পৃথিবী; কুণ্ডলিনী-শক্তি-রূপ বাসুকি মূলাধার-রূপ ক্ষিতিকে ধারণ করিয়া আছেন, তজ্জন্য জগদ্ধাত্রী প্রতিমার স্কন্ধ দেশে একটি সর্প দেখা যায়।

জগদ্ধাত্রী, মূলাধারে সর্পরূপী প্রাণশক্তি বা বাসুকি। কুণ্ডলিনীকে গুরুদত্ত কর্ম্ম দ্বারা চৈতন্য করিলে মনসাদেবী করা যাইতে পারে ; কারণ প্রাণশক্তির চঞ্চল অবস্থা হইতে মনের উৎপত্তি। মনসাদেবী সর্পের উপর অবস্থিত দেখা যায় অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণ হইতে মনের উৎপত্তি। প্রাণ না থাকিলে মন কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে।

জীবের উদ্ধার

সকাম অর্থাৎ কামজ পুত্র হইতে পুংনামক নরক হইতে উদ্ধার হওয়া যায় না। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা প্রবোধ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানরূপ পুত্র উৎপন্ন হয় ; সেই পুত্র হইতে ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষ এবং অধস্তন সপ্ত পুরুষের উদ্ধার সাধন হয়। বহির্লক্ষ্যে যেমন পুং লিঙ্গদ্বারা যোনীতে আলোড়ন করিলে অর্থাৎ একবার লিঙ্গ উঠাইয়া পুনঃপ্রবেশ কার্য্য দ্বারা সুখের সময় সময় উভয় লিঙ্গের একত্র সংমিলন হয় ; তদ্রূপ বানলিঙ্গ স্বরূপ প্রাণকে অন্তর্মুখীন করিয়া সুষুম্না পথে ঊর্দ্ধে আজ্ঞাচক্রস্থিত ব্রহ্ম-যোনীতে আলোড়ন অর্থাৎ পুরক করণ, তৎপরেই বাণলিঙ্গকে মূলাধারে নিম্নগামী অর্থাৎ রেচক করিয়া, পুনঃপুনঃ পূরক ও রেচক করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ অনুভূত হয়। যখন ব্রহ্মযোনীতে পুংলিঙ্গ স্বরূপ বাণলিঙ্গের সহবাস অর্থাৎ প্রাণের স্থিতি হয়, তখন ঈড়া ও পিঙ্গলা (যাহা দুই নাক দিয়া যাওয়া আসা করিতেছে তাহা) স্বতঃ অবরোধ আপনা আপনি হইয়া ঐ দুই নাকের শ্বাস, যাহা রজ ও তমগুণ—উদ্ধার (অর্থাৎ উৎ = উপরে, ধার = ধারণ) হয়, ইহাই জীবের উদ্ধার। (প্রকৃষ্ট বিবরণ ছিন্নমস্তায় লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য)। যে সাধক ক্রিয়া দ্বারা আপনা আপনিই ব্রহ্মযোনীতে সদা বানলিঙ্গ অর্থাৎ সুষুম্নাবায়ুকে রাখিতে পারেন তিনিই ভগবান্ উপাধিধারী। এ রহস্য সাধকের নিজ বোধগম্য। সাধনায় উন্নতি করিলে বুঝিতে পারা যায়।